মুক্ত নিকারাগুয়া

মানব মিত্র

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রবর্তক প্রিন্টিং এ্যাণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২/৩, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে মদ্রিত ও কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত।

পীট সীগার
এর্নেস্তো কার্দেনাল
ও
নিকারাগুয়ার জনগণকে

ভূমিকা

মধ্য আমেরিকার ছোট্ট এক দেশ নিকারাগুয়া। তার উত্তরে অন্দুরাস। উত্তর-পূর্বে এল্ সাল্ভাদোর। দক্ষিণে কস্তা রিকা। তার এক দিকে প্রশান্ত মহাসাগর। অপর দিকে অতলান্তিক। ওপরে নীচে ছোট ছোট আরো কয়েকটি দেশ ঃ বেলিস, গুয়াতেমালা, পানামা।

যতোদূর জানা যায়, মোটামুটি হাজার দুই বছর আগে ইণ্ডিয়ানরা (যাঁদের আমরা 'রেড ইণ্ডিয়ান' বলে থাকি) দল বেঁধে এসেছিলেন নিকারাগুয়ায়। বেশীরভাগই মেক্সিকো ও ক্যারিবিয় অঞ্চল থেকে। নিকারাগুয়ার প্রথম অধিবাসীরা ছিলেন সম্ভবত 'মিস্কিতো' উপজাতির লোক। 'চেরোতেগা' নামে আর এক উপজাতি একসময়ে মিস্কিতোদের কোণঠাসা করে ফেলেন। কালক্রমে চেরোতেগারাও রেহাই পেলেন না। মেক্সিকো থেকে 'নাহুয়া' উপজাতি নিকারাগুয়ায় এসে তাঁদের হটিয়ে দিলেন এবং গোটা অঞ্চলের ওপর চাপিয়ে দিলেন মেক্সিকান সংস্কৃতি। নাহুয়ারা মেক্সিকানদের মতোই চাষ-আবাদ আর শিকার করতেন, মাছ ধরতেন। গণিত আর সামান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানও জানা ছিল তাঁদের।

একটি ব্যাপার তাঁদের একেবারেই জানা ছিল না ঃ নিজেদের 'সভ্য' বলে জাহির করে থাকেন এমন এক ধরণের মানুষ অন্য এক মহাদেশ থেকে জাহাজ ভাসিয়ে এসে নিকারাগুয়া ও তার অধিবাসীদের একদিন আবিষ্কার করে বসবেন।

১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের বারোই সেপ্টেম্বর অতলান্তিক উপকূলে রামা নদীর মোহনায় স্পেনের নিশান উড়িয়ে জাহাজ ভেড়ালেন অ্যাডমিরাল কলোম্বাস।

আবিষ্কার ডেকে আনলো সভ্য-বানাও অভিযান। অর্থাৎ এলোপাথাড়ি লুঠতরাজ, নিরস্ত্র শান্তিপ্রিয় মানুষদের শেকলে বেঁধে ফেলা, ব্যাপক গণহত্যা ও ধর্ষণ। স্প্যানিশরা অবশ্য নিকারাগুয়ার ইণ্ডিয়ানদের দাস বানিয়ে ফেলা বা খুন করার আগে তাঁদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিলেন। ইহকাল ও পরকালের পাকা বন্দোবস্ত করে দেওয়া সভ্য মানুষের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেলেন স্প্যানিশ "কর্ন্কিস্তাদোরেস" বা বিজেতারা। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশের যুগ শুরু হলো নিকারাগুয়ায়

১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে। ফলে মেক্সিকোর মতো নিকারাগুয়াতেও বিজেতারা স্থানীয় সংস্কৃতি উৎখাত করলেন, পুড়িয়ে দিলেন বহু প্রাচীন মূল্যবান পুঁথি। স্থানীয় ভাষার মূল্যে চাপিয়ে দেওয়া হলো স্প্যানিশ ভাষা। গায়ের জোরে কায়েম করা হলো ভিনদেশী বিজেতাদের (স্প্যানিশ) সংস্কৃতি। তার মূল স্তম্ভঃ মধ্যযুগীয় ক্যাথলিকবাদ।

১৮২১ সালে মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকা স্পেনের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীন হয়ে ওঠে। নিরাপত্তার কারণে মধ্য আমেরিকার অন্যান্য দেশের মতো নিকারাগুয়াও আগুস্তিন্ দে ইতুর্‌বিদের মেক্সিকান সাম্রাজ্যের সংগে হাত মেলায় ১৮২২ সালে। কিন্তু ১৮২৩ সালেই ইতুর্‌বিদে গদিচ্যুত হলেন। সাম্রাজ্য গেল ভেঙে। ফলে গুয়াতেমালা, অন্দুরাস, এল্ সাল্‌ভাদোর, নিকারাগুয়া ও কস্তা রিকা একজোট হয়ে একটা প্রজাতন্ত্র গড়ে তুললো। মাত্র পনেরো বছর টিঁকলো এই ব্যবস্থা। ১৮৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল নিকারাগুয়ানরা ঠিক করলেন তাঁরা স্বাতন্ত্রের পথ ধরবেন। জন্ম নিলো নিকারাগুয়ার প্রজাতন্ত্র।

স্বাধীনতার পর থেকেই শুরু হয়ে গেল আঞ্চলিক রেষারেষি, মহামাত্যে মহামাত্যে কোন্দল ও মারামারি। লেয়ন ও গ্রানাদা এই দুই শহরের সবচেয়ে নামজাদা ও বিত্তশালী পরিবারগুলোর মধ্যে ক্ষমতার যে লড়াই চলছিল, তা থেকেই বেরিয়ে এলেন নিকারাগুয়ার প্রথম নেতারা। বিবদমান দুপক্ষই ঠিক করলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাঁরা গুণ্ডা ভাড়া করে আনবেন। সে ১৮৫৫ সালের কথা। এইভাবে ভাড়াটে সৈন্যের বেশে নিকারাগুয়ায় প্রবেশ করলেন মার্কিনীরা। কালক্রমে তাঁরাই হয়ে উঠলেন নিকারাগুয়ার ইতিহাসের চালকশক্তি।

উইলিয়াম ওয়াকার নামে এক মার্কিনী ভাগ্যান্বেষী ১৮৫৫ সালে একদল ভাড়াটে মার্কিনী সৈন্য নিয়ে নিকারাগুয়ায় এলেন। দেশের ভেতরকার চরম বিশৃঙ্খলা আর অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে বছরখানেক পরেই ওয়াকার ঘোষণা করলেন যে তিনিই নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রপতি। তাঁর লক্ষ্য ছিল মধ্য আমেরিকায় দাসপ্রথা ফের চালু করা এবং মার্কিনী শ্রেষ্ঠীদের নিকারাগুয়ায় জাল বিস্তারের পথ সুগম করা। ওয়াকার সাহেব মাত্র বছর দুই রাজত্ব করতে পারলেন। তারপর ব্রিটিশদের সাহায্যে কস্তা রিকার বাহিনী তাঁকে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু ওয়াকারের অন্তত একটি কাজ ততোদিনে হাসিল হয়ে গিয়েছে। মার্কিন অর্থনৈতিক স্বার্থ ততোদিনে সিঁধ কেটে ফেলেছে নিকারাগুয়ায়।

তার পরের একশো বছরের ইতিহাস, নিকারাগুয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বের ইতিহাস। এই সময়ে নিকারাগুয়ার অর্থনীতি প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়লো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর।

খোদ নিকারাগুয়ায় তখন অভিজাত শ্রেণীর রাজত্ব। অভিজাত প্রভুরা স্থানীয় ইণ্ডিয়ানদের জমিজমা কেড়ে নিয়ে সেগুলো তুলে দিতে লাগলেন কফি উৎপাদক আর মার্কিনী বিনিয়োগকারীদের হাতে। এইসব জমিজমা আগে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছিল না। এগুলো ছিল গোটা গোটা সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর সম্পত্তি। কাজেই জমি লুঠ করতে গিয়ে স্থানীয় মহামাত্যরা গোষ্ঠীকে গোষ্ঠী, গ্রামকে গ্রাম সাবাড় করে দিলেন। শুধু ১৮৮১ সালেই কফিচাষ আর কাঠের ব্যবসার হাঁড়িকাঠে প্রাণ দিলেন অন্তত সাত হাজার ইণ্ডিয়ান।

যে জমিতে ভুট্টা আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় শস্যের চাষ হবার কথা (আর জনগণের খেয়ে বাঁচার কথা), সেই জমিতে কফি চাষ করে এবং তা মার্কিনী ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে নিকারাগুয়ার অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা কাঁচা ডলারের স্বাদ পেলেন। সেই ডলার ওড়ানোর জন্য তাঁরা যেতে লাগলেন মায়ামি ও নিউ অর্লিন্স। মার্কিনী পুঁজিবাদই হয়ে দাঁড়ালো নিকারাগুয়ার ধনিক-শ্রেণীর আদর্শ। অচিরেই মার্কিনী পুঁজিপতিরা আর স্থানীয় অভিজাত বিত্তশালীরা জোট বাঁধলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড ফ্রুট কম্পানী স্থানীয় শ্রেষ্ঠীদের সহায়তায় নিকারাগুয়ায় বেশ বড় মাপের একটা কলা চাষের এলাকা তৈরী করলেন। কলার সূত্রে আরো নানান ফলের চাষ শুরু হলো। কফির সঙ্গে এগুলোও রপ্তানি হতে লাগলো ঢালাওভাবে। আদতে যাঁরা ছিলেন জমির মালিক, এবারে তাঁরা হয়ে পড়লেন মার্কিনী কম্পানী আর স্থানীয় বোম্বেটে বড়লোকদের প্রজা। নামমাত্র মজুরিতে প্রজা-চাষীরা বিশাল বিশাল প্ল্যানটেশনে দিনরাত খেটে চললেন। ফসল বিক্রীর টাকা আর মজুরি-মারা লাভের গুড় গেল কম্পানী আর স্থানীয় মালিকদের ঘরে। জন্ম নিলো নিকারাগুয়ার ধনতন্ত্র।

নিকারাগুয়ার রাজনীতি তখন আক্ষরিক অর্থেই 'রাজনীতি', অর্থাৎ রাজা-রাজড়াদের নীতি—থুড়ি লীলাভূমি। রাজারাজড়া বলতে ভূস্বামী, কফিস্বামী, কলা-আনারস স্বামীরা। এঁদের পরিবারগুলোই তখন সর্বেসর্বা। বিশেষ বিশেষ পদবীর অধিকারী হওয়াই ছিল রাষ্ট্রপতি হবার প্রাথমিক শর্ত। ১৮৫০ সাল থেকে শতকসন্ধি পর্যন্ত নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রপতির পদটা ছিল বিশেষ কয়েকটি পরিবারের সম্পত্তি। ঘুরেফিরে তাঁরাই পেতেন মসনদ। এবং লেখাপড়া নাই জানলেও নামসই করার বিদ্যেটা তাঁরা ভালোই রপ্ত করেছিলেন। ফলে বিদেশী কম্পানি ও পুঁজিপতিদের হাতে স্বদেশের সম্পদ তুলে দেওয়ার চক্রান্ত সংবলিত একরাশ চুক্তিতে সমানে সই করে গেলেন তাঁরা। নিকারাগুয়ার রাজনীতি ও অর্থনীতি হাত ধরাধরি করে চলে গেল মার্কিনীদের কুক্ষিতে। এক সময়ে দেখা গেল নিকারাগুয়ার রপ্তানি পণ্যের শতকরা ৯০ ভাগই চলে যাচ্ছে

মার্কিন মুলুকে। মার্কিন কম্পানীগুলো হয়ে উঠলো নিকারাগুয়ার বিশাল বিশাল সম্পত্তির মালিক। লাগাম আর ছপ্‌টি যে আসলে কার হাতে, এটা নিকারাগুয়ার জনগণকে সম্যক বুঝিয়ে দেবার জন্য নিকারাগুয়ার মুদ্রায় এক মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ছবিও ছাপা হলো।

সামরিক শক্তির বাটখারা ছাড়া অর্থনীতি ও রাজনীতির দাঁড়িপাল্লাটাকে স্বার্থ-মাফিক ব্যবহার করা যায় না। তাই মার্কিন সরকার সামরিক দিক দিয়েও নাক গলালেন। ১৯১২ সালে মার্কিনী মেরিন বাহিনী নেমে পড়লো নিকারাগুয়ায়। কুড়ি বছর দখল করে রাখলো তারা এ দেশ। দখলদার বাহিনী হিসেবে থাকাকালে মার্কিনীদের একটা বড় কাজ ছিল নিকারাগুয়ার বাহিনী গড়ে তোলা। এমন এক বাহিনী যা রাষ্ট্রপ্রধানের বশংবদ হবে। নির্বাচিত কোনো সরকারকে উৎখাত করেও যদি কেউ ক্ষমতা দখল করে, তাহলেও সেই ভুঁইফোঁড় 'নেতার' প্রতি আনুগত্য দেখাবে যে বাহিনী। ১৯২৭ সালে এই বিশেষ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা হলো। তার নাম রাখা হলো 'লা গুয়ার্দিয়া নাসিয়োনাল' বা 'ন্যাশনাল গার্ড'। দখলদার মার্কিনী সেনাবাহিনীই প্রথম থেকে অর্থ, অস্ত্র আর প্রশিক্ষণ জোগালো এই রক্ষীবাহিনীকে। প্রথম দিকে এ বাহিনীর অফিসাররাও ছিলেন মার্কিনী। ১৯৩৩ সালে, অর্থাৎ ঝাড়া ছ'বছর সরাসরি মার্কিনী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকার পর, একজন নিকারাগুয়ানকে পাওয়া গেল যিনি এ হেন বাহিনীর প্রধান হবার যোগ্য। ১৯৩৩-এর পয়লা জানুয়ারি পরম মার্কিনবন্ধু মেজর আনাস্‌তাসিয়ো সোমোসা হলেন ন্যাশনাল গার্ডের প্রথম নিকারাগুয়ান জেনারেল। সেইদিনই মার্কিনী মেরিন বাহিনী নিশ্চিন্ত মনে পাততাড়ি গোটালো নিকারাগুয়া থেকে।

কয়েক বছরের মধ্যেই আনাস্‌তাসিয়ো সোমোসা দেশের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং গার্ডবাহিনীকে পুরোদস্তুর কাজে লাগিয়ে নিকারাগুয়ার ডিক্‌টেটর হয়ে দাঁড়ালেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সোমোসা পরিবার ও ন্যাশনাল গার্ড নিকারাগুয়ায় যে চরম স্বৈরাচার, নৃশংসতা ও দুর্নীতি চালিয়ে গিয়েছে, অসভ্যতার ইতিহাসে তা এক বিরাট অধ্যায়। গ্রামের জনগণকে সন্ত্রস্ত রাখা, হরতাল ভাঙা-ও রাজনৈতিক শত্রুদের খুন করা হয়ে দাঁড়ালো ন্যাশনাল গার্ডের আসল কাজ। চাষীদের ওপর চললো অমানুষিক নির্যাতন। নারী ধর্ষণ হয়ে পড়লো প্রাত্যহিক ব্যাপার। সোমোসার বিরোধী হওয়া আর খুন হওয়া হয়ে দাঁড়ালো সমার্থক।

ন্যাশনাল গার্ডে যোগ দেবার আগে আনাস্‌তাসিয়ো সোমোসা ছিলেন পুরোনো গাড়ির ব্যাপারী। ক্ষমতা দখলের সময়েও তাঁর বিত্ত বিশেষ ছিল না। কিন্তু ১৯৭৯ সালে বিপ্লবীরা নিকারাগুয়ার ডিক্‌টেটরকে গদিচ্যুৎ করলেন যখন,

তখন সোমোসা-পরিবারের সম্পত্তির দাম ছিল আনুমানিক ৪০ থেকে ৫০ কোটি ডলার। সোমোসা পরিবার ও তাঁদের চেলাচামুণ্ডারা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেছিলেন নিকারাগুয়ার অর্থনীতি।

১৯৪৪ সালে আনাস্‌তাসিয়ো সোমোসা ছিলেন ৫১টা "ক্যাট্‌ল্‌ র‍্যাঞ্চের" মালিক। সেই সংগে ছিল তাঁর ৪৬টা কফি খামার। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পরিবহন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জমিজমার ব্যবসা, ব্যাংক থেকে নিয়ে 'বেসবল টিম', দোকানবাজার সবই চলে গেল তাঁর মালিকানায়। নিকারাগুয়ার যতো চিনির কল তার অর্ধেকই গেল আনাস্‌তাসিয়োর হাতে। মাছের ব্যবসার বারো আনা, চালের ব্যবসার শতকরা ৪০ ভাগ, দুধের কারবার—সবই আনাস্‌তাসিয়োর। তামাক ব্যবসা আর সিমেন্টের কারখানাতেও সিংহভাগটা ছিল তাঁরই। জাতীয় জাহাজ কম্পানী আর বিমান সংস্থা—দুটোই ছিল সোমোসা-পরিবারের সম্পত্তি। দুটো টি ভি-কেন্দ্র, একটি বেতার-কেন্দ্র এবং একটি দৈনিক পত্রিকাও ছিল সোমোসার নামে। ১৯৭৫ সাল নাগাদ দেখা গেল পাঁচশোরও বেশী করপোরেশনে সোমোসা পরিবারের বেশ বড় শেয়ার রয়েছে।

সোমোসা-পরিবার যে বিনা বাধায় এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হতে পারলেন তার প্রধান কারণ ছিল মার্কিন সরকারের প্রতি সোমোসাশাহীর অবিচল সমর্থন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট একবার বলেছিলেন:
"Somoza may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch."

সোমোসাদের অধীনে নিকারাগুয়া হয়ে পড়লো মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির এক চমৎকার ক্রীড়নক। ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালায় সংখ্যাগুরু ভোটে নির্বাচিত আর্‌বেনৃস্‌-সরকারকে উৎখাত করার জন্য মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা-সংস্থা সি আই এ যে আক্রমণ চালালো, তার আগে আগ্রাসী বাহিনীকে তালিম দেওয়া হলো নিকারাগুয়ায়। ১৯৬১ সালে মার্কিন সরকারের পরিচালনায় বে অফ পিগ্‌স্‌-এ কিউবার ওপর আক্রমণ হলো। সেই আক্রমণ অভিযান চালানো হলো নিকারাগুয়ার পূর্ব উপকূল থেকে। জাতি সংঘে নিকারাগুয়া ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অক্লান্ত সমর্থক। এই সব চূড়ান্ত আনুগত্যের প্রতিদান হিসেবে মার্কিন সরকার সোমোসা-পরিবার ও তাঁদের ঘাতক বাহিনীকে দশক দশক ধরে যা ইচ্ছে তাই করে যাবার সুযোগ দিলেন।

* * *

নিকারাগুয়ার ইতিহাস কেবল স্প্যানিশ ও মার্কিন বিজেতা ও বিদেশী মদতপুষ্ট একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচার ও শোষণের এক মাত্রিক ইতিহাস নয়। স্বৈরাচারী কলঙ্কের পাশাপাশি এ ইতিহাস গণপ্রতিরোধ ও বিদ্রোহের গৌরবে উজ্জ্বল।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী লড়াই-এর ডাক যিনি এ-শতাব্দীতে নিকারাগুয়ায় প্রথম দেন তাঁর নাম আউগুস্তো সেসার সান্দিনো। জেনারেল সান্দিনো নিকারাগুয়ার মুক্তি সংগ্রামের আদিগুরু। ১৮৯৫ সালের ১৯শে মে ইণ্ডিয়ানদের এক অখ্যাত গ্রামে সান্দিনোর জন্ম। ২৯ জন শোষিত খনি শ্রমিককে নিয়ে সান্দিনো তাঁর প্রথম গেরিলা দল গঠন করেছিলেন। ক্রমে নিকারাগুয়ার প্রায়-নিরন্ন চাষী ও মজুররাও সেই বাহিনীতে যোগ দিলেন। গরীব গ্রামবাসীরাই ছিলেন তাঁদের একমাত্র ভরসা। এরই জোরে টানা সাত বছর লড়াই করে গেলেন নিকারাগুয়ার প্রথম গেরিলারা। নিকারাগুয়া তখন মার্কিনী মেরিন বাহিনীর দখলে। এই বাহিনীর বিরুদ্ধেই সশস্ত্র সংগ্রাম করলেন সান্দিনো ও তাঁর সহযোদ্ধারা। ১৯৩৩ সালে মার্কিন সরকার তাঁদের মেরিন বাহিনী প্রত্যাহার করলেন, আর আনাস্তাসিয়ো সোমোসা হলেন ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান। এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের অজুহাতে সোমোসা ডেকে পাঠালেন সান্দিনোকে। সেই বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতও হাজির ছিলেন। ১৯৩৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রাসাদ থেকে বেরোনোর মুখে ন্যাশনাল গার্ডের ঘাতকদের হাতে খুন হলেন সান্দিনো ও তাঁর তিন সহকারী। তার পরের কদিনে তিনশোজন বিশিষ্ট 'সান্দিনিস্তা' বা সান্দিনোপন্থী খতম হলেন। উত্তর নিকারাগুয়ায় সান্দিনো যেসব কৃষক সমবায় গড়ে তুলে-ছিলেন তার শয়ে শয়ে চাষীকেও মেরে ফেলা হলো ন্যাশনাল গার্ড পাঠিয়ে।

সান্দিনো খুন হলেন, কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে আগুন ততোদিনে ধিকিধিকি জ্বলতে শুরু করেছে তা আর নেবানো গেল না। সান্দিনোর ফৌজের যেসব গেরিলা তখনো জীবিত, তাঁরা গোটা তিরিশ দশক জুড়ে বিক্ষিপ্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক ও ছাত্রছাত্রীরা একযোগে উঠে দাঁড়ালেন স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

১৯৫৬ সালে রিগোবের্তো লোপেস পেরেস নামে এক তরুণ কবি আনাস্তাসিয়ো সোমোসাকে খুন করলেন এবং নিজেও খুন হলেন। সোমোসার মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে লুইস হলেন কর্ণধার। ১৯৬৭ সালে অপর এক ছেলে আনাস্তাসিয়ো সোমোসা দেবাইলে শাসনক্ষমতা টেনে নিলেন নিজের হাতে।

সান্দিনোর নেতৃত্বে কৃষক মজুর ও সাধারণ মানুষের একনিষ্ঠ প্রতিরোধ এবং কবি রিগোবের্তোর বীরত্ব ও আত্মত্যাগ—এই দুই ঐতিহ্যের মিলনে ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে জন্ম নিলো 'ফ্রেন্তে সান্দিনিস্তা দে লা লিবেরাসিয়োন নাসিয়োনাল' বা সান্দিনিস্তা জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট। সংক্ষেপে 'এফ, এস, এল, এন'।

১৯৭০ দশকের শেষদিকে যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল তার তিন নেতা:

কার্লোস ফন্‌সেকা. তোমাস বর্হে ও সিল্‌ভিয়ো মায়োর্‌গা হাত মেলালেন সশস্ত্র অভ্যুত্থানে বিশ্বাসী অন্যান্যদের সংগে। তাঁরাই সান্‌দিনিস্তা ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা। সান্‌দিনিস্তারা বা সান্‌দিনোপন্থীরা শুধু যে সান্‌দিনোর প্রতিবাদ ও লড়াই থেকে প্রেরণা পেলেন তাই নয়, ১৯৫৯ সালের কিউবান বিপ্লবও তাঁদের চোখের সামনে থাকলো একটা আদর্শ হিসেবে।

নবীন সান্‌দিনিস্তারা নিকারাগুয়ার উত্তর অঞ্চলে গেরিলা তৎপরতা শুরু করে দিলেন। পাহাড়ে, জংগলে, শহরের আনাচে কানাচে, কৃষক ও ছাত্রসমাজে, কারখানায় ও গরীবদের মহল্লায় চলতে লাগলো সংগ্রাম ও প্রতিরোধ। সশস্ত্র লড়াই আর সাংগঠনিক কাজকর্মের পাশাপাশি সমানতালে চললো তাত্ত্বিক কাজ, জাতীয় মুক্তি আর মৌলিক সামাজিক সংস্কারের বাস্তবিক পরিকল্পনা।

এর জবাবে সোমোসা ও ন্যাশনাল গার্ড আদায় করে নিলো চরম মূল্য। শয়ে শয়ে সান্‌দিনিস্তা খুন হতে লাগলেন। চললো অকথ্য নির্যাতন। লাতিন আমেরিকার দক্ষিণপন্থী নির্যাতনের এক অন্যতম পন্থা হলো মেয়েদের সদলে বলাৎকার ও তারপর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলা, এবং পুরুষদের দেহের বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগ একে একে কেটে ফেলা। অসংখ্য মানুষ এর শিকার হলেন।

শেষ পর্যন্ত সফল হলেন সান্‌দিনিস্তা বিপ্লবীরা এবং নিকারাগুয়ার সংগ্রামী জনগণ। ১৯৭৯ সালের ১৭ই জুলাই সোমোসা পালিয়ে গেলেন—অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

ন্যাশনাল গার্ড ভেঙে গেল। ৭৯'র ১৯শে জুলাই সান্‌দিনিস্তা ফ্রন্টের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা সার বেঁধে ঢুকলেন রাজধানী মানাগুয়ায়।

*　　　*　　　*

১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন সরকারের এক প্রচার সংস্থায় চাকরি নিয়ে গিয়েছিলাম ওয়াশিংটন ডি, সি। তার কিছুদিন পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলো। মোটামুটি উদারপন্থী ডেমোক্র্যাট রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারকে ভোটে হারিয়ে দিয়ে রক্ষণশীল রিপাব্‌লিকান দলের প্রার্থী রনাল্ড রেগান পেলেন মসনদ।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার প্রথমে নিকারাগুয়ার সান্‌দিনিস্তা বিপ্লবীদের জয়ের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। তারপর কার্টার সরকার নিকারাগুয়ার বিপ্লবটাকে পাংশু মুখে মেনেই নেন একরকম।—তাঁদের মনোভাব শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াতো, কালক্রমে তাঁরা নিকারাগুয়া সম্পর্কে কেমন নীতি নিতেন এটা দেখার সুযোগ বিশ্ববাসী পেলো না। কারণ ভোটে হেরে গেলেন জিমি কার্টার।

বিজয়ী রেগান শ্বেতভবনে ঢুকলেনই যেন আস্তিন গুটিয়ে। গোটা দুনিয়াটাকে

তিনি প্রথম থেকেই ভাগ করে নিলেন খুব স্পষ্ট দুই ভাগে। তিনি যাঁদের মার্কিনবন্ধু মনে করেন তাঁরা রইলেন একদিকে। অপরদিকে রইলেন সেইসব সরকার, রেগান যাঁদের মার্কিনবিরোধী তথা শত্রুপক্ষ মনে করেন। এই শত্রু-পক্ষের সারা দেহে রেগান-সরকার অক্লান্তভাবে জুড়ে দিতে লাগলেন নানান 'লেবেল': 'মাকর্সবাদী-লেনিনবাদী', 'টোটালিটেরিয়ন', 'গণতন্ত্রবিরোধী' ইত্যাদি।

১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই নিকারাগুয়া স্থান পেয়ে গেল 'শত্রুপক্ষের' সারিতে, লাভ করলো ঐসব গালভরা লেবেল। মার্কিন-সরকারের প্রচারযন্ত্রে শুরু হয়ে গেল নিকারাগুয়াবিরোধী তীব্র প্রচার। ঐ প্রচারণা যন্ত্রের বেতনভূক্ কর্মচারী হিসেবে 'প্রপাগাণ্ডার' উদগ্র, যুদ্ধং দেহী রূপটা হাতেনাতে দেখার সুযোগ আমার হলো। দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পরে এ-সুযোগ আমি একটানা পেয়ে গেলাম। বাংলা যাঁদের ভাষা তাঁদের উদ্দেশে এই সাড়ে চার বছর ধরে বেতারে বলে গেলাম (প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে অন্তত চার পাঁচ-বার) নিকারাগুয়ার বিপ্লবী সরকার ও সান্দিনিস্তারা কী ভীষণ মানবতাবিরোধী, নৃশংস, স্বৈরাচারী। কিভাবে তাঁরা তাঁদের বিরোধীদের টুঁটি টিপে ধরছেন। কিভাবে তাঁরা নিকারাগুয়ার জনগণকে না খাইয়ে রাখছেন। কিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিকারাগুয়ায় ঘাঁটি গাড়ছে (মায় ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি!)। ইত্যাদি, ইত্যাদি। শেষকালে মার্কিনী সংবাদভাষ্যকারের লেখা তর্জমা করে এও বলতে হলো যে 'সান্দিনিস্তাদের চেয়ে সোমোসাও ছিলেন ভালো।'—অর্থাৎ বিপ্লব পরবর্তী নিকারাগুয়ার মতো ভয়াবহ দেশ আর হতেই পারে না।

ডলারের বিনিময়ে ওয়াশিংটন ডি, সি থেকে নিকারাগুয়া সম্পর্কে এইসব মূল্যবান তথ্য অনুবাদ ও প্রচার করে '৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি চাকরিতে ইস্তফা দিলাম।

তারই মধ্যে অবশ্য বুঝতে পেরে গিয়েছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা রেগান-সরকারের সংগে মোটেও একমত নন। এরকম কিছু মানুষের সংগে আলাপ, এমনকি বন্ধুত্বও হয়ে গিয়েছে। আরো একটি ব্যাপার হয়ে গিয়েছে ততোদিনে: নিকারাগুয়ায় আসলে কী হচ্ছে, দেশটা আসলে কেমন, সান্দিনিস্তা বিপ্লবের স্বরূপ কী, এ-সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের আগ্রহ।

নিকারাগুয়া যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি '৮৩ সাল থেকেই সান্দিনিস্তা বিপ্লব সম্পর্কে নানান সূত্রে খোঁজখবর নিতে থাকি। এ-ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশী সাহায্য পাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। '৮৪ সাল থেকে আমি স্প্যানিশ ভাষাটাও শিখতে শুরু করে দিলাম। সেই বছরেই মার্কিনী বামপন্থী ও র‍্যাডিকাল বুদ্ধিজীবী,

লেখক, শিল্পীদের ওপর একটি বই লেখার জন্য সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে লোকসংগীত শিল্পী পীট সীগারের সংগে আলাপ। আলাপটা ক্রমে প্রায় বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ালো। নিকারাগুয়ায় গিয়ে সানদিনিস্তা বিপ্লব সম্পর্কে বাংলায় একটা বই লিখতে চাই—এটা পীটকে জানাতে তিনিই পরামর্শ দিলেন: 'নিকারাগুয়ার সংস্কৃতি মন্ত্রী এর্নেস্তো কার্দেনালকে একটা চিঠি লেখো।'—আমার হয়ে কতকটা ওকালতি করেই পীট সীগার নিজেও একটি চিঠি দিলেন এর্নেস্তো কার্দেনালকে। তাঁর চিঠিটা আমার চিঠির সংগেই পাঠিয়ে দিলাম।

কিছুদিন পর এর্নেস্তো কার্দেনাল উত্তর দিলেন। জানালেন আমার আইডিয়াটা তাঁর পছন্দ হয়েছে। নিকারাগুয়া সফর করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানালেন আমায় যাজক-গেরিলা-কবি এর্নেস্তো।

'৮৫'র ছই মে পাড়ি দিলাম আমি ওয়াশিংটন ডি, সি থেকে মানাগুয়া। এ-ধরণের উদ্যোগ আগে কখনো নিইনি। এতো বড় মাপের কাজের সুযোগও পাইনি কখনো। তার চেয়েও যা বড় কথা, আমি যতোদূর জানি, আমার আগে ভারতীয় উপমহাদেশের আর কোনো লেখক-সাংবাদিককেই নিকারাগুয়ার বিপ্লবী সরকার ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এতোদিন ধরে সানদিনিস্তা বিপ্লবের খুঁটিনাটি জানার, এর্নেস্তো কার্দেনালের বিশেষ অতিথি হিসেবে নিকারাগুয়ার যেখানে ইচ্ছে যাবার, যার সংগে ইচ্ছে দেখা করার ও সাক্ষাৎকার নেবার (মায় সরকারবিরোধী ও বিপ্লববিরোধীদের সংগেও) এমন সুযোগ দেননি। সেদিক দিয়ে আমি এক ঐতিহাসিক সুযোগ পেয়েছি বলা যায়। এর জন্য আমি এর্নেস্তো কার্দেনাল, নিকারাগুয়ার বিপ্লবী সরকার ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কাছে ঋণী। তবে সেই একই সংগে, একই জোর দিয়ে উল্লেখ করতে চাই বন্ধু পীট সীগারের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কথা। তাঁর সুপারিশ ও উৎসাহ ছাড়া আমার নিকারাগুয়া-সফর সম্ভব হতো কিনা কে জানে!

নিকারাগুয়ায় যাওয়া এবং সানদিনিস্তা বিপ্লব সম্পর্কে বাংলায় বই লেখার ব্যাপারে আমায় আরো যাঁরা যাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মার্কিনী মার্কসবাদী ভাবুক বার্টেল ওলম্যান, লেখিকা মায়া এনজেলু, প্রতিবাদী কণ্ঠশিল্পী হলি নিয়ার, অগ্রজপ্রতিম সাংবাদিক দাউদ খান মজলিশ, বন্ধু শান্তনু দাশগুপ্ত, আবদুল্লাহ আল ফারুক ও বিশেষ করে সোফিয়া নাজমা চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা একান্তই দরকার।

কলকাতা মানব মিত্র

ছ'ই মে

ওয়াশিংটন ডি সি থেকে মায়ামি। মায়ামি থেকে টাকা ইন্টারন্যাশনাল-এর বিমানে বেলিস, সান সালভাদোর হয়ে মানাগুয়া। এই হলো যাত্রাপথ।

মায়ামি বিমানবন্দরে টাকা ইন্টারন্যাশনালের কাউণ্টারে বেদম ভীড়। বেশ কিছু সাংবাদিক রয়েছেন। বিবিসি'র টেলিভিশন ক্রুও হাজির। সংগে বিস্তর লটবহর, বড় বড় ক্যামেরা, হরেকরকম যন্ত্রপাতি। সকলেরই গন্তব্য নিকারাগুয়া। আর রয়েছেন অন্য কিছু যাত্রী। এঁরা সকলে লাতিন আমেরিকান। কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল এঁরা চলেছেন সান সালভাদোর।

বিমানে আলাপ হয়ে গেল অন্দুরাসপ্রবাসী এক আমেরিকান ব্যবসায়ীর সংগে। প্রথম যৌবনে অন্দুরাসে গিয়ে, চাকরি নিয়ে, বিয়ে-থা করে সেখানেই থেকে গিয়েছেন। পরে ব্যবসা ফেঁদেছেন জমিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার কথা আর ভাবতেও পারেন না। বললেন, মধ্য আমেরিকায় ভারতীয়রা সচরাচর আসেন না। আমার গন্তব্য মানাগুয়া শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি। অন্দুরাসের সংগে নিকারাগুয়ার সম্পর্ক একেবারেই ভালো নয়। দক্ষিণপন্থী প্রতি বিপ্লবীরা আর প্রাক্তন ন্যাশনাল গার্ডের (সোমোসা বাহিনীর) লোকজন অন্দুরাস থেকেই সমানে হামলা করে চলেছে নিকারাগুয়ার উত্তর সীমান্তে।

সহযাত্রী ভদ্রলোক অবশেষে বললেন, "দেখুন গিয়ে নিকারাগুয়ার হালচাল। হয়তো দেখবেন অনেক কিছুই আপনার ভালো লাগছেনা।"

ভদ্রলোক কিন্তু কখনো নিকারাগুয়ায় যাননি।

বেলিস পৌঁছুনোর আগেই ভদ্রলোকের সংগে আলাপ বেশ জমে উঠলো। কথায় কথায় তিনি বলে ফেললেন, মধ্য আমেরিকায় মার্কিন সরকারের যে নীতি, তিনি তার সমর্থক নন। বললেন, এর ফলে গোলমাল আর অশান্তি বাড়বে বই কমবে না।

সান সালভাদোরে নেমে গেলেন তিনি।

ভদ্রলোক নেমে যাবার পর আমার খেয়াল হলো, মায়ামি থেকে বেলিস আসার পথে আকাশ থেকে একবার কিউবা দেশটাকে দেখে নেওয়া যেত। গল্প করতে করতে ভুলে গেছি বেমালুম।

মানাগুয়ার আকাশে পৌঁছুলাম যখন, চারদিকে তখন অন্ধকার। সন্ধ্যে

হয়ে গিয়েছে। ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে শুধু মানাগুয়ার আলো। বেশ নিষ্প্রভ যেন।

ছোট্ট বিমানবন্দর। বিমান থেকে বাইরের সিঁড়িতে পা রাখতেই চোখে পড়লো একটু দূরে এক আলোকিত সাইনবোর্ড লেখা : "সান্দিনোর দেশে স্বাগতম।"

টার্মিনাল ভবনের মাথায় লেখা : 'মানাগুয়া—নিকারাগুয়া লিব্রে'। মুক্ত নিকারাগুয়া।

সাংবাদিক ও লেখকদের জন্য একটা আলাদা কাউণ্টার। সেই ভোরবেলা বেরিয়েছি। এখন প্রায় রাত। ক্লান্তি ও উত্তেজনার চোটে সময়ের হিসেবটা গেছে ভণ্ডুল হয়ে। বিমান যে ঘণ্টা দুই আড়াই দেরীতে পৌঁছেছে, সেটাও খেয়াল করিনি। সামনের দুই অস্ট্রেলিয় সাংবাদিকের কথাবার্তা শুনে সম্বিত ফিরলো : সর্বনাশ, যদি কেউ নিতে এসে থাকেন আমায় তো অপেক্ষা করতে করতে হদ্দ হয়ে তিনি হয়তো চলেই গেছেন ইতিমধ্যে। আমার অনুমান মিথ্যে হলো না।—

মালপত্র সংগ্রহ করার জন্য ভেতরে এসে আবিষ্কার করলাম আমার সুটকেশটি পৌঁছয়নি। আমার করুণ মুখ দেখে এক শ্বেতাংগ ভদ্রলোক যেন দয়াপরবশ হয়েই এগিয়ে এলেন। দেখেই চিনলাম—ইনি সেই মায়ামিতে দেখা বিবিসি'র টেলিভিশন দলের একজন। বললেন—"মন খারাপ করবেন না। আমাদের এগারোটা বড় বাক্স ছিল। একটাও আসেনি। টাকা ফ্লাইটে এরকম প্রায়ই হয়।"

দিন দুই পরে মালপত্র পাওয়া যাবে এই আশ্বাস পেয়ে বাইরে বেরোলাম। আমার কাঁধে শুধু ক্যামেরা, লেন্স আর ফিল্মভর্তি দুটো ব্যাগ।

পৌঁছুনোর কথা ছিল সন্ধ্যে ছ'টায়। এখন বাজে রাত সাড়ে আটটা। এ-অবস্থায় একটা ট্যাক্সি নিয়ে কাছাকাছি কোনো হোটেলে চলে যাওয়াই শ্রেয়। কাল সকালে খোঁজ করা যাবে।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে দেখা পেলাম সন্ধ্যের মানাগুয়ার। চারিদিক শান্ত। বেশ গরম। রাস্তার দু'ধারে নিষ্প্রভ আলো। রাস্তার পাশেই দোকান। তার বাইরে লোকজন বসে খাওয়া দাওয়া করছে। ঠিক যেন কলকাতার উপকণ্ঠবর্তী কোনো এলাকা। বাড়িগুলো সবই একতলা। কয়েকটা বাড়ির চাল টিনের।

'অতেল পালাস্'-এ পৌঁছেই শুরু হয়ে গেল আমার স্প্যানিশ ভাষাজ্ঞানের বেশ কড়া পরীক্ষা। বিমানবন্দরে ও ট্যাক্সিতে এক প্রস্থ হয়ে গিয়েছে,—তবে এর কাছে তা নস্যি। হোটেলে যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা সকলেই তরুণ তরুণী। এবং সকলেই খুব গোপ্পে। এই প্রথম তাঁরা চর্মচক্ষে কোনো

ভারতীয়কে দেখলেন। এবং এর্নেস্তো কার্দেনাল আমায় নেমন্তন্ন করেছেন শুনে তাঁদের উৎসাহ যেন আরো বেড়ে গেল।

একজন তরুণ,—নাম কার্লোস আন্তোনিয় গন্সালেস,—ভারী সপ্রতিভ। হৈ হৈ করে গল্প জুড়ে দিলেন। মুক্ত নিকারাগুয়ায় সদ্য আগত এক ভারতীয়কে হাতের কাছে পেয়ে, উৎসাহের আতিশয্যে তিনি খেয়ালই করছেননা, অতিথি তাঁর কথা কতোটা বুঝছে-না-বুঝছে। ভাষাটি স্প্যানিশ হলেও কথা বলার রীতিটি এ-অঞ্চলের নিজস্ব। শব্দের মাঝখানে ও শেষে 'স' ধ্বনিটি থাকলে নিকারাগুয়ানরা যে সেটিকে গিলে ফেলেন বেমালুম, এই দরকারি তথ্যটুকু আমার জানা ছিলনা। উচ্চারণের এই বিশেষ রীতিটা সইয়ে নিতে আমার দিন তিনেক লেগে গিয়েছে।

তাছাড়া কার্লোস আন্তোনিয় এমন গড় গড় করে, সোরগোল তুলে কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছেন যে আমার পক্ষে তাল রাখা মুশকিল। অতএব একটু আস্তে, একটু ধীর লয়ে কথা বলার আর্জি। সেই সংগে প্রাণপণে, বহু চেষ্টা করে কিছু কিছু প্রশ্ন : নিকারাগুয়ার বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর কী মত?

এ-বিপ্লবের তিনি পূর্ণ সমর্থক। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এ-দেশে যুবশক্তির যে অভ্যুত্থান, যৌবনের যে জাগরণ হয়েছে, তার কথা বলে চললেন কার্লোস। এবারে বেশীরভাগ কথাই বুঝছি। শুধু, হঠাৎ করে আবেগে ভেসে গিয়ে আমার নতুন বন্ধুটি যখন লয় বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তখন আর বোঝার উপায় থাকছেনা। আমার মুখচোখের ভাব দেখে বেচারী অবশ্য রাশ টেনে ধরছেন তাঁর ভাষার। থেকে থেকেই।

কোত্থেকে দুটি পত্রিকা জোগাড় করে আনলেন কার্লোস আন্তোনিয়। পড়ে পড়ে শোনাচ্ছেন। শক্ত কথাগুলো সহজ করে বোঝাতে চাইছেন। সবই অবশ্য স্প্যানিশে। এরই মাঝখানে কার্লোস জানিয়ে দিলেন নিকারাগুয়া হলো কবিদের দেশ। এবং তিনি নিজেও কবিতা লেখেন। ভুল বলেননি কার্লোস। আমাদের বাংলাদেশের মতো নিকারাগুয়াতেও কবিতার পাঠকের চেয়ে কবির সংখ্যা বোধহয় বেশী।

হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন এই তরুণ। মিনিটখানেক পরে ফিরে এলেন একখানা আইডেনটিটি কার্ড হাতে। তাতে লেখা : সান্দিনিস্তা যুববাহিনী। গর্বের সংগে জানিয়ে দিচ্ছেন কার্লোস, দেশের জন্য রক্ত দিতে তিনি প্রস্তুত।

আমি জানতে চাইলাম, ভারত সম্পর্কে তিনি কতোটুকু জানেন। সলজ্জ কার্লোস কবুল করলেন—সামান্যই। তবে হ্যাঁ, ইন্দিরা গান্ধীর নাম তাঁর দিব্যি জানা। বললেন—"অতো বড় দেশের অতো উঁচু পদে একজন মহিলা ছিলেন, এটাই একটা বিরাট ব্যাপার।" মহিলাদের সম্পর্কে কার্লোসের দুর্বলতাটা বেশ সোচ্চার। "নিকারাগুয়ার সব মেয়েই সুন্দর।"

সাতই মে

সকালে সংস্কৃতি মন্ত্রকে ফোন করে জানতে পারলাম এর্নেস্তো কার্দেনাল জরুরী কাজে বিদেশ গিয়েছেন। নির্দেশঃ 'সানদিনিস্তা ফ্রন্টের দপ্তরে যান।' এক পদস্থ কর্মকর্তা আন্‌তোনিয় হার্‌কিন্‌ বেলা তিনটেয় অপেক্ষা করবেন।

দপ্তরটি মানাগুয়ার প্লাসা দে এস্‌পানিয়া নামে এক জায়গায়। দুপুর বারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম।

ট্যাক্সি করে যেতে যেতে মানাগুয়া শহরটা এই প্রথম, দিনের আলোয় দেখছি। মানাগুয়ার ঘরবাড়ি, পথঘাট, মানুষ, যানবাহন।

দেয়ালে দেয়ালে সানদিনিস্তাদের সমর্থনে শ্লোগান লেখা। লেখা রয়েছেঃ "মুক্ত দেশ অথবা মৃত্যু।" একজায়গায়ঃ "প্রতিক্রিয়াশীলরা নিপাত যাক।" বড় বড় হরফে লেখা 'এফ, এস, এল, এন'। সানদিনিস্তা জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সংক্ষিপ্ত নাম। অনেকগুলো শ্লোগানই যেন কাঁচা হাতে লেখা। তার মধ্যে একটি হলোঃ "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবর খোঁড়া হচ্ছে নিকারাগুয়ায়।"

হঠাৎ একটা মোড় ঘুরতেই চোখে পড়লো দূরের একটা পাহাড়। ধূসর। চড়া রোদ্দুরে যেন আরো ফ্যাকাসে। আর সেই পাহাড়ের প্রায় চূড়োর কাছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাদা হরফে লেখাঃ 'এফ, এস, এল, এন'। পাহাড়টা বেশ দূরে। এতো দূর থেকেও সাদা হরফের লেখাটা রীতিমতো পড়া তো যাচ্ছেই, তাছাড়া হরফগুলো যে অতিকায় সেটাও মালুম হচ্ছে এক নজরেই। চালককে জিজ্ঞেস করলাম, পাহাড়টার নাম কী?

উত্তর এলোঃ "এফ, এস, এল, এন।"

পাহাড়ের সারি দেখতে দেখতে কল্পনা করে নিলাম, বছরের পর বছর 'এফ, এস, এল, এন'-গেরিলারা ওখানেই লড়াই করেছেন, লুকিয়ে থেকেছেন, লড়াই করেছেন, শহীদ হয়েছেন, লড়াই করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত জিতেছেন। ৭৯'র জুলাই মাসে ঐ পাহাড় শ্রেণী থেকে নেমে এসেছিলেন সানদিনিস্তা গেরিলারা মানাগুয়ায়। মিলে গিয়েছিলেন তাঁরা চারদিক থেকে ছুটে আসা অন্যান্য গেরিলাদের সংগে,—হাজারে হাজারে। মানাগুয়ার অদূরবর্তী ঐ পাহাড়ের নাম 'এফ, এস, এল, এন' হতেই হবে।

দূরের পাহাড় থেকে দৃষ্টি ফিরে এলো ফের কাছের রাস্তায়, রাস্তার আশেপাশে। সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এক গরীব দেশের পরিচিতি। দোকানপাট

তেমন জমজমাট নয়। দোকানের সংখ্যাও তেমন বেশী নয় মোটেও। সাধারণ জামাকাপড় আর খাবারের দোকানই বেশী। রাস্তাগুলো মোটের ওপর পরিষ্কার। খানাখন্দ প্রায় নেই বলা চলে। ট্যাক্সিটা বেশ পুরোনো। ঠিক যেন কলকাতার ট্যাক্‌সি। কিন্তু ছুটছে বেশ মসৃণভাবে। ঝাঁকুনি নেই। ঠোক্কর নেই।

ছোট গলিগুলো বড় রাস্তার মতো অতো পরিষ্কার নয়। এদিক ওদিক কিছু ছেঁড়া কাগজ। একপাশে মাঠের ওপর রাখা লোহালক্কড়। মায় কিছু ভাঙা মোটরগাড়ি।

কিন্তু দুর্গন্ধময় ময়লা নেই। কোথাও দেখছিনা কেউ মলমূত্র ত্যাগ করছে। ভাঙাচোরা, ছেঁড়াখোঁড়া কিছু জিনিষ মাঝে মাঝে চোখে পড়লেও এমন কিছু দেখছিনা যা জনস্বাস্থ্যের পরিপন্থী। দুর্গন্ধ নেই। এঁটোকাটা, তরিতরকারির খোসা, গোবর বা মানুষের বিষ্ঠা—এরকম কিছুই চোখে পড়ছেনা। অথচ ট্যাক্‌সি চলেছে রাজ্যের গলিঘুঁজি দিয়ে, বেশ গরীব সব মহল্লার ভেতর দিয়ে,—যেখানে বাড়ির চাল বেশীরভাগই টিনের, লোকজনের গায়ে খুবই সাধারণ পোষাক, কিছু বাচ্চা রাস্তার ধারে খেলছে, গায়ে সার্ট নেই। তবে একটা বাচ্চাও উলঙ্গ নয়। এ হলো, যাকে বলে, "বার্‌রিয়ো" —শ্রমিক মহল্লা। বিত্তের জৌলুষ নেই। নেই নোংরামিও। দারিদ্র?—হ্যাঁ। নোংরামি—না।

যেতে যেতে চোখে পড়ছে বাসস্টপ। কয়েকটায় লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে সারবেঁধে।

প্লাসা দে এস্‌পানিয়া থেকে একটু দূরে সান্‌দিনিস্তা দপ্তরের সামনে ছেড়ে দিলাম ট্যাক্‌সিটা। হাতে এখনো প্রচুর সময়। তাই হাঁটা লাগালাম প্লাসার দিকে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে খেয়াল হলো সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে। কয়েক পা দূরেই দেখি বছর বারো বয়েসের একটি ছেলে গাছের ছায়ায় বসে কী একটা করছে। ছেলেটির পরণে একটি আধময়লা টি-সার্ট আর বেশ-ময়লা প্যাণ্ট। জিজ্ঞেস করলাম কাছে পিঠে সিগারেটের দোকান আছে কিনা। ছেলেটি ছুটে এসে, একগাল হেসে বললো—'আছে, চলো তোমায় সংগে নিয়ে যাই।'

প্রশ্ন: 'এই ভরদুপুরে তুমি বাইরে কেন? ইস্কুলে যাও না?'

ছেলেটি: 'কেন যাবোনা? আমাদের ইস্কুল বসে ভোরবেলা, শেষ হয় বেলা বারোটায়। ইস্কুল থেকে ফিরে এমনি একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

সিগারেটওলার কাছে পৌঁছে দিয়ে কিশোরটি "আদিয়স্‌" বলে ফিক্‌ করে হেসে ছুট লাগালো। ধন্যবাদ জানানোর কোনো সুযোগই দিলোনা সে।

এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্লাসা দে এস্‌পানিয়ার বিশাল চত্বর জুড়ে

অসংখ্য মানুষ। ছোট ছোট দোকান বসে গিয়েছে চারদিকে। খাবার বা পানীয়র দোকান। খাবার বলতে ভাত, সব্‌জি, মাংস। পানীয় বলতে পেপ্‌সি কোলা ও স্থানীয় সফ্‌ট্‌ ড্রিংক। দারুণ গরম। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। অতএব লোকে দেদার হাল্কা পানীয় বা জল খাচ্ছে। খাবারও খাচ্ছে অনেকে। এক গেলাস পানীয় নিয়ে বসে পড়লাম একপাশে। যা দেখছি, গিলছি গোগ্রাসে। লক্ষ্য করে যাচ্ছি লোকজনের হাবভাব, মুখচোখ, গতিবিধি।

এতো লোক, অথচ গোলমাল নেই। ফেরিওলারাও চেঁচাচ্ছেনা। লোকে শান্ত, কিন্তু জবুথবু নয়। সকলেরই হাঁটাচলায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবার বা পানীয় খাওয়ায়, হাবভাবে, চোখের চাউনিতে একটা বেশ আলগা, নিশ্চিন্ত ভাব। অনেকেই আমায় লক্ষ্য করছে। আমি হাসলেই তারাও হাসছে। লোক দেখানো নয়। স্মিত, আন্তরিক হাসি।

সামনেই বাসস্টপ। অনেক লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। ছেলে-মেয়ে তরুণ-তরুণী, বুড়োবুড়ি। সকলেই শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছেন। বাস আসছে মোটের ওপর ঘনঘন। বেজায় ভীড়। কিন্তু ধাক্কাধাক্কি নেই। যতজন পারছে, উঠছে। সংকটসীমা পেরোনোর আগেই লোক ওঠা বন্ধ। বাস চলে যাচ্ছে। আবার অপেক্ষা। অসহিষ্ণুতার চিহ্নমাত্র নেই।

ফুটপাথের ওপরেই দু' একটা বাচ্চা গড়াগড়ি দিয়ে খেলছে। তাদের মায়েরা মাঝে মাঝে এসে সামাল দিচ্ছেন। এক মা তাঁর দুরন্ত ছেলেকে বেশ ঘা-কতক দিলেন। সকলেই লাইন দিয়েছেন বাসের জন্য।

মিনিট পনেরো-কুড়ি বাসের আসা-যাওয়া, বাসের ভীড় আর লোকের সারি দেখে বুঝলাম এই রুটে অন্তত যাত্রীদের সংখ্যার তুলনায় বাসের অভাব রয়েছে। পরে জেনেছি যে শুধু এই রুটেই নয়, নিকারাগুয়ার সর্বত্রই বাসের অভাব। যুদ্ধের জন্য তেলের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তাছাড়া পর্যাপ্ত টাকার অভাবে খারাপ হয়ে যাওয়া বাসগুলো সবসময়ে মেরামত করা যাচ্ছে না। যন্ত্রাংশের অভাবও আছে। আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে গিয়ে যে গরীব দেশকে তার আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ সামরিক খাতে ঢালতে হয়, তার অন্যান্য ক্ষেত্রে অভাব দেখা দেবেই।

মাঝেমাঝেই দেখছি ছুটন্ত পিক্‌-আপ্‌ ট্রাক থেমে যাচ্ছে। কিছু লোক তাতে উঠে পড়ছে। বেশ কিছু মোটরগাড়িও যাওয়া আসা করছে। সেগুলো কিন্তু থামছে না।

কয়েকজন তরুণীকে দেখছি সৈন্যের পোষাক পরা। মিলিশিয়া। কোমরবন্ধে রিভলভার গোঁজা, সাদা পোষাক পরা কয়েকজন পুরুষকেও দেখছি। পরে আলাপ করে জানলাম এঁরা রক্ষী। হঠাৎ করে আক্রমণ হলে জনগণকে রক্ষা করাই এঁদের কাজ। পুলিশ দেখছি না। এমনকি

ট্র্যাফিক পুলিশও চোখে পড়ছে না। উর্দিপরা লোকের সংখ্যা নেহাতই কম। একেবারেই নগণ্য।

প্লাসা দে এস্পানিয়ায় সকলেই পরম নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাবার খাচ্ছে, কেউ কেউ খোস গল্প করছে। তাড়া নেই কারুর। বচসা শুনছি না। গলা চড়িয়ে কেউ কথা বলছে না। দাঁত বের করে অষ্টপ্রহর হাসছেও না লোকে তাই বলে। সুশৃংখল, শান্ত মানুষজন।

এবারে আলাপসালাপ। প্রথমে আলাপ হলো কিছু কিশোরের সংগে। ক্রমে বড়দের পালা। দু'জন নাগরিক রক্ষীর সংগে আলাপ হলো। দু'জন ছাত্রর সংগেও। কয়েকটি লোক জুতো পালিশ করছেন, আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে খবর কাগজ পড়ে নিচ্ছেন। বেশ সপ্রতিভ। এদের সংগেও আলাপ হয়ে গেল।

শেষে, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল সদ্য আলাপ হওয়া প্রায় সকলেই কাছের একটা গাছতলায় জমায়েত হয়েছেন আমার সংগে কথা বলবেন বলে। পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ ঘোরার অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতো বিচিত্র ধরণের লোকের সংগে এক-যোগে ভাব হয়ে যাবার অভিজ্ঞতা এটাই প্রথম।

রাস্তার অনেকেই আমাদের জটলা দেখছেন হাসিহাসি মুখে। লোকে কতো সহজে হাসতে পারে এ-দেশে!

প্রথমে আমার উত্তর দেবার, প্রশ্নকর্তাদের কৌতুহল মেটানোর পালা। "কোন্ দেশের লোক তুমি? ভারত? সে তো অনেক দূর!"

নতুন বন্ধুদের কেউই এর আগে কোনো ভারতীয়কে সামনাসামনি দেখেন নি। কাজেই ঔৎসুক্যটা বেশ তীব্র।

"আমাদের বিপ্লবের ওপর বই লিখবে? পড়বে তোমার দেশের লোক?"

—স্প্যানিশ ভাষায় 'আপনি' ও 'তুমি' (বা 'তুই') দুটো সম্বোধনই চলে। লক্ষ্য করছি সকলেই আমায় 'তুমি' করে বলছে। আপনি-আজ্ঞের বালাই নেই।

সমাগত অনেকেই ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে জানতে চাইছেন। জানতে চাইছেন পাঞ্জাব-সমস্যা সম্পর্কে। এবার আমারই কিঞ্চিৎ অবাক হবার পালা। এঁদের বেশীরভাগই, সেইভাবে দেখতে গেলে, খুবই সাদামাটা লোক। কেউ শ্রমিক, কেউ সাধারণ কেরাণী, কেউ জুতো পালিশ করেন, কেউ রক্ষী, কেউ বা ইস্কুলের ছাত্র। সকলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর কাগজটা পড়েন। অনেকেরই হাতে দেখা যাচ্ছে পত্রিকা। কোথায় ভারত আর কোথায় নিকারাগুয়া। এতো দূরের এক দেশে এসে, পথে হঠাৎ আলাপ হয়ে যাওয়া কয়েকজন সাধারণ নাগরিকের মুখ থেকে পাঞ্জাব-সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন শুনতে

হবে, এতোটা আমি কল্পনাও করিনি। একটি ছেলে দুম্ করে আমায় জিজ্ঞেস করে বসলো : "তোমাদের দেশে তো গরীব-বড়লোকে এতো ফারাক, এতো লোক খেতে পায় না শুনি। তাহ'লে তোমরা বিপ্লব করো না কেন?"

প্রাণপণ চেষ্টা করছি উত্তর দিতে। কষ্ট হচ্ছে। বড্ড কম জানি। না জানি স্প্যানিশ ভাষাটা ভালো করে, না জানি এইসব প্রশ্নের সদুত্তর।

আমার শতছিন্ন, কাছা-আলগা স্প্যানিশ শুনে কেউ হাসছেন না। বরং সকলে বেশ প্রশ্রয় দিচ্ছেন আমাকে। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেকদিন ছিলাম শুনে কেউ কেউ ঐ দেশটি সম্বন্ধেও জানতে চাইলেন। লক্ষ্য করলাম, মার্কিনীদের সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন করছেন যথার্থ, সৎ কৌতুহল নিয়ে। কোনরকম কটুক্তি শুনলাম না।

এবারে আমার প্রশ্ন করার পালা। বিনা নোটিসে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম : "নিকারাগুয়ার বিপ্লব, সান্দিনিস্তাদের সম্পর্কে তোমাদের মত কী?"

বেশ সোরগোল পড়ে গেল। বেশীরভাগই বললেন :

"বিপ্লব আমরা চেয়েছি এবং চাই। আর সান্দিনিস্তা ফ্রন্টের পাশেই আছি আমরা। তবে হ্যাঁ, সমস্যা আছে। অভাব রয়েছে দেশে। কিছু জিনিষের দাম বেড়েছে।"

সাদা পোষাক পরা এক সশস্ত্র রক্ষী বললেন : "পাঁচ বছরের বিপ্লব, পাঁচ বছরের যুদ্ধ। লড়াই তো সমানেই চলেছে বিপ্লববিরোধীদের সংগে।"

একটি ছেলে ভারী সপ্রতিভ। জোর গলায় স্পষ্টাস্পষ্টি বললেন : "সব দিক দিয়ে সন্তুষ্ট আমি মোটেও নই। ফাঁকফোকর আছে। অভাব আছে। তবে ১০০% তৃপ্তি কোথায় পাবেন?"

আমার প্রশ্ন : "সোমোসা-জমানার সংগে তুলনা করলে কী বলবেন?"

ছেলেটির উত্তর : "আরে না না। সোমোসার আমলের চেয়ে অবস্থা এখন ঢের ঢের ভালো। কোনো তুলনাই চলে না।"

প্রশ্ন : "খোলাখুলি সমালোচনা করতে পারেন সান্দিনিস্তা সরকারের?"

উত্তর : "কেন পারবো না? এখন আমাদের বাক্‌স্বাধীনতা আছে। যা খুশী বলতে পারি। কারুর কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না সেজন্য।"

ঐই আলাপ যখন চলছে, তখন কাছেই দাঁড়িয়ে তিন মিলিশিয়া তরুণ। বেশ উৎসাহ নিয়েই শুনছেন তাঁরা কথাগুলো।

প্রায় ঘণ্টা দুই আড্ডা ও ছবি তোলা হলো। সকলেই বন্ধুর মতো বিদায় নিলেন, একগাল হেসে। সাফল্য কামনা করে।

হাঁটা দিলাম সান্দিনিস্তা দপ্তরের দিকে। দপ্তরের দরজায় সশস্ত্র প্রহরী। হাতে অটোমেটিক রাইফেল। গায়ে কিন্তু সাধারণ পোষাক। উর্দি নেই।

বললাম, আনতোনিয় হারকিনের সংগে দেখা করতে চাই। মুখের কথাতেই ঢুকতে দিলেন রক্ষী। আমার কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ। সেটা দেখতেও চাইলেন না। ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময়ে দ্বিতীয় এক রক্ষী এসে হাজির। ইনি অল্পবয়সী। মৃদু হেসে শুধোলেন, "সংগে অস্ত্র নেই তো ?" আমি কিছু বলার আগেই বয়স্ক রক্ষীটি বলে উঠলেন—"আরে না না।"—ব্যাস্। অল্পবয়সী রক্ষীটি (নেহাতই কিশোর) সরে দাঁড়ালেন হাসিমুখে। আমি নিজের থেকেই ক্যামেরার ব্যাগটা খুলে দেখানোর উপক্রম করায় দু'জনেই সমস্বরে বলতে লাগলেন—ওসবের কোনো প্রয়োজন নেই। কিশোর রক্ষী,—তার কাঁধে ঝোলানো একটা অটোমেটিক রাইফেল,—বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথা একটু নুইয়ে, একটি হাত বাড়িয়ে হাসতে হাসতে বললেন—"আদেলান্তে, কম্পানিয়েরো" ঃ ভেতরে যান, কমরেড।

বিপ্লবী নিকারাগুয়ায়, মুক্ত নিকারাগুয়ায় সবাই সবার "কম্পানিয়েরো"। শব্দটি একাধিক অর্থ বহন করে ঃ কমরেড, সহগামী, সহমর্মী, বন্ধু, সাথী। এমনকি প্রেমিক প্রেমিকাও একে অন্যের "কম্পানিয়েরো" বা "কম্পানিয়েরা"।

সান্দিনিস্তা নির্বাহী দপ্তরের মতো এতো গুরুত্বপূর্ণ এক আপিসের রক্ষীরা আমায় কি কারণে এতো সহজে ছেড়ে দিলেন, ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছি। ক্ষমতা দখলের পর থেকেই নানান উপদ্রব চলেছে সমানে। প্রতিবিপ্লবীরা চেষ্টা করে যাচ্ছে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার একটা পরিবেশ তৈরী করতে। নাশকতামূলক ও অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপের খবর প্রায়ই থাকে। রক্ষীরা,—বিশেষত ঐ বয়স্ক রক্ষীটি তাহ'লে কোন হিসেবে আমায় পরীক্ষা করলেন না, ব্যাগটা দেখতে চাইলেন না, এমনকি একটা পরিচয় পত্রও দাবি করলেন না! তাহ'লে কি এ'দের দায়িত্বজ্ঞান শিথিল ? নাকি নিজেদের বিচার বিবেচনার ওপর এ'দের আস্থা এতো যে এ'রা ঝুঁকি নিতে কসুর করেন না ? অবশ্য এও হতে পারে যে আমার চেহারা, হাবভাব দেখেই তাঁরা বুঝে নিয়েছেন যে নাশকতামূলক কাজ করার মুরোদ আমার নেই।

সান্দিনিস্তা দপ্তরের কনফারেন্স কক্ষে অপেক্ষা করতে বলা হলো আমায়। সাধারণ ঘর। বিলাসের চিহ্নমাত্র নেই। বড় একটা টেবিল। চারপাশে চেয়ার। একটা জিনিষও নতুন নয়। কিন্তু সবকিছু পরিষ্কার। গোছানো। এক দেয়ালে আউগুস্তো সান্দিনো ও কার্লোস ফনসেকার ছবি। অপর দেয়ালে একটি মাত্র ছবি—ফ্রন্টের কর্তারা, অর্থাৎ 'কমান্দান্তে' বা গেরিলা কমাণ্ডাররা। বাকি দুটো দেয়াল ফাঁকা।

আনতোনিয় হারকিনের জন্য বসে আছি। সকালে আমায় সান্দিনিস্তা দপ্তর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে আনতোনিয় রীতিমতো হোমরা চোমরা একজন লোক। একসময়ে ওয়াশিংটনে নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

বর্তমানে নানান দেশের সংগে সানদিনিস্তা ফ্রন্টের সম্পর্ক বিষয়ক বিভাগের কর্তা। অর্থাৎ সানদিনিস্তাদের মধ্যে তিনি বেশ ওপর মহলের লোক।

এই রকম ভূমিকা ও পরিচিতি শুনে ভেবেছিলাম এক ভারিক্কি চেহারা ও চালের ভদ্রলোককে দেখবো,—বেশ কূটনীতিক-কূটনীতিক নিশ্চয়ই। ওমা, তিনটে বেজে পাঁচ মিনিটে একমুখ হাসি নিয়ে, এবং পাঁচ মিনিট দেরী হয়ে যাবার জন্য সরবে ক্ষমা চাইতে চাইতে যিনি ঘরে ঢুকলেন, তিনি এক সুদর্শন তরুণ। সংগে আরো কম বয়সী এক সহকারী।

আনতোনিয় হারকিন আলাপের শুরুতেই বললেন: "সানদিনিস্তা ফ্রন্টের তরফে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে, সেই সংগে জানাই বিপ্লবী অভিবাদন নিকারাগুয়ার জনগণের সংগে আপনার সংহতির জন্য।"

বেশ অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি। মুখের কথাটথা সব আটকে গেল।

আনতোনিয় বলে চললেন: "নানান ঝঞ্ঝাট ঝামেলা চলছে দেশের ওপর দিয়ে, ফলে কাজকর্মে একটু এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে। এই যেমন গতরাতে আপনাকে একা একা একটা হোটেল খুঁজে নিতে হলো। এই অসুবিধের জন্য আমি সানদিনিস্তা ফ্রন্টের তরফে মাফ চাইছি।"

আমি এবারে 'আরে না না, এ আর এমন কি'-গোছের কিছু একটা বলতে যাচ্ছি,—আনতোনিয় আমায় সে সুযোগ না দিয়ে চোস্ত ইংরিজিতে বলে চলেছেন:

"আপনি এর্নেস্তো কার্দেনালের অতিথি। এর্নেস্তোকে বিশেষ কাজে বাইরে যেতে হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আপনার দায়িত্ব নেবেন। আজকের রাতটা হোটেলেই থাকুন। আমরা খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। আগামীকাল সকালে আপনি আন্তর্জাতিক প্রেস সেন্টারে যান। এই চিঠিটা দেবেন। সেখানে প্রেসকার্ড সংগ্রহ করে যেতে হবে আপনাকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে। সেখানে সবাই অপেক্ষা করবেন আপনার জন্য।—এবারে বলুন আপনার পরিকল্পনাটা ঠিক কিরকম।"

খুলে বললাম। নিকারাগুয়ার বিপ্লবের ওপর বাংলায় একটা বই লিখতে চাই। সপ্তাহ তিনেক থাকবো ভাবছি।

আনতোনিয় হারকিন যাবতীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর বললেন: "দেশটাকে যতোটা পারেন জানুন। দেখে নিন, বুঝে নিন বিপ্লব কী জটিল একটা ব্যাপার। তার কতো সমস্যা। আমরা কোথায় কতোটা কাজ করতে পেরেছি, কোথায় পারিনি—সব দেখে নিন। সুষম ধারণা গড়ে নিন। আমাদের, মানে সানদিনিস্তাদের কথা শুনুন। আবার আমাদের বিরোধীদের কথাও শুনুন মন দিয়ে। দু'পক্ষকেই সমান গুরুত্ব দিন। আপনার লেখায় যেন বিপ্লববিরোধীদের, সানদিনিস্তাবিরোধীদের বক্তব্য,

সমালোচনা, সমুচিত প্রাপ্য গুরুত্ব পায়। সাধারণ মানুষ, 'কাম্‌পেসিনো' বা গাঁয়ের মানুষের সংগে কথা বলুন, আলাপ করুন চার্চের লোকদের সংগে, বিপ্লবী যাজকদের কাছে যান, ছাত্রছাত্রীদের সংগে কথা বলুন, শিল্পী, শিক্ষক শ্রমিক সকলকে চিনুন, আলাপ করুন সকলের সংগে। গল্প করুন, মিটিঙে যান। আমরা সবদিক দিয়ে সাহায্য করবো আপনাকে।"

আন্‌তোনিয় হার্‌কিন যা বলে চলেছেন, তাঁর সহকারী ও আমি তার নোট নিয়ে যাচ্ছি। তিনি খাতায়, আমি মনে মনে। হার্‌কিনের চোখেমুখে, বাচনভঙ্গিতে, শব্দচয়নে, হাসিতে বুদ্ধিদীপ্ত, আন্তরিকতা, সততা। নরম গলায় কথা বলছেন। বেশী ভাবছেননা। সময় নিচ্ছেন না। শব্দ সাজাচ্ছেননা। অনর্গল বলে চলেছেন, অথচ তাড়াহুড়ো নেই।

তিনকাপ কফি এসে গেল। আমারই মতন ঘনঘন সিগারেট খাচ্ছেন আন্‌তোনিয় হার্‌কিন। আমার কাছে এক প্যাকেট মার্কিনী সিগারেট। বাড়িয়ে দিলাম। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেনঃ আমাদের দেশে ফিল্টার দেওয়া সিগারেট আর তৈরী হচ্ছেনা বলে ফিলটারহীন সিগারেটেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের নিকারাগুয়ায় তৈরী সিগারেটই বরং খেয়ে দেখুন একটা।

আমি এতোদিন মার্কিন সরকারের এক বিরাট প্রচারণাসংস্থায় চাকরি করেছি জেনে মুচ্‌কি হেসে আন্‌তোনিয় বললেনঃ "ভয়েস অফ আমেরিকা সমেত আমেরিকার অনেক সংবাদসংস্থা আমাদের নামে যা বলে চলেছে তার সত্যতা এবার স্বচক্ষে স্বকর্নে যাচাই করে নিন।"—'ভয়েস অফ আমেরিকা' নামটি উচ্চারণ করলেন তিনি হাসতে হাসতে। হাসিতে মজার ভাগটাই বেশী। শ্লেষ বা বিদ্রূপের লেশমাত্র নেই।

আমি বললামঃ 'মার্কিন সরকার যা শুরু করেছেন তাতে মনে হয়, ভারতীয় লেখক-সাংবাদিকের চেয়ে বন্দুকটন্দুকই বেশী দরকার এখন আপনাদের।'

আন্‌তোনিয় খপ্‌ করে আমার হাতটা ধরে ফেলে বললেনঃ "We need both"—দুটোই দরকার,—বলেই প্রাণখোলা হাসি।

রেগানের দৌরাত্ম্য ও রণং দেহী আচরণ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে একবারও কর্কশ হলোনা তাঁর কণ্ঠ। একটাও কড়া মন্তব্য শুনলাম না। একবারও মেজাজ গরম করলেন না আন্‌তোনিয়। অথচ তিনি মেপে কথা বলছেন না। সতর্কভাবে 'কথা' বাছাই করছেন না। নরম চোখে আমার দিকে চেয়ে খুব সহজ ভঙ্গিতে বলে চললেনঃ

"আমরা বন্দুক দিয়ে রেগানের জবাব দিতে চাইনা। আমরা জবাব দিতে চাই যুক্তি দিয়ে। যুক্তিই আমাদের অস্ত্র। বন্দুক নয়, যুক্তি চাই আমরা। আমরা আসলে যেরকম, বিশ্ববাসী আমাদের ঠিক সেভাবেই চিনুক,—এই আমাদের কামনা। সেই চিনে-নেবার ভিত্তিতে যুক্তি থাকা দরকার। শুধু

বন্দুক দিয়ে আমরা এক পরাশক্তির সংগে লড়তে পারবোনা। যুক্তির সাহায্যে লড়া সম্ভব। আমাদের এই বিপ্লব এক ন্যায্য যুক্তিসঙ্গত বিপ্লব।"

বিদায় নেবার আগে সান্দিনিস্তা ফ্রন্টের এই উচ্চপদস্থ কর্মী বারবার বললেন: "শুধু আমাদের কথা নয়, বিরোধীদের কথাও শুনুন। সমান মুল্য ও গুরুত্ব দিয়ে। বিপ্লবের পক্ষে ও বিপক্ষে যতো বক্তব্য রয়েছে সেগুলো যেন সুষমভাবে, সুসঙ্গতিপূর্ণ রূপ নিয়ে বাস্তবিক অর্থে স্থান পায় আপনার লেখায়। —আর হ্যাঁ, আপনি দেশে ফেরার আগে আর-একবার দেখতে চাই আপনাকে।"

আফশোষের কথা, এই সৎ বিপ্লবীর সংগে আর দেখা হয়নি আমার।

সন্ধ্যে থেকে তুমুল বৃষ্টি। ভয়ানক শব্দ করে, চারদিক কাঁপিয়ে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। ঘণ্টা দুই হয়ে গেল। অবিরাম। এতো দারুণ, তীব্র বৃষ্টি অনেককাল দেখিনি। বৃষ্টির তুমুল শব্দ গ্রাস করে ফেলছে সব কিছু। আর কিছুই যেন নেই,—শুধু হোটেলের এই ঘরে আমি, কমজোরী আলো, নোটবই, কলম, কিছু ক্যামেরা, সিগারেট (বাড়ন্ত), আর তুমুল, দিগন্তজোড়া বৃষ্টি ও তার দুর্দান্ত শব্দ।

আটই মে

সকালে 'সেন্‌ত্রো দে প্রেন্‌সা ইন্‌তেরনাসিয়োনাল' বা আন্তর্জাতিক প্রেস সেণ্টারে। আপিসে ঢুকতেই একটি মেয়ে মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলোঃ "এরেস এল্‌ কম্‌পানিয়েরো ইন্দু ?" —তুমিই বুঝি ভারতীয় কম্‌পানিয়েরো ? —বুঝলাম আন্‌তোনিয় হার্‌কিনের দপ্তর থেকে খবর পৌঁছে গিয়েছে।

তিন সপ্তাহের জন্য নতুন নামে অভিষিক্ত হলাম নিকারাগুয়ায়ঃ 'কম্‌পানিয়েরো ইন্দু'। 'ইন্দু' কথাটা শুনে প্রথমেই একটু খট্‌কা লাগলো। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম—"কম্‌পানিয়েরা, এই নামের মধ্যে 'হিন্দু' গোছের কোনো ব্যাপার নেই তো ?"

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠে বললোঃ "ইন্দু বললে হিন্দুও বোঝায় আবার ভারতীয়ও বোঝায়। ভারতীয়দের আমরা সাধারণভাবে 'ইন্দু' বলি। এই বলার মধ্যে কোনো ধর্মের গন্ধ নেই। 'কম্‌পানিয়েরো দে লা ইন্‌দিয়া' (ভারতের বা ভারত থেকে আসা কম্‌পানিয়েরো)-এই এতোগুলো কথা বলার চেয়ে 'কম্‌পানিয়েরো ইন্দ্‌' বলা ঢের সহজ, সময় কম লাগে, খাটনিও বাঁচে, তাই আরজি। —সে যাই হোক, এই আপিসে এই প্রথম একজন 'কম্‌পানিয়েরো ইন্দুকে' দেখলাম।"—বলেই আবার খিলখিল করে হাসি।

আপিসে সকলেই মহিলা। নানা বয়েসের। তবে তরুণীই বেশী। একজন পুরুষকেও দেখছিনা। দেখছি শুধু মেয়েদের হাসিমুখ। সান্‌দিনোর মেয়ে এরা। লড়াই, কাজ আর হাসি—তিনটিতেই সমান দক্ষ। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাংবাদিকের কার্ড পেয়ে গেলাম।

একটি মেয়ে একটা বড় কাগজ থেকে ছোট্ট একটুখানি ছিঁড়ে নিয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে কিসব লিখে দিলো তাতে। চিরকুটটা আমার হাতে দিয়ে বললো—"এটা নিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে চলে যাও। সেখানকার পাব্‌লিক রিলেশান্‌স্‌ অফিসার কম্‌পানিয়েরা লুইসা কর্তেস অপেক্ষা করছেন। তাঁকে এই চিঠিটা দিও। আর, দরকারে অদরকারে আমাদের আপিসে চলে আসতে দ্বিধা কোরোনা।"

চড়া রোদ মাথায় করে বেশ কিছুটা পথ ঠেঙিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে পৌঁছুলাম যখন, আমার প্রতিটি লোমকূপ থেকে তখন ঘামবৃষ্টি হচ্ছে।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় যেন একটা বিশাল আশ্রম। চারদিক খোলামেলা। সবুজে সবুজ। মাঠের এখানে ওখানে বিরাট বিরাট বটগাছ, ছায়া দিচ্ছে

বটগাছগুলো নিশ্চয়ই অনেককালের, কারণ ঝুরিগুলোই কোথাও কোথাও গুঁড়ির মতো মোটা। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে খড়ের চালা। তার নিচে সারিসারি বেঞ্চিপাতা। পরে জেনেছি এখানে প্রাপ্তবয়স্কদের আর শ্রমিকদের পাঠশালা বসে। এই জায়গাটায়—এতো গরমেও—দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া। খড়ের চালার পেছনে কয়েকটা বাড়ি। একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড বাস বা ভ্যান। এ হলো চলমান পাঠাগার। ভ্যানের গায়ে লেখা: নিকারাগুয়ার জনগণের প্রতি ভেনেজুয়েলার জনগণের উপহার। এরকম চলমান পাঠাগার আরো অনেক আছে। গ্রামে গ্রামে, দেশের কোণে কোণে জনগণের হাতে বই তুলে দিয়ে আসে এই গাড়িগুলো।

চারদিকে শান্তি ও স্নিগ্ধতার ছোঁয়া। ছেলেবেলায় শান্তিনিকেতনে গিয়ে এরকম মনে হয়েছিল।

লুইসা কর্তেস—বছর পঁচিশেকের এক তরুণী—কাজ করছেন ছোট্ট একটি আপিসে। তাঁর হাতে চিরকুটটা দিতেই তিনি আরো কয়েকজন কম্‌পানিয়েরাকে ডাক দিলেন। একে একে পরিচয় হলো: কার্লা আল্‌বারাদো, মাগালি কর্‌রালেস, লিদিয়া ফর্‌বেস। ব্রেন্দা নামে খুবই কমবয়সী একটি মেয়েও হাজির।

কারুরই বয়েস তিরিশের বেশী নয়। সংস্কৃতি দপ্তরেও বেশীরভাগ কর্মী মহিলা।

লুইসা, কার্লা, মাগালি—সকলেই সাংবাদিক। সংস্কৃতি দপ্তরের সংগে যুক্ত।

প্রথমেই লুইসা একচোট ক্ষমা চেয়ে নিলো আতিথেয়তার ত্রুটির জন্য। এর্নেস্তো কার্দেনাল বিদেশ যাবার আগে পইপই করে বলে গিয়েছেন, আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি যেন না হয়।

অথচ আমায় দু'রাত "কষ্ট করে" হোটেলে থাকতে হলো—ছি ছি। এখুনি আমরা তোমার সংগে হোটেলে গিয়ে তোমার মালপত্র তুলে নিয়ে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবো আমাদের অতিথিশালায়। গড়গড় করে বলে গেল লুইসা: "একটা গাড়ি থাকবে তোমার জিম্মায়। চালক সমেত। যেখানে যেতে চাইবে, নিয়ে যাবো আমরা। কোথায় কোথায় যেতে চাও, কার সংগে দেখা করতে চাও বলো, আমরাও একটা কর্মসূচী তৈরী করছি।"

প্রাথমিক পরিকল্পনা হয়ে গেল এক ঘণ্টায়। কথা যখন চলছে, আমি তখন আড়চোখে দেখে নিচ্ছি ঘরটা। আসবাবপত্র একটু আধুনিক। লুইসার চেয়ারের পেছনে বই-এর তাক। তাতে অন্যান্য বই-এর মধ্যে লেনিন ও মার্ক্‌স্‌-এর দুটি রচনা সংকলন রয়েছে। দেয়ালে ঝুলছে সান্দিনোর ছবি। অপরদিকে 'সোলেন্তিনামে' শৈলীতে আঁকা একটি পেন্টিং।

'সোলেন্‌তিনামে' একটি দ্বীপ। সেখানে সোমোসার আমল থেকেই এর্নেস্তো কার্দেনাল একটি আশ্রম খুলেছিলেন স্থানীয় চাষী, মজুর আর লোকশিল্পীদের নিয়ে। সমাজচিন্তা ও বিপ্লবচিন্তাকে এর্নেস্তো মিশিয়ে দিয়েছিলেন ঈশ্বরচিন্তা, কর্মযোগ ও শিল্পচিন্তার সংগে। একদিকে 'সোলেন্‌তিনামের' সাধারণ গ্রামবাসীরা সৃষ্টি করেছিলেন খৃষ্টধর্মের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা, সহজ সরল ভাবনা দিয়ে এক শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলার তত্ত্ব। অপরদিকে এই শান্ত দ্বীপের লোকশিল্পীরা জন্ম দিয়েছিলেন ছবি আঁকার এক আপাত সহজ-সরল অথচ রং ও রেখার গূঢ় রসায়নে ও সমাজমুখী শিল্পচেতনায় সমৃদ্ধ অতি নিজস্ব এক ঢং, আঙ্গিক। ইউরোপে-খ্যাত 'ইয়ুগেণ্ড স্টিলের' আত্মিয় এই আঙ্গিক। সোলেন্‌তিনামের এই বৈশিষ্ট্য থেকেই তৈরী হয়েছে একটি আলাদা ঘরানা।

কম্‌পানিয়েরা লিদিয়া সুন্দর ইংরেজী জানে। কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে স্প্যানিশ বলে বলে আমি হাঁফিয়ে উঠেছি দেখে সে বললো, 'চলো, মন্ত্রণালয়টা তোমায় ঘুরে ঘুরে দেখাই।'

ইতিমধ্যে কার্লা বসে গিয়েছে টেলিফোনের কাছে। আমার না-পৌঁছুনো সুটকেসটা উদ্ধার করার সংকল্প নিয়ে সে কথা বলছে বিমান আপিসের সংগে।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়টা বিপ্লবের আগে ডিক্‌টেটর সোমোসার বাগানবাড়ি ছিল। বেশ এলাহি ব্যাপার। বিপ্লবীরা খোলনলচে পাল্টে দিয়েছেন। প্রতিটি ঘরেই কোনো-না-কোনো দপ্তর।

একটি বড় ঘরে শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন। শ্রমিকদের জন্য চমৎকার ব্যবস্থা। কোনরকম বৈষম্য চোখে পড়ছেনা। বয়স্ক শ্রমিকদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা রয়েছে। সারা দেশ জুড়ে নিরক্ষরতা দূর করার যে অভিযান চলছে তারই একটা আদর্শ, জীবন্ত নমুনা এই সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে।

সোমোসার আমলে নিকারাগুয়ায় কোনো সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ছিলনা। এটা বিপ্লবের এক অন্যতম ফসল। এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের চেয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব কম তো নয়ই, বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব ও মূল্য কিছু বেশী। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অভিযান ও তৎপরতার মধ্য দিয়ে সারা নিকারাগুয়ার মানুষ খুঁজে পাচ্ছে এক নতুন বৈপ্লবিক পরিচিতি। জন্ম নিচ্ছে মুক্ত নিকারাগুয়ার এক বৈপ্লবিক সংস্কৃতি,—দেশের সকল মানুষ যার শরীক, অংশীদার। বিপ্লবী যাজক কবি এর্নেস্তো কার্দেনালকে বিপ্লব সফল হবার পরই এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ও অসংখ্য কম্‌পানিয়েরো-কম্‌পানিয়েরার ঐতিহাসিক কাজ একবার নিজের চোখে দেখার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকে ছুটে আসে এই সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে। আসেন কবি, শিল্পী, সংগীতকার, ইতিহাসবেত্তা, রাজনীতিক,

সাংবাদিক, যাজক, বিপ্লবী, সমাজবিজ্ঞানী, স্থপতি, ভাস্কর, নৃত্যশিল্পী কারিগরের দল।

সকল কর্মীর সংগে আলাপ করিয়ে দিচ্ছে লিদিয়া। মজদুরের সংগেও আলাপ হলো, আবার নিকারাগুয়ার এক খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের সংগেও কথা হলো পথ চলতে।

এককালে যেখানে সোমোসার ঘোড়ার আস্তাবল ছিল, সেখানেও আজ বসে গিয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের পাঠশালা। একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির সামনে থমকে গেল লিদিয়া। গুঁড়িটা ওপর থেকে কেটে ফেলা হয়েছে। লিদিয়া বললো: "সোমোসা যেদিন খুন হয়, সেদিন বাজ পড়েছিল এই গাছটার ওপর। বিরাট গাছটা এক নিমেষে জ্বলে গিয়ে ভেঙে পড়েছিল মুখ থুবড়ে।"

আমি বললাম—"কি আশ্চর্য, গাছের মতো এতো সুন্দর, শ্রীবন্ত ও প্রয়োজনীয় প্রাণীর তো ও-হেন এক স্বৈরাচারীর, মানুষের শত্রুর মৃত্যুতে ফুলে-ফলে—নতুন-পাতায় আটখানা হবার কথা। তা না, শেষে বাজ প'ড়ে আট টুকরো হলো!"

লিদিয়া বললো: "কে জানে, হয়তো এই-সোমোসার বাবা আগের সোমোসা পুঁতেছিল এ-গাছের চারা। এ-গাছ হয়তো সোমোসাতন্ত্রের প্রতীক। শেষ সোমোসা খতম হওয়ায়, আর বিপ্লব সফল হওয়ায় প্রকৃতির বুকে এই গাছটার অস্তিত্বের আর কোনো যুক্তিই রইলো না।"

সানদিনিস্তাবিপ্লবীরা নিকারাগুয়ায় ক্ষমতা দখল করার ঠিক আগেই আনাস্তাসিয়ো সোমোসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যান। ১৯৮০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর এক আর্জেনটাইন কমাণ্ডো ইউনিট পারাগুয়াই-এর আসুন্সিয়ন্ শহরে সোমোসাকে তাঁর দামী গাড়ী সমেত উড়িয়ে দেন।

সোমোসার প্রাক্তন বাগানবাড়ি থেকে জিপগাড়ি চেপে এক প্রাক্তন 'সোমোসিস্তা' অর্থাৎ সোমোসাপন্থীর বসত বাড়ি। বিপ্লবের পর এই বাড়িটা সরকারি অতিথিশালায় পরিণত হয়েছে। প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ-বাড়ির প্রাক্তন মালিকও পালিয়ে গিয়েছেন বিদেশে, সম্ভবত মায়ামিতে।

জিপগাড়ির চালক লিয়েস আসলে এর্নেস্তো কার্দেনালের চালক। এর্নেস্তো বিদেশ সফরে যাওয়ায় তরুণ লিয়েস ক'দিনের জন্য এর্নেস্তোর ভারতীয় অতিথির দায়িত্ব নিচ্ছেন।

পথে হোটেল থেকে আমার জিনিষপত্র তুলে নেওয়া হলো। কার্লা, মাগালি ও ব্রেন্দা তিনজনেই এলো আমায় ১৬ নম্বর প্রোটোকল হাউস-এ পৌঁছে দিতে। শোবার ঘরটা ভাগ করে নিতে হবে এক ফরাসী কম্-পানিয়েরোর সংগে। তাঁকে দেখছিনা অবশ্য।

বাড়িটা ভারী সুন্দর। দেখেই বোঝা যায়, এ-বাড়ির মালিক বিপ্লবের

আগে কি সুখেই না ছিলেন! চমৎকার সব আসবাব, দারুণ দামী। সুন্দর বাগান। মাঝখানে উঠোন আর সুইমিং পুল।

দুপুর আড়াইটের সময়ে কম্পানিয়েরা কার্লা এলো আমায় একটা সংগ্রহশালায় নিয়ে যাবার জন্য। সশস্ত্র সংগ্রাম ও বিপ্লবের সংগ্রহশালা। সামনেই রাখা রয়েছে একটা ট্যাংক ও একটা সাঁজোয়া গাড়ি। দুটোই যেন হাতে তৈরী। দেখেই বোঝা যায় যে অস্ত্রের কোনো পোষাকী কারখানা থেকে এগুলো বেরোয় নি। বিপ্লবীরাই এগুলো নিজেদের কর্মশালায় তৈরী করে নিয়েছেন—মোটরগাড়ির অংশ, টায়ার, পুরু টিন ও লোহার পাত, লোহালক্কড় ইত্যাদির সাহায্যে। ঘরে মাথা খাটিয়ে তৈরী বন্দুক (পাইপগান) ও বোমার কথা জানি, তার দর্শনও পেয়েছি আগে। কিন্তু বিপ্লবীদের প্রয়োজনের তাগিদে হাতে হাতে গড়া ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ি দেখার সুযোগ কখনো হয়নি। এগুলোর ছবিও দেখিনি কখনো। তাক্ লেগে গেল। এগুলোরই সাহায্যে নিকারাগুয়ার বিপ্লবীরা লড়াই করেছেন তুখোড়, প্রায়-অজেয় মার্কিনী অস্ত্রের বিরুদ্ধে। এবং যুদ্ধে তাঁরাই জিতেছেন।

চত্বরের একপাশে খাড়া করা ব্যারিকেড। রাস্তার ইঁটপাথর খুলে নিয়ে শহরের বিদ্রোহী ছেলেমেয়ের দল ব্যারিকেড খাড়া করেছিলেন পথে পথে। তারই আড়াল থেকে লড়েছিলেন তাঁরা। ওরকমেরই একটা ব্যারিকেড এখানে রাখা।

বছরের পর বছর ধরে যে তীব্র লড়াই ও দারুণ আত্মত্যাগের মূল্যে নিকারাগুয়ার মানুষ মুক্তি লাভ করেছেন, সান্দিনিস্তারা চান না যে লোকে সেটা ভুলে যাক। নিকারাগুয়ার গৃহযুদ্ধে প্রাণ গিয়েছিল চল্লিশ হাজার মানুষের। সে-সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল পঁচিশ লক্ষ মতো।

সংগ্রহশালাটি অনাড়ম্বর। গাঁথুনি ও দেওয়াল ইঁটের। কিন্তু টিনের চাল। নানান বিপ্লবী ও গেরিলার ব্যবহার করা অস্ত্র, জামাকাপড় ইত্যাদি রাখা। কিছু কিছু জামায় স্পষ্ট রক্তের দাগ। জেনারেল সান্দিনোর ব্যবহার করা বেশ কিছু জিনিষও রয়েছে এখানে। বিশেষত অস্ত্র। আর আছে রাশি-রাশি মূল্যবান ছবি (আলোকচিত্র)। নিকারাগুয়ার ইতিহাসে যেসব ঘটনা, ব্যক্তি ও মুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ তারা ধরা রয়েছে এখানে ছবিতে।

দেখছি রিগোবের্তো লোপেস পেরেস-এর ছবি। ১৯৫৬ সালে নিকারাগুয়ার লেয়ন শহরে এক ভোজসভায় এই তরুণ কবি প্রথম-সোমোসাকে (আনাস্তাসিয়ো সোমোসা গার্সিয়া) খুন করেছিলেন। রিগোবের্তো খুব ভালো করেই জানতেন যে তিনিও আর বেঁচে ফিরবেন না। ফেরেনও নি। ন্যাশনাল গার্ডের গুলিতে তিনি সংগে সংগে মারা যান। রিগোবের্তো লোপেস পেরেস-এর মৃতদেহর ছবির সংগে ছাপার হরফে রাখা রয়েছে তাঁর লেখা শেষ কবিতাটি। সোমোসাকে খুন করার আগে লিখেছিলেন তিনি এই কবিতা।

শিরোনাম ঃ 'আন্সিয়েদাদ' বা উৎকণ্ঠা। কবিতাটি স্প্যানিশেই টুকে নিলাম। শিথিল তর্জমায় কবিতাঠি দাঁড়ায় এইরকম ঃ

দিন কাটে তীব্র যন্ত্রণায়
আমি সারা স্বদেশের বেদনা-শরিক।
আমার হৃদয়ে
মুক্তিকামী বীর গর্জায়।
অত্যাচারীর খুন যতোদিন বইবে তার শিরায় শিরায়
আমার দিনরাতের ফুলগুলো
ততোদিন বিবর্ণ, নতমুখ।
স্বৈরাচারীর লাসে, রক্তের স্রোতে
খুঁজি আমি মুক্তির রূপোলী চাঁদামাছ ॥

বাড়ি ফিরে আলাপ হলো এক রুশ মহিলার সংগে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এসেছেন তাঁর স্বামীর সংগে। মহিলার নাম লুবা, তাঁর স্বামীর নাম ইউরি। ইউরি নিকারাগুয়ায় বেহালা শেখাচ্ছেন। বছর খানেক থাকবেন এখানে। দু'জনেই অল্পবিস্তর স্প্যানিশ জানেন। বেশ সদালাপী ও হাসিখুশী। লুবা সোভিয়েত ইউনিয়নে গণিতের অধ্যাপিকা। বছরখানেকের ছুটি নিয়ে এসেছেন ইউরির সংগে থাকবেন বলে।

আরো কয়েকজন রুশী শিল্পী রয়েছেন নিকারাগুয়ায়। এই বিশেষ অতিথিশালায় লুবা ও ইউরি ছাড়াও আছেন বরিস। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এসেছেন 'ব্যালে' শেখাতে। ইউরি আর বরিস কাজ করছেন সরাসরি সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে।

বরিস বেচারা এক বর্ণ স্প্যানিশও জানেনা। দু'দিন হলো এসেছে।

সন্ধ্যের মধ্যেই ইউরি আর লুবার সংগে ভাব হয়ে গেলেও বরিস বিরস বদনে বসে রইল একটু তফাতে। লুবা বললো, বেচারার মন কেমন করছে বাড়ির জন্য। বরিসের এই প্রাথমিক গাম্ভীর্য সত্ত্বেও, পরে আবিষ্কার করেছি যে ও-ই সবচেয়ে দিলখোলা ও রগুড়ে।

খাবার টেবিলে হঠাৎ ঝড়ের মতো হাজির হলেন অতি সাদামাটা পোষাক পরা এক হাসিখুশী তরুণী। শ্বেতাঙ্গিনী। তিনি ধরেই নিলেন যে আমি নিকারাগুয়ান। তরুণীটি এতো সাবলীলভাবে অনর্গল স্প্যানিশ বলছেন যে বেশ ধাঁধাই লাগলো প্রথমে। কোথাকার কোন্ দেশের লোক? মিনিট দুয়েক স্প্যানিশে আলাপ পরিচয় চলতেই তিনি বুঝে গেলেন যে আমি কলকাতার ছেলে, আর আমি জেনে গেলাম যে 'স্টেসি' ক্যালিফর্নিয়ার মেয়ে। ছবি এডিটিং-এর কাজ করতে নিকারাগুয়ায় এসেছেন স্টেসি এক নিকারাগুয়ান পরিচালকের আমন্ত্রণে।

একই বাড়িতে অন্তত একজন ইংরিজীভাষী মানুষ থাকেন—এটা জেনে আমি

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার স্প্যানিশজ্ঞান এতোই সীমিত যে গালগপ্প করা বেশ মুশকিল।

কী ধরণের ছবি স্টেসি এডিট করছে জানতে চাওয়ায় স্টেসি বললো : "তুমি তো জানোই, নিকারাগুয়ার কফি চাষে সাহায্য করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে লোকে দল বেঁধে আসে। আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য এ-দেশের ছেলেদের সমানে ফ্রন্টে যেতে হচ্ছে। ফলে ক্ষেতখামারে কাজের লোকের অভাব। সান্দিনিস্তা বিপ্লবের সমর্থক এমন অনেকে বিদেশ থেকে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও চলে আসেন নিকারাগুয়ায়। মাসের পর মাস তাঁরা থাকেন, কফি তোলেন। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে। এ'দের বলা হয় 'ব্রিগাদিস্তা'। এই ব্রিগাদিস্তাদের নিয়েই একটা ছবি তুলেছেন এ দেশের এক মহিলা। আমায় নিয়ে এসেছেন ছবিটা এডিট করতে।"

কথায় কথায় স্টেসি জানিয়ে দিলো যে পেশার তাগিদে সে মোটেও আসেনি, কারণ টাকা পাচ্ছে সে নামমাত্র। থাকাখাওয়া আর স্টুডিয়োয় যাওয়া-আসা অবশ্য নিখরচায়। আসলে স্টেসি নিকারাগুয়ার বিপ্লবের সমর্থক। এবং বিপ্লবী নিকারাগুয়াকে দেখা ও বোঝার একটা চমৎকার সুযোগ পাওয়া যাবে বলেই সে কাজটা নিয়েছে আগ বাড়িয়ে।

ন-ই মে

সকালে কম্‌পানিয়েরো লিয়েস এসে নিয়ে গেল সংস্কৃতি দপ্তরে। আজ আমার জানানোর কথা, সান্‌দিনিস্তা বিপ্লব ও নিকারাগুয়ার কোন দিকগুলোর ওপর আমি জোর দিতে চাই আমার লেখায়। তিন সপ্তাহ নেহাত কম সময় নয়। আবার নিকারাগুয়ার জনজীবন ও বিপ্লবের সবকটা দিক ও খুঁটিনাটি সম্পর্কে ধারণা গড়ে নেওয়াও সম্ভব নয় তিন সপ্তাহের মধ্যে। সে জন্য বছর-খানেক কমসে কম থাকা দরকার। কাজেই এ-যাত্রায় আমায় কিছু বাছাই করতে হবে, নয়তো অল্প সময়ে সব কিছুর স্বাদ পেতে গেলে গোলমাল হয়ে যেতে পারে, অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে বিশৃঙ্খলা ও সঙ্গতিহীনতা দেখা দেওয়া সম্ভব, তাছাড়া বদহজম হবার আশংকা তো আছেই।

অতএব সংস্কৃতি দপ্তরে আমি জানিয়ে দিলাম যে বিপ্লবী নিকারাগুয়ার সংস্কৃতি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি প্রথমত জানতে আগ্রহী। তাছাড়া সরকার বিরোধী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের সংগেও কথা বলতে চাই।

*　　　　*　　　　*

কার্লা, মাগালি ও লিয়েসের সংগে টহল শুরু। প্রথম গন্তব্য জাতীয় যাদুঘর ও সংগ্রহশালা। বাড়িটা ছোটর ওপরেই। কিন্তু সাজিয়ে রাখা জিনিষের অভাব নেই। আবার বাহুল্যের ধাক্কাধাক্কিও এড়ানো হয়েছে সযত্নে। যাদুঘরের অধ্যক্ষা স্বয়ং আমার গাইড। মহিলার বেশ বয়েস হয়েছে। কিন্তু অক্লান্তভাবে বলে চলেছেন নানান কাহিনী। নিকারাগুয়ার মাটি ও পাথরের গঠনপ্রকৃতি থেকে নিয়ে এ-দেশের প্রাণীজগৎ, কোন এলাকায় কী ধরণের পাখী থাকে, কোন নদীতে কোন জাতের কুমির, প্রাগৈতিহাসিক কোন প্রাণীর ফসিল নিকারাগুয়ার কোথায় পাওয়া গিয়েছে, কলোম্বাস আসার আগে নিকারাগুয়ার ইণ্ডিয়ানরা কি ধরণের হাঁড়িকুড়ি বা পানপাত্র গড়তেন, পোড়া মাটির কাজ কিভাবে হতো, লোকশিল্পীরা কোন মাটি বা গাছের পাতা থেকে কি রকমের রং তৈরী করতেন—সবকিছুই তাঁর নখদর্পনে। আমার যাতে বুঝতে অসুবিধে না হয় সেজন্য বেশ ধীরে ধীরে কথা বলছেন তিনি, শব্দগুলো উচ্চারণ করছেন স্পষ্ট করে।

বিপ্লবের আগে, সোমোসার যুগে নিকারাগুয়ার শাসকশ্রেণী তাঁদের দেশের ইতিহাস, ভূগোল সম্পর্কে যতোটা উদাসীন ছিলেন, স্বদেশের সম্পদ, নিজস্বতা,

সংস্কৃতি সম্বন্ধেও ছিলেন তাঁরা ততোটাই অজ্ঞ ও অন্ধ। অমূল্য সব প্রিকলোম্বিয়ান শিল্প নিদর্শন সোমোসার আমলে চলে গিয়েছিল বিদেশে। আমদানি করা জিনিষপত্র, পণ্যের চাপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছেন নিকারাগুয়ার কারিগর, কুমোর, কামার পটুয়ারা। লোপ পেয়েছে ইণ্ডিয়ানদের বহু হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প। মার্কিন নির্ভর অর্থনীতি গ্রাস করে ফেলেছিল এ-দেশের লোকসংস্কৃতি, গ্রামীণ উৎপাদনব্যবস্থা।

তাছাড়া স্বৈরতন্ত্র বজায় রাখতে গিয়ে সোমোসা ও ন্যাশনাল গার্ড যখন গ্রামবাসীদের ওপর নির্যাতন চালাতো, তখন তারা তাঁদের সৃষ্টি ও উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোকেও চুরমার করে দিয়ে যেত। সোলেন্তিনামে দ্বীপে এর্নেস্তো কার্দেনাল ও তাঁর অনুগামী গ্রামবাসীরা প্রিকলোম্বিয়ান শিল্পের বহু অমূল্য নিদর্শন সংগ্রহ করে এনে রেখেছিলেন। সমাজসচেতন ও বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন সাধারণ চাষী, তাঁতি, জেলে, কুমোর কামার কারিগর—এঁরা সেইসব প্রাচীন মূর্তি, পট, হাতিয়ার, খোদাই করা জিনিষ, নক্সাকাটা হাঁড়ি বা পানপাত্রগুলোকে আগলে রেখেছিলেন তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টির আদর্শ হিসেবে।—সোলেন্তিনামে দ্বীপের বাসিন্দারা সমাজ ও রাজনীতিসচেতন এবং বিপ্লবকামী হয়ে উঠেছেন এই খবর পেয়ে সোমোসা ঐ দ্বীপের ওপর বিশেষত প্রাচীন শিল্পের সংগ্রহশালাগুলোর ওপর বোমা ফেলার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছিল।

জাতীয় যাদুঘর ও সংগ্রহশালার অধ্যক্ষা বারবার বললেন: আজ যে এই সংগ্রহশালা, এতো সব অসাধারণ জিনিষ দেখছেন, বিপ্লব না হলে এসব দেখতে পেতেন না। সোমোসার আমলে যেসব প্রিকলোম্বিয়ান শিল্পনিদর্শন, আদ্যিকালের ইণ্ডিয়ানদের তৈরী জিনিষপত্র বিদেশে বেচে দেওয়া হয়েছিল, বিপ্লবের পর সান্দিনিস্তা সরকার বিদেশী সরকারগুলোকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তার অনেক কিছুই ফিরিয়ে এনেছেন। এতো গরীব দেশ, টাকার এত অভাব, তবু সেরকম বুঝলে বিপ্লবী সরকার বেশ মোটা টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছেন কিছু মূল্যবান প্রাচীন শিল্পসম্পদ অন্যান্য দেশের কাছ থেকে। এগুলো নিকারাগুয়ার মানুষেরই সৃষ্টি, তাঁদেরই সম্পত্তি। বন্ধুভাবাপন্ন কিছু দেশ আবার নিকারাগুয়ার ইণ্ডিয়ান শিল্পের কিছু প্রাচীন নিদর্শন নিজেদের সংগ্রহ থেকে ফেরত দিয়েছেন শুভেচ্ছার স্মারক হিসেবে।

এরপর 'এসকুয়েলা নাসিয়োনাল দে আর্তে প্লাস্তিকা'—ন্যাশনাল স্কুল অফ প্লাসটিক আর্টস্। ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুল এখন সান্দিনিস্তা সরকারের অধীনে।

শিল্পী হুলিয়ো ভাইয়েহো'র সংগে আলাপ হলো। বিপ্লবের সাত বছর আগে থেকে হুলিয়ো এই স্কুলের শিক্ষক। হুলিয়ো বললেন: বিপ্লবের আগে সামান্য ক'জন ছাত্র আসতো এখানে। বিপ্লবের পর তারা আসছে দলে

দলে। এখানে শিখতে গেলে টাকা-পয়সা তো লাগেই না, উপরন্তু শিল্পের কাঁচামালগুলো ছেলেমেয়েদের জোগানো হয় বিনামূল্যে।—এরকম মহাশিক্ষায়তন অবশ্য সারা দেশে এই একটাই। শতকরা তিরিশ জন ছাত্রছাত্রী আসেন দূর এলাকা থেকে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিপ্লবের আগে এই স্কুলটা কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই চলতো, যেমন তেমন ভাবে। এখন আর সে দিন নেই।

প্রশ্ন ঃ সোমোসার আমলে শিল্পীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা কি পরিমাণে ছিল ?

হুলিয়ো ঃ '৬২ সাল পর্যন্ত,- বিশেষত এই স্কুলে, বড়লোকরাই আসতেন। তাঁরাই ছিলেন শিল্পী। তবে কিউবার বিপ্লবের পর গোটা লাতিন আমেরিকাতেই তার প্রভাব পড়ে। এবং এখানেও। '৬২ সাল নাগাদ দেখা গেল, অন্যান্য শ্রেণী থেকেও লোক আসছে। তবে শিল্পে রাজনীতির প্রতিফলন ছিল না।

পরে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কিছু শিল্পী 'প্রাক্সিস্' নামে একটি দল গড়লেন। তাঁরা প্রতিবাদের ছবি আঁকতে লাগলেন, তবে প্রচ্ছন্নভাবে। প্রকট প্রতিবাদ তখনো নিকারাগুয়ার ছবিতে ভাষা পায়নি। পরে পেলেও, তার জন্য শিল্পীদের খুব একটা বিপদে পড়তে হয়নি। কারণ, সোমোসা শিল্পটিল্পকে একেবারেই গুরুত্ব দিতেন না। বড়লোকরা এমনকি প্রতিবাদের ছবিগুলোও কিনে নিয়ে যেতেন।

বিপ্লবের পর এই স্কুলে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হয়েছে। সান্দিনিস্তারা শিল্পীদের জন্য কোনো 'লাইন' বা ধারা বেঁধে দেননি। তথাকথিত "আদর্শ শিল্পের" কোনো সংজ্ঞা বেঁধে দেননি তাঁরা। যে যেমন ইচ্ছে কাজ করতে পারে, তবে হ্যাঁ দক্ষ, কুশলী হতে হবে, "টেক্নিক" রপ্ত করতে হবে। বিপ্লবের পর 'বৈপ্লবিক শিল্পের' কোনো ঘরানা তৈরী করার চেষ্টা এই স্কুলে হচ্ছে না।

—অনেক ছবি দেখছি। ছাত্রছাত্রীদের আঁকা। অধিকাংশই স্টিল্‌লাইফ। বিশেষ বিশেষ কায়দা ও ঢং আয়ত্বে আনার চেষ্টা। বিপ্লবের দরুণ দুনিয়ার নানান শৈলী, কলাকৌশল ও আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতন হওে উঠেছেন এ দেশের শিল্পীরা। অনেকদিনের বন্ধ ঘরের দরজা জানলা খুলে দিয়েছে বিপ্লব।

শিল্পীরা ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে কফি ক্ষেতে ফসল তুলতে যান। কেউ কেউ ফ্রন্টে রয়েছেন, লড়াই করছেন প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে।

ভাবছি ঃ ক্ষমতা দখলের পর থেকে, (পাঁচ বছর হয়ে গেল) সমানে যুদ্ধ করতে, জরুরী অবস্থায় টিঁকে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন সান্দিনিস্তারা, নিকারাগুয়ার জনগণ। ১৯৭৯ সাল থেকে তাঁরা, সারা নিকারাগুয়া অবরুদ্ধ। তবু,

এই স্কুলে কোনো অ্যাজিটপ্রপ্ ছবি চোখে পড়ছে না। চোখে পড়ছেনা বন্দুকের ছবি, সৈনিকের ছবি।

জিজ্ঞেস করায় উত্তর পেলাম: এটা সচেতনভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। সচেতন-ভাবে দেখা হচ্ছে যাতে সংগ্রামী আতিশয্যের তোড়ে শৈল্পিক কলাকৌশল, নিষ্ঠানির্ভর শিল্পশিক্ষা, টেকনিকশিক্ষা ভেসে না যায়। —বুনিয়াদটা এরা পাকা করে তুলতে চান। নানান মাধ্যম, ভাষা, শৈলী আঙ্গিক তুলে দিতে চান ছেলেমেয়েদের হাতে। তাঁদের দক্ষ, কুশলী করে তুলতে চাইছেন সান্দিনিস্তারা।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল কলোম্বিয়ার লেখক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের উক্তি: "ভালো, চোস্ত লিখতে পারা হলো লেখকের বৈপ্লবিক দায়িত্ব, কর্তব্য।"

নিকারাগুয়ান শিল্পী হুলিয়োকে কথাটা বলতেই তিনি মন্তব্য করলেন: "বাজে বিপ্লবমার্কা ছবির চেয়ে ভালো করে আঁকা একটা ফুলের ছবি ঢের কাজের।"

হুলিয়ো ভাইয়েহোর সংগে আর-এক তরুণ শিল্পী রয়েছেন। তিনি ছবিও আঁকেন, আবার বন্দুক হাতে লড়াইও করেন। বিদায় নেবার সময়ে তিনি হঠাৎ বললেন: "রবিশঙ্করের বাজনা শুনতে বড় ইচ্ছে করে, মানে সামনে থেকে। সোমোসার আমলে রবিশঙ্কর, যদ্দুর জানি, মানাগুয়ায় বাজিয়ে গিয়েছেন। তখন তো আমরা লড়াই-এ ব্যস্ত। শুনতে পারিনি। মুক্ত নিকারাগুয়ায় তিনি যদি একবার আসতেন!"

কোথায় মানাগুয়া, সেখানেও এক লড়াকু শিল্পী তাঁর ছবি আঁকা, বিপ্লবচিন্তা আর সশস্ত্র গেরিলা-লড়াইয়ের সংগে রবিশঙ্করের কথাও ভাবছেন। এই হলো বিপ্লবী নিকারাগুয়া, নিকারাগুয়ার বিপ্লব, এবং এই হলেন রবিশঙ্কর।

আমি বললাম: একবার চেষ্টা করে দেখুননা, তিনি আসেন কিনা।

তরুণ শিল্পী বেশ করুণ মুখে বললেন: "ওঁকে আনার মতো টাকা যে আমাদের নেই।"

বিকেলবেলা বেরোলাম লিদিয়ার সংগে। চালক সেই লিয়েস।

প্রথমে কার্লোস ফন্সেকার সমাধি। আমিই আসতে চেয়েছি এখানে।

কার্লোস ফন্সেকা ছিলেন সান্দিনিস্তা ফ্রন্টের এক অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। খুবই গরীব পরিবারের ছেলে কার্লোস বেশ অল্প বয়েসেই ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৫৫ সালে, কুড়ি বছর বয়েসে, তিনি নিকারাগুয়ার সোশালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। আসলে ওটাই তখন ছিল নিকারাগুয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৫৮-৫৯ সালে তিনি গেরিলা যুদ্ধের তালিম নিতে শুরু করলেন। পার্টি ছেড়ে

দিয়ে কার্লোস চলে গেলেন কিউবায়। কিউবার বিপ্লবীরা তখন সবে ডিক্‌টেটর বাতিস্তাকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। কিউবায় বিপ্লবীদের সাফল্য নিকারাগুয়ার তরুণ তরুণীদের বুকে জ্বালিয়ে দিলো আগুন। তাঁরা চেষ্টা করলেন কিউবার পথ ধরে এগোতে। একের পর এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেল। কিন্তু একটাতেও সাফল্য এলোনা। কারণ, গেরিলাদের আন্তরিকতা ও বীরত্ব সত্ত্বেও, তাঁরা ছিলেন দলে দলে বিভক্ত। তাছাড়া তাঁদের না ছিল তেমন অস্ত্র, না ছিল ভালো তালিম। ওদিকে ন্যাশনাল গার্ড অস্ত্রশস্ত্র আর তালিম পাচ্ছিল খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে। (এবং সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে)।

'৬০ সালে কার্লোস নিকারাগুয়ায় ফিরে এলেন। যেসব গেরিলা তখনো জীবিত তাঁদের সংঘবদ্ধ, সংগঠিত করতে লাগলেন তিনি। এইভাবে সকল জাতীয়তাবাদী একজোট হলেন। এবং ১৯৬৩ সালে এই জোটের নাম দাঁড়ালো : সান্দিনিস্তা জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট—এফ, এস, এল, এন। জেনারেল সান্দিনোর লাল-কালো নিশানই হলো এই ফ্রন্টের নিশান।

১৩ বছর বহু গেরিলা-লড়াই, সাংগঠনিক কাজ, তাত্ত্বিক লেখাপত্র চালানোর পর ১৯৭৬ সালের ৮ই নভেম্বর ন্যাশনাল গার্ডের সংগে এক খণ্ডযুদ্ধে কার্লোস ফন্‌সেকা প্রাণ হারান। এক অখ্যাত গ্রামে তাঁকে মাটি দেওয়া হয়েছিল। তার ঠিক তিন বছর পর, বিপ্লব সফল হলে কার্লোসের মরদেহ নিয়ে আসা হয় এইখানে—যে সৌধের সামনে আমি দাঁড়িয়ে।

সাদা রঙের সৌধ। তার ওপরে জ্বলছে আগুনের শিখা।

পাশেই রয়েছে কর্ণেল লোপেস-এর কবর। লোপেস স্বয়ং আউগুস্তো সান্দিনোর গেরিলা বাহিনীতে ছিলেন। এবং সবাই খতম হবার পর একমাত্র তিনিই ছিলেন বেঁচে। অনেক বছর পর তরুণ সান্দিনিস্তা গেরিলারা আবার লোপেসের স্মরণ নেন তালিমের জন্য। কিউবায় মারা যান সান্তোস লোপেস। তাঁর মরদেহও নিয়ে আসা হয়েছে এখানে, বিপ্লব সফল হবার পর। অতি অনাড়ম্বর এক সমাধি তাঁর।

কম্‌পানিয়েরা লিদিয়া প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বললো : "কমান্দান্তে তোমাস্ বোর্হেও নিশ্চই এখানেই স্থান পাবেন একদিন,—লোপেস আর কার্লোসের পাশে।"

* * *

কার্লোস ফন্‌সেকার সমাধি মানাগুয়া শহরের মাঝামাঝি জায়গায়। এই *শহরটো ১৯৭২-এর ভূমিকম্পে ভেঙে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। কুড়ি সেকেণ্ডের ভেতর দশ হাজার লোক মারা গিয়েছিল। ভূমিকম্পের এই ভয়ঙ্কর* পরিণামটাও সোমোসা ও তাঁর চ্যালাচামুণ্ডারা কাজে লাগিয়েছিল ফায়দা লোটার জন্য। আর্তত্রাণের পুরো টাকাটাই (দেশবিদেশ থেকে পাঠানো লক্ষ লক্ষ

টাকা) পুরেছিল তারা পকেটে। আহতদের বাঁচানোর জন্য নানা দেশের মানুষ রক্ত দান করেছিলেন। সেই রক্তও বেচে দিয়েছিলেন সোমোসা।

তেরো বছর পরেও সেই প্রবল ভূমিকম্পের ক্ষতচিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছি মানাগুয়ার এই পাড়ায়। এদিক ওদিক ছড়ানো রয়েছে কিছু পুরোনো বাড়ির কঙ্কাল। কিছু কিছু রাস্তার (সাবেক রাস্তার) স্মৃতিচিহ্ন মাড়িয়ে এগোচ্ছি। আবার নতুন রাজপথও তৈরী হয়েছে বিপ্লবের পর। দেখা যাচ্ছে এক বিশাল গীর্জা। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে গীর্জাটা ভেতরে প্রায় ফাঁপা। কয়েকশো বছরের পুরোনো, প্রকাণ্ড গীর্জাটার ভেতরে ঢুকে দেখি চারদিক ভাঙাচোরা, ফাটল-ধরা। এ মন্দিরে উপাসনা হয় না আর। একটা বিশাল পোড়ো বাড়ি যেন। ভূতুড়ে।

একটু দূরেই 'রুবেন দারিয়ো নাট্যশালা।' প্রকাণ্ড। বিপ্লবী সরকার এটা পুরোপুরি নিবেদন করেছেন নতুন নিকারাগুয়ার নাটকের জন্য। কিন্তু শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটা বিকল হয়ে যাওয়ায় এটা এখন বন্ধ। ঠিক করতে লাগবে এক লক্ষ ডলার। বিদেশী মদতপুষ্ট প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ এখন এমন পর্যায়ে, এবং এতো টাকা শুধু প্রতিরক্ষায় তলিয়ে যাচ্ছে যে এই এক লক্ষ ডলার এখন বের করা মুশকিল। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির মাঝখানে সামরিক আগ্রাসনের পরোক্ষ শিকার দারিয়ো নাট্যশালা। তার বিশাল দরজাগুলো আজ বন্ধ।

পাশেই বিশাল মানাগুয়া হ্রদ। লিদিয়া বলছে, এই হ্রদ নাকি খুব নোংরা। শহরের যতো নর্দমা, সব নাকি এখানে এসে পড়েছে। তাছাড়া ভূমিকম্পে ভেঙে যাওয়া ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ সব ফেলা হয়েছিল এই হ্রদে। প্রকাণ্ড হ্রদ। ওপার প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। একপাশে পাহাড়। হ্রদটা পরিষ্কার হলে কাজে লাগতো, সুন্দর হতো। নৌকো চলছে না। কেউ সাঁতার কাটছে না। হ্রদটাও যেন ভাঙা বাড়ি আর পথঘাটগুলোর মতোই ভূতুড়ে। পড়ে-আসা আলোয় এই হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে মানাগুয়া শহরটার দিকে তাকালে সারি সারি ফাঁকা জমি (ভূমিকম্পের আগে যেখানে ঘরবাড়ি ছিল), কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা বাড়ির কঙ্কাল, আলোহীন নিষ্প্রাণ রুবেন দারিয়ো নাট্যশালা, প্রকাণ্ড ভাঙা গীর্জা আর প্রায় জনমানবহীন রাস্তাগুলো থেকে উঠে আসে হতাশা আর নিঃসঙ্গতার ভাপ। সহজে যেন বিশ্বাস হতে চায় না যে ১৯৭৯ সালের জুলাই মাস থেকে এ-দেশের প্রায় প্রতিটি রোমকূপ হয়ে উঠেছে আশার প্রস্রবন, প্রতিটি মুহূর্তে এ-দেশের জনগণ বিশ্বের এক অন্যতম শক্তিশালী দেশের উদ্ভট, অযৌক্তিক, নৃশংস আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন বিপ্লবকে বাঁচানোর জন্য এবং প্রতিটি মুহূর্তে সেই বিপ্লবকে গড়ে তুলছেন তাঁরা তিল তিল করে।

প্রায় সন্ধ্যের ~~আবছে~~ গোধূলি আলোয় এক প্রেমিক তাঁর প্রেমিকাকে হ্রদের ধারে

শুইয়ে মনের সুখে চুমু খাচ্ছিলেন। লিদিয়া, লিয়েস আর আমি সেখানে, অনবধানবশত, হাজির হওয়ায় বেচারিরা মহা বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন।

* * *

হ্রদের পার থেকে লিদিয়া আর আমি হাঁটতে লাগলাম (কতো যে হাঁটছি এ-কদিনে!)। লিয়েসকে বলা হলো দূরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে।

একটা বড় বাড়িতে নিয়ে গেল আমায় লিদিয়া। বাড়িটা এককালে এক ধনী ব্যবসায়ীর ছিল। বিপ্লবের পর তিনি বাড়িটা সান্দিনিস্তাদের উপহার দিয়ে বিদেশে চলে যান। সমাজবাদী দেশে অতো বড়লোক থাকবে কী করে? বাড়িটা এখন সান্দিনিস্তা সরকারের একটা বেশ বড় মাপের দপ্তর। নিকারাগুয়ার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষা করার জন্য এই দপ্তরটি তৈরী করেছেন বিপ্লবীরা। নাম: "পাত্‌রিমোনিয় ইস্‌তোরিকো।"—দেখার মতো বাড়িটা। একেবারে স্প্যানিশ কায়দায় তৈরী। এরকম স্থাপত্য আগে দেখিনি। তবে আপিস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে বাড়িটার জলুস নেই। নাই বা থাকলো। বিপ্লবের আগে এটা একটি মাত্র পরিবারের ভোগে যেতো। এখন যাচ্ছে জনসাধারণের ভোগে। এটাই তো ভালো।

সেখান থেকে ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত 'গ্রান্ অতেল্' অর্থাৎ গ্র্যাণ্ড হোটেল। এককালে যা ছিল এক বিশাল বিলাসবহুল হোটেল, তার ধ্বংসাবশেষে এখন সংস্কৃতি দপ্তরের তত্ত্বাবধানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী ইত্যাদি হয়ে থাকে। চমৎকার কাজে লাগিয়েছেন এঁরা ভাঙাচোরা এই বিরাট বাড়িটাকে। এমনিতে একেবারে ভাঙা। মনে হয় যেন কোনো ঐতিহাসিক বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। আমাদের দেশ হলে এখন, খুব সম্ভব, অশথ গাছ উঠতো, সাপখোপ ঘুরতো বা গরু ছাগল চরে বেড়াতো, বা হয়তো একেবারে ভেঙে ফেলে নতুন একটা হোটেল গড়া হতো।

পশ্চিমী দেশ হলে তো সংগে সংগে নতুন দালান কোঠা তুলে উদ্বোধন করা হতো 'নিউ গ্র্যাণ্ড হোটেল'। নিকারাগুয়ার মানুষ, সে-জায়গায়, এখানে ওখানে মেরামত করে নিয়ে চালাচ্ছেন নানান প্রদর্শনী,—ছবির, ভাস্কর্যের, লোকনৃত্যের মুখোশের। আর মাঝখানের সুইমিং পুলটাকে বুজিয়ে বানানো হয়েছে মঞ্চ। তার চারদিকে দর্শক-শ্রোতাদের বসার আসন। আমরা ভেতরে ঢুকে দেখছি কিছু ছেলেমেয়ে সেই মঞ্চের ওপর ইলেকট্রনিক কীবোর্ড, স্যাক্সোফোন, ড্রামস্ ইত্যাদি সহযোগে বেশ মহড়া দিচ্ছে। একপাশে একটি সুন্দর অথচ আড়ম্বরহীন রেস্তোরাঁ। তরুণ তরুণীদের ভীড়। এঁদের বেশীর-ভাগই শিল্পী।

ভাঙাচোরা অবক্ষয়ী এক ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষে যেন নবীন প্রাণের উৎস শুরু হয়ে গিয়েছে। একদিন হয়তো এই ধ্বংসাবশেষও আর থাকবে না।

প্রদর্শনীতে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় হঠাৎ দেখলাম এর্নেস্তো কার্দেনালের তৈরী একটি কাঠের মূর্তি। উনি যে ভাস্কর তা জানতাম না।

এক একটা বড় ঘরে এক একটি বিষয়ের প্রদর্শনী। ছবির একটা স্থায়ী গ্যালারিও রয়েছে একপাশে। অপরদিকে সাজানো রয়েছে লোকনৃত্যের নানান মুখোশ।

লোকনৃত্যের এই সংস্কৃতি নিকারাগুয়ায় খুবই জীবন্ত। বিভিন্ন ধরণের মুখোশ ও পোষাক পরে লোকে নাচে, গান গায়। নিকারাগুয়ার ইতিহাসেরই নানান অধ্যায় রূপ পায় এইসব নাচে।

নাচের বা লোকনাট্যের মুখোশ সম্পর্কে আর-একটা কথাও বলার আছে। গণ অভ্যুত্থানের সময়ে অনেক কমাণ্ডো, গেরিলা, এসব মুখোশ পরে 'এ্যাক্শন' করতেন,—যাতে ন্যাশনাল গার্ড বা গোয়েন্দারা তাঁদের চিনতে না পারে।

মুখোশ আর পোষাকের ছবি তোলার সময়ে প্রদর্শনীর কম্পানিয়েরোরা থেকে থেকেই সাহায্য চাইছেন। এগিয়ে এসে বলছেন : "কোন্‌টার ছবি তুলতে চাও বলো, আলোয় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি, ছবি তুলতে সুবিধে হবে।"

সকলেই যেন সাহায্য করতে, কাজে লাগার জন্য ব্যস্ত। এই একই মনোভাব লক্ষ্য করছি সংস্কৃতি দপ্তর ও আন্তর্জাতিক প্রেস সেণ্টারের সকল কর্মীদের মধ্যে। বিপ্লব যে কিভাবে হয়েছে, কেন হতে পেরেছে তা দিব্যি বোঝা যায়। মানুষগুলোও পাল্টে গিয়েছে নিশ্চয়ই,—বেশ কিছুটা তো বটেই।

* * *

একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি। ছেলে ও মেয়ে কর্মীদের মধ্যে সহজ মেলামেশা। কোনরকম বৈষম্য চোখে পড়ছে না। একটুও না। কি সহজ আচরণ পরস্পরের প্রতি। মেয়েরা তাদের "নারীত্ব" বজায় রেখেই কাজ করছে। দেশের অধিকাংশ ছেলেই এখন সৈন্য বা মিলিশিয়া হয়ে দেশ ও বিপ্লবকে রক্ষা করতে ব্যস্ত। অনেকেই রয়েছেন ফ্রণ্টে। তাই অসামরিক পর্যায়ের বিভিন্ন কাজ এখন মেয়েরাই করছে। কিন্তু এইসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা লাতিন মেয়েদের স্বাভাবিক কোমলতা ও কমনীয়তা বর্জন করছে না। কেউ কেউ হাল্‌কা প্রসাধনও করছে। খুবই হাল্‌কা। এমনকি মিলিশিয়ার জংগী পোষাক পরা, কোমরবন্ধে পিস্তল গোঁজা মেয়েরাও 'মেয়েই'।—তবু ছেলেতে মেয়েতে, কর্মক্ষেত্রে সমান সমান ভাব।—এই মেয়েরাই আবার রণাঙ্গণ বরাবর কফি তুলতে যায়। বন্দুক হাতে লড়াই করে প্রতিবিপ্লবীদের সংগে। শহীদ হয়।—ধন্য সান্দিনোর মেয়েরা, নিকারাগুয়ার মেয়েরা।

* * *

বাড়ি ফেরার পথে —কি আশ্চর্য—লিয়েস বেপাত্তা। আমাদের জিপসমেত কম্পানিয়েরো উধাও। লিদিয়া আর আমি এক ঘণ্টা ধরে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করলাম। পেলামনা কোথাও। তিনবার হাল্কা পানীয় খেলাম আমি রাস্তা থেকে কিনে। বিচ্ছিরি গুমোট গরম। লিদিয়া একবারের বেশী খেলোনা। বললো: "তেষ্টায় আমরা অভ্যস্ত।"—শেষে লিয়েস ও গাড়িটাকে কিছুতেই খুঁজে না পেয়ে বললাম—"চলো একটা ট্যাক্‌সি নিয়ে তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিই, তারপর আমি বাসায় ফিরি।" লিদিয়া কিছুতেই শুনলোনা। বললো: "অসম্ভব। আমি তোমায় পৌঁছে দেবো! তারপর আমার বাড়ি ফেরার কথা ওঠে।" —এই তন্বী মেয়েটি যে নরম সুরে কথা বলে, সুন্দর করে হাঁটে, মিষ্টি করে হেসে ওঠে,—কিছুতেই টললোনা। আমি ভারতীয় কম্‌পানিয়েরো, তার দায়িত্বে।

'পাত্‌রিমোনিয় ইস্‌তোরিকো' দপ্তরে ফিরে গিয়ে টেলিফোন করে আর-একটা জিপ আনালো লিদিয়া। আমায় বাড়ি পৌঁছে দিলো। বাড়ির দরজায় এসে দেখি লিয়েস তার জিপসমেত দাঁড়িয়ে। রীতিমতো উদ্বিগ্ন। বেচারি আমাদের খুঁজে না পেয়ে সটান চলে এসেছে অতিথিশালায় (নিজের বাসায় যায়নি)। লিয়েস ঠিক জানে যে লিদিয়া আমায় যে-করে-হোক পৌঁছে দেবে এবং তখন আমায় ও বুঝিয়ে বলবে যে আমায় খুঁজে নিয়ে আসতে পারেনি বলে ও লজ্জিত। আমি ওকে সিগারেট খাইয়ে, হাত ধরে, পিঠে হাত রেখে ভাষা ভাষা স্প্যানিশে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, ওর বিলকুল কোনো দোষ নেই। --অন্তত দশবার মাফ চেয়ে তবে লিয়েস ও লিদিয়া বিদায় নিলো।—এই হলো সান্দিনোর ছেলেমেয়েরা।

দশই মে

সকাল বিকেল দুটো সাংবাদিক বৈঠক। সকালের বৈঠকে সান্দিনিস্তা সরকারের কয়েকজন কর্মকর্তা আলোচনা করলেন রেগানের চাপানো অর্থনৈতিক অবরোধের প্রভাব নিকারাগুয়ার ওপর কোন্ কোন্ দিক দিয়ে পড়তে পারে ও পড়ছে। বিভিন্ন দিকে, নানান ক্ষেত্রে নিকারাগুয়া ঐতিহাসিক-ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই মার্কিন সরকার নিকারাগুয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যাবতীয় চালানের পথ বন্ধ করে দেওয়ায় নিকারাগুয়ার জনগণের অসুবিধে তো হবেই। রেগান যা করলেন, তা একরকম যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল। অথচ আকারে নিকারাগুয়া আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের চেয়েও ছোট।

সংস্কৃতি দপ্তরের সাংবাদিক মাগালি আমার সংগে সারাক্ষণ থেকে, যতোরকমভাবে সম্ভব সাহায্য করতে চেষ্টা করলো। মায় এক কাপ কফিও জোগাড় করে আনলো আমার জন্য।

সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে খাবার টেবিলে আলাপ মার্কিন তরুণ ম্যালকমের সংগে। প্রথম কথাতেই স্প্যানিশে বললো : "সোই গ্রিংগো।"—মেক্সিকো থেকে শুরু করে লাতিন আমেরিকার অনেক দেশেই চলতি ভাষায় মার্কিনীদের বলা হয় "গ্রিংগো"। কথাটার মধ্যে একটু আক্রোশ আছে। তবে "ইয়াংকি"র মতো অতোটা নয়। ম্যালকম নির্দ্বিধায় "গ্রিংগো" নামটা মেনে নিয়েছে। তবে সে যে কিছুতেই, কোনমতেই "ইয়াংকি" নয়, এটাও ম্যালকমকে পরে একাধিকবার জোরগলায় বলতে শুনেছি।

চমৎকার ছেলে। দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

ম্যালকম—চার মাস হয়ে গেল—নিকারাগুয়ায়। মাস তিনেক সে কফি ক্ষেতে স্বেচ্ছায় কাজ করেছে। সারাদিন ঠাঠা রোদ্দুরে, এবং দক্ষিণপন্থী প্রতিবিপ্লবীদের বন্দুক ও কামানের নাগালের মধ্যে থেকে ম্যালকম ম্যানেস্ তার নিকারাগুয়ান কম্‌পানিয়েরোদের সংগে কফি তুলেছে। তার ব্রিগেডের অন্যান্যদের মতো সে-ও ফ্রন্টে পাহারা দিয়েছে রাইফেল হাতে—যাতে তারই দেশের অস্ত্রে সজ্জিত, তারই দেশের সামরিক উপদেষ্টাদের কাছে প্রশিক্ষণ-পাওয়া প্রাক্তন ন্যাশনাল গার্ড ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থীরা নিকারাগুয়ার ওপর অতর্কিত আক্রমণ করতে না পারে।

রনাল্ড রেগান ও মার্কিন সরকার কি জানেন যে তাঁদেরই দেশের কি-

ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধবৃদ্ধা নিজেদের সরকারের দুর্বুদ্ধি ও গোঁয়ার্তুমি দেখে নিকারাগুয়ার জনগণের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন? নিশ্চয়ই জানেন। কারণ দেশে ফিরে যাবার পর এইসব দরদী, মানবতাবাদী মার্কিনী হয়ে পড়েন কেন্দ্রীয় তদন্ত বুরো এফ, বি, আই-এর গোয়েন্দাদের শিকার, তাঁদের চিহ্নিত করা হয় "সন্ত্রাসবাদী" ও "কমিউনিস্ট" হিসেবে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের ইহকাল পরকাল ঝরঝরে।

স্টেসি আর আমাকে বসিয়ে রেখে ম্যালকম গেল "রন্" অর্থাৎ নিকারাগুয়ান রাম্ আনতে। প্রোটোকোল হাউসের বারান্দায় বসে অনেক রাত অবধি চললো আড্ডা। ম্যালকম ঘর থেকে হুইটম্যানের 'লীভ্স্ অফ গ্রাস্' এনে পড়তে শুরু করে দিলো বেশ আবৃত্তির ঢঙে। হুইটম্যানের ফাঁকে ফাঁকে চললো আলোচনা তিনজনে মিলে. মার্কস্‌বাদ লেনিনবাদ, নিকারাগুয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ—কিছুই বাদ পড়লোনা।

স্টেসি ঘুমোতে চলে যাবার পরেও ম্যালকম আর আমি চালালাম কিছুক্ষণ। চারদিকে সকলেই ঘুমন্ত। তিনজন রুশ ও একজন মার্কিনী ঘুমিয়ে কাদা ততোক্ষণে। জেগে আছে শুধু একজন মার্কিনী ও একজন ভারতীয়—এই নিকারাগুয়ায়।

ম্যালকম বললো: "আমাদের পরিস্থিতিটা কী অসাধারণ, ভেবে দেখেছো? বিপ্লবী নিকারাগুয়াকে ধ্বংস করার জন্য যে দেশটা উঠে পড়ে লেগেছে আমি সেই দেশেরই নাগরিক। আর তুমি বাছা সেই দেশেরই সরকারের এক চূড়ান্ত মিথ্যেভাষী প্রচার-সংস্থায় ছিলে এতোবছর। এখন তুমি আর আমি দু'জনেই এসেছি নিকারাগুয়ায়—সান্দিনিস্তা বিপ্লবের সমর্থনে, এই বিপ্লবকে একেবারে কাছ থেকে জানতে, এই বিপ্লবের মধ্যে ক'টা দিন কাটাতে, এর শরীক হ'তে।"

আমি বললাম—"আর এরই মধ্যে, ভেবে দেখো, যে কোনো মুহূর্তে মার্কিন সরকার পুরোদস্তুর সামরিক আক্রমণ শুরু করে দিতে পারে। যুদ্ধ তো চলছেই ভেতরে ভেতরে। গ্রেনাডা-গোছের একটা চূড়ান্ত নাটকই যা এখনো বাকি।"

ম্যালকম দাড়ি চুলকিয়ে বললো: "আর তাইই যদি হয় তো তুমিই হবে নিকারাগুয়ার ওপর মার্কিনী বোমা হামলার প্রথম ও সম্ভবত একমাত্র ভারতীয় 'ক্যাজুয়াল্টি'।"

"আর আমাদের এই বাড়িতে মার্কিনী বোমায় মরা দুই মার্কিনী কম্‌পানিয়েরোর লাসও অপেক্ষা করবে..." আমার মুখে এই কথা শুনে ম্যালকম হঠাৎ নিষ্প্রভ আলোয় মোড়া বারান্দা থেকে চলে গেল নিঝুম অন্ধকার বাগানের দিকে। আলো আঁধারির মধ্যে দাঁড়িয়ে সে ধীরে ধীরে বললো: "জানো, ফ্রন্টে রাইফেল হাতে পাহারা দিতে দিতে এইরকম রাতে আমার প্রায়ই মনে হতো—ঐ যে

সামনে অন্ধকারে-ঢাকা মিশকালো ঝোপঝাড়—ওরই ভেতর থেকে একটা 'মেড-ইন-ইউ-এস-এ' সাব মেশিনগানের 'মেড-ইন-ইউ-এস-এ' বুলেটের ঝাঁক হয়তো যে-কোনো মুহূর্তে ঝাঁঝরা করে দিয়ে যাবে আমার আমেরিকান শরীরটা। আর আমার ব্রিগেডের এই যে সুন্দর নিকারাগুয়ান ছেলেমেয়েগুলো, যাদের আমি এতো ভালবাসি, এরাও হয়তো কেউই বাঁচবেনা...''

এগারোই মে

সকাল সোয়া দশটা নাগাদ তিন কম্পানিয়েরো কার্ল, মাগালি ও লুইসা হাজির একটা নীল রঙের টয়োটা গাড়ি নিয়ে। আজ আর লিয়েস নেই চালকের আসনে। রয়েছে কম্পানিয়েরো হাইমে।

গাড়ি চললো মানাগুয়া ছাড়িয়ে। রাস্তাটা বাংলাদেশের যে-কোনো মহাসড়ক হতে পারে। দু'ধারে চেনা চেনা গাছ। বিশেষ করে আম। সবুজে সবুজ মানাগুয়ার উপকণ্ঠ। আমরা ছুটে চলেছি একটা পাহাড়কে লক্ষ্য করে। সামনে পথটা উঁচুনীচু হয়ে সটান চলে গেছে ঐ পাহাড়ের কোলে। হাইমে গাড়ীর রেডিয়োটা চালিয়ে দিলো। সান্দিনিস্তা বেতারে ভেসে আসছে, কি আশ্চর্য,—মার্কিন লোকসংগীত শিল্পী জন ডেন্‌ভারের কণ্ঠ। ডেন্‌ভার গাইছেন: "কান্‌ট্রি রোড, টেক মি হোম।" ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার পাহাড়ের গন্ধমাখা সেই গান ("মাউন্‌টেন মাম্‌মা, টেক মি হোম") "মুক্ত নিকারাগুয়া" লেখা এই নীলরঙা গাড়িটা থেকে এক অচেনা পাখীর মতো উড়ে চলেছে নিকারাগুয়ার ঐ ধূসর পাহাড়ের দিকে।

সান্দিনিস্তা বেতার থেকে কতো সহজেই বেজে ওঠে মার্কিনী গান,—লোকসংগীত, প্রগতিশীল রক্‌, জ্যাজ্‌, প্রতিবাদের গান। এক লহমায় মনে পড়ে মানাগুয়ার এক শ্রমিক মহল্লায় দেয়ালে-লেখা শ্লোগান:

"আমেরিকানো সি, ইয়াংকি ন'।"—

আমেরিকান—হ্যাঁ। ইয়াংকি না।

রাস্তার গাড়িগুলোকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছি। বেশীরভাগ গাড়িই জাপানী বা মার্কিনী। নম্বর ফলকে প্রথমেই স্পষ্ট করে লাল অক্ষরে লেখা: "নিকারাগুয়া লিব্রে"—মুক্ত নিকারাগুয়া।

প্রথম গন্তব্য সান্‌তিয়াগো আগ্নেয়গিরি। জ্যান্ত। গল গল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে সমানে। পর্যটকদের জন্য সান্দিনিস্তারা পাহাড়ের ওপর চমৎকার রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন। পরপর দু'রাত প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় দু'ধারের পাহাড়ী ঢাল বেয়ে পথের ওপর নেমে এসেছে পাথরের চাঁই। যখন তখন ধ্বস নামে এইসব লাভাজমা পাহাড়ে। নিকারাগুয়ার নীচে ন'টি আগ্নেয়গিরি।

সোমোসার আমলে ন্যাশনাল গার্ডের এক তরুণ সদস্য স্বপক্ষ ত্যাগ করে ভিড়ে গিয়েছিলেন গেরিলাদের দলে। এক খণ্ডযুদ্ধে তিনি ধরা পড়েন।

সোমোসার হুকুমে সেই তরুণ গেরিলাকে জ্যান্ত ফেলে দেওয়া হয় এই সান্তিয়াগো আগ্নেয়গিরির মধ্যে।

কাছেই এক পাহাড়ের চূড়োয় সেই তরুণ শহীদের স্মৃতিতে সান্দিনিস্তারা বসিয়ে দিয়েছেন এক প্রকাণ্ড ক্রশ। কাঠের। পাহাড় কেটে সিঁড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ উঠে যেতে পারে ঐ ক্রুশের কাছে, সেই তরুণ শহীদকে স্মরণ করার জন্য।

উঠতে লাগলাম। মাগালি সংগে এলো। পরে কার্লা ও লুইসাও যোগ দিলো।

* *

দুপুরের ভোজ হলো গ্রামের এক দোকানে। মানাগুয়া থেকে জায়গাটা বেশ দূরে। একেবারে, যাকে বলে, অজ পাড়াগাঁ। টালির চাল আর চেরা বাঁশের তৈরী এই খাবার দোকান। সবাই আজ আমার অতিথি। প্রধান পদ গরুর মাংস। স্টেক বানানোয় লাতিন আমেরিকান রাঁধুনিদের জুড়ি নেই। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চলেছে অবিশ্রান্ত আলাপ আলোচনা, তর্কবিতর্ক। আমি খাচ্ছি বাঁহাতে কাঁটা ধরে। ডান হাতটা ব্যস্ত রয়েছে ইংরিজী-স্প্যানিশ পকেট-অভিধানের পাতা ওলটানোর কাজে। আমার সংগে স্প্যানিশ ভাষায় কোনো সিরিয়াস আলোচনা করতে গেলে স্প্যানিশভাষীদের সহিষ্ণুতার ও ধৈর্যের অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়। আমার চার অতিথিই সসম্মানে উত্তীর্ণ হচ্ছেন সেই পরীক্ষায়। শুধু তাই নয়। জুতসই প্রতিশব্দগুলো যাতে আমি অভিধান থেকে বের করে ফেলতে পারি ডান হাতের সাহায্যে, সে-জন্য মাগালি আমার পাতের মাংসের চাঁইটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে।

আলোচনার বিষয়ঃ নিকারাগুয়ার সমস্যা, মার্কিন আগ্রাসন, ভারতে বিপ্লবের সম্ভাবনা। তৃতীয় বিষয়টি নিকারাগুয়ায় অনেকেরই মনে ঘাই মারছে।

সান্দিনিস্তা বিপ্লব সম্পর্কে আমার চার সংগী/সংগিনীই বেশ খোলা মনে ভাবনাচিন্তা করছেন। চারজনেই সান্দিনিস্তা। হাইমে বাদে বাকি তিনজন এমনকি সপরিবারে। কার্লার স্বামী কাজ করেন সান্দিনিস্তা প্রপাগাণ্ডা দপ্তরে। লুইসার স্বামী রয়েছেন সান্দিনিস্তা স্থায়ী দপ্তরে। মাগালির স্বামী 'কম্বাতিয়েন্তে'—ফ্রন্টে লড়াই করছেন।—

বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কে এঁরা যতোটা সচেতন, ব্যর্থতার বিক্ষিপ্ত নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে এঁদের চোখ ঠিক ততোটাই খোলা। যেমন, কিছু কিছু ভোগ্যপণ্যের দাম যে মাত্রাধিক বেড়ে গিয়েছে, বিশেষ করে জামাকাপড়ের দাম, এঁরা তা মোটেও পছন্দ করছেন না। আমার সামনে চারজনে নিজেদের মধ্যেই কথা বলছেন এ-সম্পর্কে। আবার, কী কারণে এই বিপত্তি সৃষ্টি হচ্ছে সেটাও এঁরা জানেন। আগ্রাসন রোখার জন্য যদি দেশের এতো টাকা,

এতো লোকবলের অপচয় হয়, তো জরুরী কিছু কাজের জন্য এই গরীব দেশের সরকার টাকা দেবেন কোথা থেকে? তাছাড়া কয়েকটা ব্যাপারে তাঁরা পুরোপুরি মন দিতেও পারছেন না।

দেশের ভেতরে বুর্জোয়া শক্তিগুলোও আপন আপন ক্ষেত্রে সক্রিয়। সোমোসা ও তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং মুষ্টিমেয় কিছু চ্যালাচামুণ্ডা দশক দশক ধরে দেশের পুঁজিটাকে এমনভাবে গ্রাস করে রেখেছিল, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তাদের ক্ষমতা ও অংশ ছিল এতোই একচেটিয়া যে নিকারাগুয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা অংশ, বেশ কিছু ব্যবসায়ীও শেষে আন্তরিকভাবে চাইছিলেন যে সোমোসা বিদেয় হোন। সেদিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন সোমোসাবিরোধী গণ আন্দোলনের পক্ষে,—স্রেফ নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের পর সান্দিনিস্তারা যে দেশের যাবতীয় ক্ষমতা, এমনকি অস্ত্রশস্ত্রও জনগণের হাতে তুলে দেবেন, এটা তাঁদের একেবারেই মনঃপূত নয়। বুর্জোয়া শ্রেণী চান সোমোসাহীন সোমোসাতন্ত্র। অতএব শ্রেণী স্বার্থের দিক দিয়ে, চরিত্রের দিক দিয়ে তাঁরা বিপ্লববিরোধী। সোচ্চার বিরোধিতার সাহস অনেকেরই নেই। এইসব খামার মালিক, কারখানার মালিক, তাঁদের নিকট লোকজন বিদেশী গাড়ির ধোঁয়া উড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মানাগুয়া বা লেয়ন বা গ্রানাদার পথে পথে। দেশের অর্থনীতিতে এঁদের অংশ বেশ বড়। সান্দিনিস্তারা,—মিশ্র অর্থনীতি ও রাজনৈতিক বহুত্ববাদের যে নীতি তাঁরা নিয়েছেন তার খাতিরে,—এই শ্রেণীর ক্ষমতা ছিনিয়ে নিচ্ছেন না। ফলে একটা টানাপোড়েন চলেছে। দেশের শ্রমিক শ্রেণী, সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে এই অর্থনৈতিক টানাপোড়েন কিছু অর্থনৈতিক বিপত্তিই ডেকে আনছে। তার চাপে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ এবং কিছুটা বিভ্রান্ত। তাঁরা সার্বিক বিপ্লব চান বলেই এই ক্ষোভ। আমার নিকারাগুয়ান বন্ধুদের মুক্ত, আপোসহীন কথাবার্তাতেও পাচ্ছি সেই ক্ষোভের ছায়া। তাঁরা খোলাখুলি জানিয়ে দিচ্ছেন যে কয়েকটা ব্যাপারে তাঁরা ক্ষুব্ধ, বিরক্ত। বিপ্লব সত্ত্বেও তাঁদের সমাজে বুর্জোয়াতন্ত্র ও বুর্জোয়া মূল্যবোধের যেসব চিহ্ন বিরক্তিকর বিয়োগফলের মতো পড়ে রয়েছে, সান্দিনিস্তা সরকার সেগুলো নিকেশ করার উদ্যোগটা তাড়াতাড়ি নিলে তাঁরা খুশী হবেন।

*   *   *

খাওয়া দাওয়া সেরে, গাঁয়ের ভেতর দিয়ে মাসায়া'র দিকে যাত্রা। মাসায়া একটা গঞ্জ। এরই 'মোনিমবো' নামে এক ইণ্ডিয়ান মহল্লায় সোমোসার বিরুদ্ধে বিরাট বিদ্রোহ হয়েছিল। মোনিমবোর বীর জনগণ হাতের কাছে যে হাতিয়ার পেয়েছিলো তা দিয়েই সমানে লড়াই করে গিয়েছিলেন ন্যাশনাল গার্ডের বিরুদ্ধে। শেষে তাঁদের সামলাতে না পেরে সোমোসা জংগী বিমান থেকে মোনিমবোর ওপর এলোপাথাড়ি বোমা ফেলা আর গুলি চালানোর হুকুম দেন।

ঐতিহাসিক মোনিমবো। ঐতিহাসিক মাসায়া। এই মাসায়ারই এক অখ্যাত গ্রামে জন্মেছিলেন আউগুস্তো সেসার সান্দিনো। যে বাড়িতে তাঁর ছেলেবেলা কেটেছিল সেই বাড়িটায় তৈরী হয়েছে একটি ছোটখাটো সংগ্রহশালা। জেনারেল সান্দিনোর ব্যবহার করা অনেক কিছু রয়েছে এখানে। বিশেষ করে তাঁর বন্দুকগুলো। এগুলোরই গর্জন একদিন নিকারাগুয়ার শাসক-শ্রেণী ও মার্কিন সেনাবাহিনীকে জানিয়ে দিয়েছিল নিকারাগুয়ার মানুষ মুক্তি চায়, এবং মুক্তির অধিকার তারা কেড়ে নেবে।

এই সংগ্রহশালার লাগোয়া দোকান থেকে তিনটি ব্যাজ কিনে আমায় উপহার দিলো কার্লা। একটিতে সান্দিনোর ছবি। পাশে ছোট হরফে লেখা : 'সান্দিনো ভিভে'—সান্দিনো অমর! আর-একটায় লেখা : 'নিকারাগুয়ার ওপর ইয়াংকি আগ্রাসন থামাও।'—তৃতীয়টিতে পাশাপাশি দুটি নিশান। একটি এফ, এস, এল, এন-এর। অপরটি নিকারাগুয়ার জাতীয় পতাকা।

একটা ব্যাজ আমি নিজেই পরে নিলাম। লুইসা এগিয়ে এসে অপর দুটি ব্যাজ লাগিয়ে দিলো আমার বুকে। দোকানের কাউণ্টারে বসা কম্পানিয়েরা এই ব্যাজ লাগানোর সময়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সান্দিনোর শৈশবের গন্ধমাখা এই ইণ্ডিয়ান-গাঁয়ের আদ্যিকালের বাড়িটায় যেন হঠাৎ করে শুরু হয়েছে এক ভাবগম্ভীর, অন্তরংগ অনুষ্ঠান। বাইরে আকাশ মেঘে ঢাকা। ঘরে আলো বলতে রয়েছে ধূসর, আবছায়া। চার কম্পানিয়েরা আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে। দরজার কাছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে কম্পানিয়েরো হাইমে। লুইসা, কার্লা, মাগালি, দোকানের কম্পানিয়েরা (যিনি নিজের থেকেই দাঁড়িয়ে উঠেছেন) আর হাইমের মুখগুলো আমি দেখে নিলাম একবার। সকলের মুখেই কেমন যেন স্মিত হাসি—তাতে মিশে আছে গর্ব, ভালোবাসা আর সংহতি। কয়েক মুহূর্ত স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যা আশংকা করছিলাম, ঠিক সেটাই হলো। আমি কেঁদে ফেললাম। তারপর একে একে সকলকে আলিংগন ও চুম্বন। ততোক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে আমি—সচরাচর যা করি না তা করে বসলাম। মুঠো পাকানো ডান হাত তুলে শ্লোগান দিলাম : "সান্দিনো ভিভে! ভিভা লা রেভোলুসিয়োন!"—বার বার মহড়া দেওয়া নাটকের এক চরম দৃশ্যের মতো আশপাশের পাঁচটি হাত মুঠো পাকিয়ে উঠে গেল,—পাঁচটি কণ্ঠ ধ্বনি তুললো : "সিয়েম্প্রে ভিভে!"—চিরজীবী হোন সান্দিনো, চিরজীবী হোক বিপ্লব!

কিছু কিছু ঘটনার পর ঘটনাস্থলে আর থাকা চলে না, হাঁটা লাগাতে হয়। আমি তাই পা বাড়াতেই দোকানের কম্পানিয়েরা ডাক দিলেন—"কম্পানিয়েরো, অতিথিদের এই খাতাটায় একটু নাম লিখে যাও।"

নামধাম লিখছি যখন, কার্লা তখন পাশ থেকে চাপাগলায় বলে উঠলো :

"আমাদের এই খাতায় এটাই বোধহয় প্রথম কোনো ভারতীয় কম্পানিয়েরোর সই।"

* * *

মাসায়ার পথে পথে যাঁদের দেখছি তাঁদের গায়ের রঙে, মুখের ছাঁদে 'ইণ্ডিয়ান' বৈশিষ্ট খুবই স্পষ্ট। কেউ কেউ চলেছেন ঘোড়ায় চেপে। পাথুরে রাস্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে এক কিশোর ইণ্ডিয়ান অশ্বারোহী। জামাকাপড় দেখলেই চেনা যায় গাঁয়ের ছেলে বলে। তার দৃষ্টিতে লাগাম ধরার ভংগীতে আশ্চর্য বলিষ্ঠতা।

ছোট ছোট বাড়ি। সাদামাটা। দেখেই বোঝা যায় বহুকালের পুরোনো। নোনা ধরা। ইঁটগুলো পড়েছে বেরিয়ে। বাড়ির চাল বেশিরভাগই টিনের। শোষিত তৃতীয় বিশ্বের গ্রামগঞ্জের সনাতন ছবি মাসায়া, মোনিম্বো। অর্থাভাবের ছাপ সর্বত্র। কিন্তু আঁতিপাতি করে খুঁজেও আবর্জনা বা নোংরা কিছু দেখছিনা। চারিদিক যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গাঁয়ের লোকজনের মুখে একটা শান্ত ভাব। এদিকে ওদিকে বাচ্চারা খেলে বেড়াচ্ছে। অনেকেরই পরণে শুধু একটা প্যাণ্ট। কিন্তু কারুরই চেহারা রুগ্ন বা অপুষ্টিভোগা নয়। গাড়ির জানলা দিয়ে হাত নাড়তেই সকলে হৈ হৈ করে হাত নাড়ছে, হাসছে।

নিকারাগুয়ায় আজ কোনো শিশুই অভুক্ত নেই।

গ্রাম থেকে বড় রাস্তায় পড়ার মুখেই দেখি একটা বড় মতন গাছের ছায়ায় সার সার কাঠের বেঞ্চি পেতে ক্লাশ চলছে। একটি ব্ল্যাকবোর্ড রয়েছে। পড়ুয়ারা সকলেই বয়স্ক-বয়স্কা। কয়েকজন তো রীতিমতো প্রৌঢ়।

* * *

মাসায়া থেকে গ্রানাদার পথে। মানাগুয়া শহরটা অনেক, অনেক পেছনে। পথের দু'ধারে ক্ষেতখামার। সবুজ আর সবুজ।

লেক নিকারাগুয়ার কোলঘেঁষে এই প্রাচীন, ঐতিহাসিক শহর গ্রানাদা। স্প্যানিশ 'কন্‌কিস্‌তাদোরেস' বা বিজেতারা এসে এই শহরেই প্রথম আড্ডা গেড়েছিলেন। এটাই ছিল তাঁদের রাজধানী। চমৎকার স্প্যানিশ স্থাপত্যের নিদর্শন চারদিকে। সরু সরু রাস্তা দেখেই মালুম হয় এ-শহরের বয়েস অনেক। বেজায় পুরোনো আমলের বাড়ি। ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে গ্রানাদায় পুরোনো পাণ্ডুলিপির সোঁদা গন্ধ নিয়ে।

নিকারাগুয়ার রাজনীতিতে, ইতিহাসে গ্রানাদা ও লেয়ন এই দুটি শহরের ভূমিকা খুব বড়। অভিজাত লোকেরা এই দুই শহরেই থাকতো। উনিশ শতকে নিকারাগুয়া এক স্বাধীন (?) রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ানোর পর গ্রানাদা ও লেয়ন শহর থেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন নিকারাগুয়ার প্রথম নেতারা। বেরিয়ে এসেছিলেন ঐ দুই শহরের অভিজাত শ্রেণী থেকে। তাঁরাই ছিলেন ভূস্বামী।

বিশাল বিশাল ক্ষেতখামার, কফি ও ফলের প্ল্যানটেশনের মালিক। কালক্রমে গ্রানাদা ও লেয়ন থেকেই অভ্যুদয় হয় নিকারাগুয়ার পুঁজিপতি শ্রেণীর।

গ্রানাদা শহরটা স্বাভাবিকভাবেই ছিল রক্ষণশীলতার ঘাঁটি। তার পুরোনো পুরোনো প্রাসাদোপম দালানকোঠায় আজও লেগে আছে সাবেক রক্ষণশীলতার বিবর্ণ ছায়া। মধ্যযুগীয় স্প্যানিশ স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরী বিশাল বাড়িগুলোর গাম্ভীর্য, জলুসহীন ছাতলাপড়া বিগত-আভিজাত্যের পরাজিত কাহিনী আর তারই পাশে হর্ম্যের গায়ে গায়ে লাল হরফে লেখা বিপ্লবীদের শ্লোগান, রাইফেলের ছবি, ইণ্ডিয়ান কৃষকরমণী আর শ্রমিকের ছবিওলা 'মিউরাল'—সাড়ে চারশো বছরের পুরোনো এই শহরের, এই দেশের ইতিহাসটাকে দ্রষ্টার গোচরে আসে সহজেই। ফুটিয়ে তোলে আকারে প্রকারে কথায় রঙে রেখায় গন্ধে গ্রানাদা ও নিকারাগুয়া দেশটার ক্রান্তির ইতিহাস। সেই ক্রান্তির রঙ লালচে আভা ছড়িয়ে দিয়েছে পশ্চিমের আকাশে। তারই কিছুটা ঝরে পড়ছে সমুদ্রের মতো হ্রদ লেক নিকারাগুয়ায়, কিছুটা নেমে এসেছে বাড়ির ছাদে, পথে, দেওয়ালের শ্লোগানে, বিপ্লবের ছবিতে, মানুষের মুখেচোখে।

পাথুরে রাস্তায় আমার পাশে হাঁটতে হাঁটতে, সূর্যাস্তের আলোয় গ্রানাদার দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা, লেখা অরুণোদয়ের ছবি আর বাণী পড়াতে পড়াতে কার্লা আমায় প্রায় নিভৃতে গান শোনানোর মতো করে বলে চললো গ্রানাদার রাজনীতির ইতিহাস, এ-শহরের বিপ্লবীদের লড়াই-এর কাহিনী।

* * *

মানাগুয়ায় ফিরতে লাগবে ঘণ্টা দুয়েক কি তারো বেশী। মিতভাষী কম্‌পানিয়েরো হাইমে নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে। পেছনের আসনে কার্লা, মাগালি ও লুইসা গুণগুণ করে সাংসারিক কথা বলে চলেছে।

জানলার বাইরে ঘন অন্ধকার। এমন সময়ে হাইমে গাড়ির রেডিয়োটা চালিয়ে দিতেই সানদিনিস্তা বেতারে উপচে পড়লো—হবি তো হ'—পীট সীগারের দরাজ গলা। পীট তাঁর অনবদ্য গিটারের ঝঙ্কার তুলে গাইছেন কিউবান মুক্তিযোদ্ধা হোসে মার্তির গান 'গুয়ানতানামেরা'। তামাম লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী আত্মার গান 'গুয়ান্‌তানামেরা'।

পেছনের আসনে কথা থেমে গিয়েছে। কার্লা, মাগালি ও লুইসার মধ্যে কেউ একজন (বোধহয় লুইসা) পীট সীগারের সংগে গলা মিলিয়ে গাইছে গুণগুণ করে—

"ইয়ো সোই উন্‌ অম্‌ব্রে সিন্‌সেরো"—... 'তালগাছের দেশ থেকে আসা, আমি এক সত্যভাষী লোক...'

বারোই মে

দুপুর দুটো নাগাদ মাগালি ও কার্লার সংগে লেয়ন যাত্রা। চালক বন্ধু হাইমে। মানাগুয়া থেকে ঘণ্টা দেড়েকের বেশী লেগে যায় লেয়ন পৌঁছোতে। বেশ দূরে।

গ্রানাদা যাবার পথে রাস্তার দু'ধারে যে দৃশ্য দেখেছিলাম, লেয়ন যাবার পথটা অন্য হলেও দৃশ্য সেই একই। প্রায় একটানা ক্ষেতখামার। যান্ত্রিক উপায়ে সেচ হচ্ছে। কোথাও বা ফোয়ারার মতো কিছু স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে ফসলের গায়ে জল বা ঐ ধরণের কোনো তরল পদার্থ স্প্রে করা হচ্ছে।

সড়কের পাশে পাশে, কিছুদূর অন্তর বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপন। বেশীরভাগ বিজ্ঞাপনই নানান রাজনৈতিক দলের। কোনোটা রক্ষণশীল, কোনোটা খৃশ্চান ডেমোক্র্যাটিক, কোনোটা আবার কমিউনিস্ট পার্টির বিজ্ঞাপন। প্রতিটি বিজ্ঞাপনেই এক একটি রাজনৈতিক দলের মতবাদ ও আদর্শ বেচার চেষ্টা। এবং বিজ্ঞাপনগুলো স্থায়ী। আকারে বিরাট।

নিকারাগুয়ায় যে "এক পার্টির একনায়কতন্ত্র" বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দুই পার্টির দু'নায়কতন্ত্র নয়, বহু পার্টির উপস্থিতি, তারা সকলেই যে সমানভাবে ও খোলাখুলি প্রচার চালাতে পারে এবং সান্দিনিস্তাদের তরফে বিরোধী দলগুলোর কণ্ঠরোধ করার কোনো চেষ্টাই যে নেই তা এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়।

মার্কিন সরকার ও তাঁদের প্রচারণা সংস্থা এর ঠিক উল্টো ছবিটাকেই সত্যি বলে চালানোর চেষ্টায় ভীষণ ব্যস্ত। এবং তাঁদের বহু দাবি, বহু উক্তির মতো এটাও সম্পূর্ণ মিথ্যে।

সোশালিস্ট পার্টির বিজ্ঞাপনে লেখা: আমরাই দেখাতে পারি সাম্যের সঠিক পথ।

এক খৃশ্চান দলের শ্লোগান: "রেলিহিয়োন ই রেভোলুসিয়ন—ন' আই কনত্রাদিক্‌সিয়োন"—ধর্ম ও বিপ্লবের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

আর একটি রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞাপনে লেখা: "রেভোলুসিয়োন্ সি, কমুনিস্‌মো ন' "—'বিপ্লব—হ্যাঁ, কমিউনিজম—না।'

লেয়ন ঠিক গ্রানাদারই মতন এক প্রাচীন শহর। এবং গ্রানাদার ইতিহাস বলতে গিয়ে লেয়নের ইতিহাসও বলে দিয়েছি। গ্রানাদার সংগে লেয়নের

পার্থক্য কেবল একটি জায়গায়। সোমোসার বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের সময়ে লেয়ন ছিল বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের একটা বিরাট ঘাঁটি। নিকারাগুয়ার লোকে বলে, লেয়ন ছিল বিপ্লবের রাজধানী। লেয়নের দেওয়ালে দেওয়ালে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ রাখা রয়েছেঃ বৈপ্লবিক শ্লোগান, বাণী আর হাতে আঁকা ছবির ছয়লাপ।

পথে ঘুরতে ঘুরতে--এ-গলি ও-গলি দিয়ে (গ্রানাদা ও লেয়নে গলিই বেশী) এসে পড়লাম লেয়নের মেডিকেল কলেজে। কলেজে তখন ক্লাস হচ্ছেনা, তবে বাইরের দরজাটা খোলা। কার্লা ও মাগালির সংগে ঢুকে পড়া গেল ভেতরে। কোনো শিল্পী যেন তৈরী করেছেন বাড়িটা, এতো সুন্দর। কমসে কম দেড়শো দুশো বছরের পুরোনো। মুক্ত নিকারাগুয়ার ছাত্রছাত্রীরা যে কী পরিমাণে রাজনীতি সচেতন ও রাজনীতির সংগে যুক্ত তা স্পষ্ট বোঝা যায় বিশেষ বিশেষ জায়গায় লেখা শ্লোগান আর টাঙানো ইস্তেহারগুলো দেখলে। তবে লক্ষ্য করছি যে এই সুন্দর বাড়িটার দেওয়াল-গুলোয় বা নক্সাকাটা সুদৃশ্য থামগুলোয় যত্রতত্র শ্লোগান লেখা নেই। দু'একটা জায়গায় দেওয়ালে শ্লোগান লেখা। তবে পড়লেই বোঝা যায় যে এই শ্লোগানগুলো লেখা হয়েছিল বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করার আগে। সে সময়কার ছাত্র ও শিক্ষকদের সংগ্রামী উক্তি ও স্বপ্নময় কথাগুলো মুক্ত নিকারাগুয়া মুছে ফেলেনি। বিপ্লবীর মূল্যবান ডায়রির মতো এইসব দেওয়াললিপি রক্ষা করা হয়েছে। এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করেছি নিকারাগুয়ার অন্য কয়েকটা বিদ্যাপীঠে গিয়ে।

লেয়নের মেডিকেল কলেজে দেখছি বিশেষ জায়গায় আলাদা বড় বোর্ড টাঙানো। এবং তারই গায়ে শ্লোগান লেখা, রাজনৈতিক কার্টুন আঁকা বা খবরের কাগজের ক্লিপিং সাঁটা।

অনেকগুলো সংগ্রামী উক্তিই মার্কিন সরকারের সাম্প্রতিক কীর্তি অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে--অর্থাৎ গত এক সপ্তাহের মধ্যে লেখা হয়েছে।

একজায়গায় এক ছাত্রশিক্ষক সভার আগাম বিজ্ঞপ্তি। ছাত্র ইউনিয়নই দিয়েছেন। তাতে—পড়ে নিলাম,—কম্পানিয়েরো শিক্ষক অমুক ভাষণ দেবেন। মুক্ত নিকারাগুয়ায় শিক্ষকরা ও ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরের "কম্পানিয়েরো"।

মেডিকেল কলেজে ঘুরতে ঘুরতে আলাপ হয়ে গেল এই বাড়িটার একজন তত্ত্বাবধায়কের সংগে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। কোনদিন দেশের বাইরে যাননি। খবর কাগজ ও বইপত্রই হলো বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের উৎস। লেয়নের এই আপাত সাদাসিধে 'কেয়ার টেকার' আমায় তাক্ লাগিয়ে দিলেন ভারত সম্পর্কে অতি প্রাসংগিক সব প্রশ্ন করে। আমার আগে আর কোনো ভারতীয়কে স্বচক্ষে দেখেননি তিনি। কাজেই হাতের কাছে এক জলজ্যান্ত 'কম্পানিয়েরো ইন্দুকে' পেয়ে তাঁর কৌতুহল ও প্রশ্ন আর থামতেই চায়না।

ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে ভদ্রলোক রীতিমতো খবর রাখে, মায় রাজীব গান্ধী সম্পর্কেও।

ভারতের কৃষক শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে শুধু ইনিই নন, নিকারাগুয়ার অনেকেই বেশ আগ্রহী। তবে সঠিক খবরাখবর খুব কমই পৌঁছোয়, খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো তো নয়ই।

লেয়ন মেডিকেল কলেজের এই প্রৌঢ় কম্পানিয়েরোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরোনোর সময়ে মনে হলো পশ্চিমী দুনিয়ায় সব মিলিয়ে প্রায় বছর দশেক কাটিয়েছি,—একাধিক দেশে। কতো জায়গায় কতো লোকের সংগেই তো আলাপ হয়েছে, কথাবার্তা হয়েছে। এবং সেইসব দেশে বিশ্বের খবর জেনে নেবার কতো হরেকরকমের সুযোগই না রয়েছে আপাতদৃষ্টিতে। অথচ দূর লাতিন আমেরিকার এই গরিব দেশ নিকারাগুয়ায় এসে সাধারণ লোকের মনে আমার দেশ সম্পর্কে যে কৌতূহল ও আগ্রহ দেখছি, জীবন্ত সংহতি ও সম্প্রীতির যে ভাব দেখছি তার কতোটুকু দেখতে পেয়েছি পশ্চিমী দেশগুলোর—সাধারণ লোক তো দূরের কথা—তথাকথিত অসাধারণ লোকদের মনে?

*

লাতিন আমেরিকার আধুনিক সাহিত্য (সমকালীন নয়) প্রসংগে যাঁদের নাম মনে আসে প্রথমেই, রুবেন দারিয়ো তাঁদের অন্যতম। বিদগ্ধজনেরা বলেন, রুবেন দারিয়োর কবিতার মধ্য দিয়েই নাকি লাতিন আমেরিকার কবিতায় আধুনিকতার উন্মেষ হয়েছিল।

রুবেন দারিয়ো ছিলেন নিকারাগুয়ার কবি। এই লেয়ন শহরেই তাঁর জন্ম। এখানেই এক প্রাচীন গীর্জায় তাঁর সমাধি। সেই গীর্জায় গেলাম রুবেন দারিয়োর কবর দেখতে।

বাইরে বেরোতেই চোখে পড়লো বড় রাস্তা দিয়ে মহিলাদের মিছিল চলেছে। সামনে সান্দিনিস্তা ফ্রন্টের নিশান। মিছিলটা মার্কিনী আগ্রাসন ও অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে। শুনতে পেলাম স্পেনের গৃহযুদ্ধের সেই বিখ্যাত শ্লোগান: "ন' পাসারান্"।—'ওরা যেতে পারবে না'।

লেয়ন, গ্রানাদা, মানাগুয়া, মাসায়া—সর্বত্র, এবং গ্রামে গ্রামে কতো জায়গায় শুনছি এই ধ্বনি, দেওয়ালে পড়ছি একই শ্লোগান: "ন' পাসারান্"।

* * *

বাড়ি ফিরতেই দেখা হয়ে গেল এক মার্কিনী চলচ্চিত্রকারের সংগে। মধ্য আমেরিকার ওপর একটা ছবি (তথ্য চিত্র) তুলবেন বলে খান দুই ক্যামেরা, প্রচুর ফিল্ম আর এক সহকারীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন দেশ ছেড়ে। বেরিয়েছেন একটা গাড়ি নিয়ে। নানা দেশ ঘুরে নিকারাগুয়ায় পৌঁছেছেন তিনি গতকাল। মানাগুয়ার ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে স্টেসির সংগে

আলাপ। স্টেসি তাঁকে সংগে নিয়ে এসেছে আমাদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে।

নিকারাগুয়ার সান্দিনিস্তা বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য মার্কিন সরকার মধ্য আমেরিকার যেসব দক্ষিণপন্থী দেশকে ঢালাও সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য জুগিয়ে চলেছেন, এই মার্কিনী চলচ্চিত্রকার কয়েকদিন ধরে সেইসব দেশের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। ঐ দেশগুলোর অবস্থা যে কী শোচনীয়, সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে বিদেশীদের নিরাপত্তা যে সেখানে কী পরিমাণ ভঙ্গুর, রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা যে কতোটা বিপজ্জনক তার গ্রাফিক বিবরণ দিলেন এই ভদ্রলোক। বললেন, "মশাই, চারদিকে শুধু সৈন্য আর সৈন্য। তারা যখন তখন একেতাকে পাকড়াচ্ছে। মারধোর করছে। এল সালভাদোর, গুয়াতেমোলা, অন্দুরাস সর্বত্র সৈন্যরা আমাদের হেনস্তা করেছে। খুন করে ফেলবে বলে ভয় দেখিয়েছে—এবং সকলের হাতেই অটোমেটিক রাইফেল আর সাবমেশিন গান। ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করেছে সমানে। অথচ আমাদের হাতে ভিসা, দেশের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার অনুমতিপত্র সবই রয়েছে। মশাই, প্রাণ হাতে করে, ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে আমাদের বন্ধু দেশগুলোর ভেতর দিয়ে কোনরকমে এসে পৌঁছেছি এই নিকারাগুয়ায়।—মার্কিন প্রচার মাধ্যমে, কাগজপত্রে, খোদ রাষ্ট্রপতির মুখে এই দেশটা সম্পর্কে কত ভয়াবহ কথাই না শুনেছি। অন্দুরাসে এসে এবং সেখানকার হালচাল দেখে ভাবছিলাম, "বন্ধুদেশেই" যদি আমাদের এই দশা হয় তো "কমিউনিস্ট সন্ত্রাসবাদীদের" দেশ নিকারাগুয়ায় আর দেখতে হবে না। এরা তো মার্কিন সরকারের শত্রু। কিন্তু বিশ্বাস করুন,—হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি নিকারাগুয়ায় পৌঁছে। কেউ আমাদের হেনস্তা করছে না, ভয় দেখাচ্ছে না। সীমান্ত পেরোনোর পর থেকে একবারও কোনো পল্টনের মুখোমুখি হতে হয়নি। একবারও কোথাও কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হয়নি। দিব্যি ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি, যেন আমরা এ-দেশেরই লোক। আর, চারদিকে লোকে কি নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখেছেন? খেয়াল করেছেন, নিকারাগুয়ার মানুষ কতোটা বন্ধুভাবাপন্ন, হাসিখুশী?"

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে ভদ্রলোক হাঁপিয়ে গিয়ে দম নিচ্ছেন, সেই সুযোগে ম্যালকম বললো:

"কাদের বলছেন? স্টেসি আর আমিও তো মার্কিনী। এই মক্কেল না হয় ভারতীয়, তৃতীয় বিশ্বের লোক, গায়ের রং এদেশীয়দের মতোই শ্যামলা, দেখে বোঝার উপায় নেই এ বিদেশী। কিন্তু স্টেসিকে আর আমাকে দেখেই তো লোকে বুঝে যায় আমরা মার্কিনী। কই, কোনদিন তো কেউ,—গালাগাল করা তো দূরের কথা,—বাঁকা চোখেও তাকায় না আমাদের দিকে,

বা টিট্‌কিরি দেয়না "ইয়াংকি" বলে। চার মাস হয়ে গেল আছি এ-দেশে। রোজ বাসে চেপে আপিস যাই, বাড়ি ফিরি। রাতবিরেতে ঘুরে বেড়াই যেখানে সেখানে। "মার্কিনী" বা "গ্রিংগো" বলে কেউ আমায় কোনো খারাপ কথা বললো বা টিট্‌কিরি দিলো এরকম একবারও হয়নি। মনে হয় আমি যেন নিকারাগুয়ারই লোক। তাজ্জব হতে হয় মশাই!—অথচ দেখুন, আমারই দেশের সরকার এই ছোট্ট দেশটাকে কি হেনস্তাই না করছে। আমারই দেশের বুলেটে, কামানের গোলায় এদের ছেলেমেয়েরা মরে যাচ্ছে রোজ। এখন তো আমাদের মহান দেশ চেষ্টা করছে এ দেশের জনগণকে না খাইয়ে মারতে। এ'রা তো সবই জানেন। রাস্তায় রাস্তায় মার্কিন সরকার বিরোধী শ্লোগান লেখা। মিছিলের পর মিছিল চলেছে ইয়াংকি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষদের এ'রা তাই বলে শত্রু মনে করেন না, বরং বন্ধুর মতোই দেখেন। এতোটা সাবালক, পরিণত নিকারাগুয়ার সাধারণ মানুষজন।"

স্টেসি এতোক্ষণ চুপচাপ শুনছিল সব। এবার তার মুখ খোলার পালা:

"আসলে, বিরোধীদের সম্পর্কে এদের মনোভাবটাই একেবারে আলাদা, অসাধারণ। কে নিকারাগুয়ার আসল শত্রু, কে তা নয়—এই হিসেবটা এদের খুবই পরিষ্কার। তার ওপর বিরোধীদের সম্পর্কে এদের সহিষ্ণুতা অসীম। আমি তো ফিল্‌ম্ পাড়ার লোক। একটা ঘটনা বলি। পশ্চিম জার্মানীর এক ডাকসাইটে পরিচালক—বোধহয় ভিম্ ভেন্‌ডার্‌স্, নাকি হেয়র্‌ৎসোগ (নামটা গুলিয়ে গিয়েছে)—সান্‌দিনিস্তাদের বিরুদ্ধে একটা তথ্যচিত্র তুলেছিলেন। ভাবতে পারো তোমরা?—সংস্কৃতি মন্ত্রী এর্নেস্তো কার্দেনাল তাঁকে নেমন্তন্ন করে আনেন মানাগুয়ায়। সেই ছবিটা ঘটা করে দেখানো হয় এখানে। প্রকাশ্য সভায় তা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই জার্মান পরিচালক মন খুলে সমালোচনা করেন, খানাপিনা করেন, দেশটা ঘুরেফিরে দেখেন এবং সসম্মানে স্বদেশে ফিরে যান। বিরোধীকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে তাঁর কাজ দেখা, তাঁকে প্রাণভরে সমালোচনা করতে দেওয়া—এই হলো বিপ্লবী নিকারাগুয়া।"

আগন্তুক মার্কিনী পরিচালককে বললাম—"আপনার তথ্যচিত্র এই নিকারাগুয়ার ছবি থাকবে তো?"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন পাল্‌টা প্রশ্ন ক'রে: "এই নিকারাগুয়ার কথা থাকবে তো আপনার বই-এ?"

তেরোই মে

সাতদিন হয়ে গেল নিকারাগুয়ায়। মার্কিনী কবি লরেন্স্ ফেরলিংগেটি মাত্র সাতদিনের অভিজ্ঞতা নিয়েই লিখেছেন তাঁর অসাধারণ প্রামাণিক গ্রন্থ : "মুক্ত নিকারাগুয়ায় সাতদিন।"

ফেরলিংগেটি যখন এর্নেস্তো কার্দেনালের আমন্ত্রণে নিকারাগুয়ায় এসেছিলেন, তখন এ-দেশের অবস্থা ছিল মোটের ওপর শান্ত,—অন্তত 'অর্থনৈতিক অবরোধ' নামে ভয়ানক ব্যাপারটা তখন ছিল না। সামরিক আগ্রাসন অবশ্য তখনো ছিল, এখনো আছে। কিন্তু গত সাতদিনের অর্থনৈতিক অবরোধ এক বাড়তি আগ্রাসন, লড়াই-এর এক নতুন ফ্রণ্ট, যার দরুণ নিকারাগুয়ার সংকট হয়ে উঠেছে আরো তীব্র।

এক ছোট্ট, বিপ্লবী দেশ,—যার অর্থনীতি শতাব্দী শতাব্দী ব্যাপী সাবেক ও নয়া ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও স্বদেশী ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বৈরাচারী শোষণে দুর্নীতিতে এমনিতেই জীর্ণ শতছিন্ন ও রক্তহীন,—এই বহুবিধ তীব্র সংকটের মোকাবিলা কিভাবে করতে পারে, কিভাবে তারা নিত্যনতুন প্রতিকূলতার ধাক্কা সামলাতে চেষ্টা করে, এটা দেখার এ এক অসাধারণ সুযোগ। কিন্তু পর্যবেক্ষকের এই সুযোগের অপরপিঠেই রয়েছে নিকারাগুয়ার লক্ষ লক্ষ সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের প্রখর যন্ত্রণা, কষ্ট স্বীকার, আত্মত্যাগ, লড়াই। এক মুক্ত সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্য এবং আরব্ধ বিপ্লবকে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নিকারাগুয়ার জনগণের যে সংগ্রাম, তার সংগে যুক্ত হয়েছে এক প্রচণ্ড স্নায়বিক চাপ।

নিকারাগুয়ার বেশীরভাগ বিপ্লবী নেতা নানান দেশে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিদেশ চলে গিয়েছেন গত ক'দিনে। যে-ক'জন এখনো রয়ে গেছেন তাঁরা স্বদেশে দারুণ ব্যস্ত। দেশবাসীদের সাহস দিতে, উৎসাহ দিতে, দেশের অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ও সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে কমান্দান্তেরা ও অন্যান্য নেতারা ছুটে বেড়াচ্ছেন গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে। দিকে দিকে প্রচার চলছে। চলছে জোরালো সাংগঠনিক কাজ, সম্ভাব্য মেরিন আক্রমণের ও পুরোদস্তুর প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি।

এরই মধ্যে এতো কিছুর মধ্যেও নিকারাগুয়ার জনজীবন চলছে স্বাভাবিক গতিতে। লোকে শান্ত হয়ে যে যার কাজ করে চলেছে। আবার অবসর

বিনোদনেরও ঘাটতি নেই কোথাও। সিনেমা থিয়েটারে, সংগীতের আসরে, কফির দোকানে, পাঠাগারে, আর্ট গ্যালারিতে আর বই-এর দোকানে যথেষ্ট ভীড়। বাগানে বাগানে, পথে পথে হাত ধরাধরি করে চলেছেন, বসে রয়েছেন প্রেমিক-প্রেমিকারা। এ'দের মধ্যে অনেকেই (কি ছেলে, কি মেয়ে) ফ্রণ্ট-ফেরতা বা ফ্রণ্টযাত্রী সৈনিক, মিলিশিয়া।

জনজীবন এতো স্বচ্ছন্দ, সহজ যে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই এদেশের ওপর দিয়ে এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে।

পুলিশ চোখেই পড়েনা প্রায়। কিছু ট্র্যাফিক পুলিশ শুধু জায়গায় জায়গায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছেন। পল্টনও বেশ কম। সামরিক পোষাক পরা ছেলেমেয়েদের দেখা যায়। তবে আহামরি সংখ্যায় নয়।

স্কুল কলেজ চলেছে নিয়মিত। নীল প্যাণ্ট বা স্কার্ট আর সাদা জামা পরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যাচ্ছে, মাঠে খেলে বেড়াচ্ছে, ক্লাশের পর জটলা করছে স্কুলের সামনে বা বাসস্টপেজে। স্কুলবাস চলে যাচ্ছে ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে। পথ চলতে মাঝেমধ্যেই দেখতে পাই সুবিধেমতো জায়গায়, হয়তো কোনো গাছতলায় প্রাপ্তবয়স্কদের ক্লাশ চলছে।

রাস্তার ধারে ধারে সান্দিনিস্তাদের প্রচারবোর্ড। তাতে দেশাত্মবোধক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্লোগান লেখা। বড় বড় করে লেখা শান্তির বাণী। উৎপাদন বাড়ানোর, আগ্রাসীদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার শ্লোগান। জনগণের বিপ্লবকে বাঁচানোর ও এগিয়ে নিয়ে যাবার আহ্বান। সাম্যবাদের পক্ষে দুটি কয়েক সান্দিনিস্তা প্রচারবোর্ড চোখে পড়েছে।

রাশিয়া বা চীন বা কিউবার দোহাই পাড়া কোন প্রচারবোর্ড কোথাওই দেখছিনা। তিনটি শহর ও কয়েকটি গ্রামে ঘুরে, তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো রুশপন্থী বা চীনপন্থী বা কিউবাপন্থী শ্লোগান দেখতে পাইনি। সান্দিনিস্তা ফ্রণ্ট, কমিউনিস্ট পার্টি, মার্কসবাদী লেনিনবাদী দল কেউই, যা দেখছি, অন্য কোনো দেশের দোহাই পেড়ে কোনো শ্লোগান দেননা বা লেখেননা। এমনকি দেওয়ালে দেওয়ালে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত লেখাতেও কোনো দাদা-দেশ, মামা-দেশের নামগন্ধ নেই।

সান্দিনিস্তাদের প্রচারবোর্ডে মার্কিনবিরোধী উক্তি একটাও নেই। তবে 'আগ্রাসনের' উল্লেখ রয়েছে। আর পটু-অপটু হাতে লেখা অসংখ্য দেওয়াল লিপিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কথাটথা দেখছি। কয়েকটি জায়গায় আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা: "ইয়াংকি, ইহো দে পুতা", অথবা "ইয়াংকি, ইহোয়েপুতা": অর্থাৎ, গণিকাপুত্র।

সান্দিনোর উক্তির উদ্ধৃতি প্রায়ই চোখে পড়ে। সান্দিনিস্তারা বেশ সুপরিকল্পিতভাবেই এই উদ্ধৃতিগুলো ব্যবহার করছেন। বেশীরভাগ উক্তিই

দেশাত্মবোধক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। প্রচার চালানো হচ্ছে বেশ সচেতনভাবেই —কিন্তু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছেনা। হিংসাত্মক কোনো উক্তি একবারও দেখিনি কোনো প্রচারে।

পণ্যের বিজ্ঞাপনে মেয়েদের ছবি তেমন নেই। যেটুকু আছে তাতে যৌনতার আস্ফালন নেই একেবারেই। নারীদেহের ছবি দেখিয়ে পণ্যের বা কোনো কিছুর বিজ্ঞাপন বিপ্লবী নিকারাগুয়ায় বেআইনি, অনুপস্থিত।

টেলিভিশনে প্রচার চলছে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। প্রায়ই পর্দায় লেখা ভেসে ওঠেঃ "১৯৮৫—শান্তির বছর ; আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই-এর বছর।"

ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট আবর্জনামুক্ত রাখার জন্য জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রচার চলেছে টেলিভিশনে। এই প্রচার শুধু শ্লোগানে বা বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ নয়: কী করে ময়লা পরিষ্কার করতে হবে, বাড়ির ভেতর ও বাইরে, পাড়ার সর্বত্র, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখতে হবে, কোথায় আবর্জনা জড়ো করতে হবে, রোজ ক'টার সময়ে পৌরসংস্থার গাড়ি এসে কোন্ কোন্ জায়গা থেকে আবর্জনা সরিয়ে নিয়ে যাবে—তার অনুপুঙ্খ বিবরণ ক্রমাগত ছবির মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। —এবং এইসব ছবি ও প্রচারের বক্তব্য ও প্রতিশ্রুতি যে অক্ষরে অক্ষরে কাজে পরিণত হয়ে চলেছে তা সারাক্ষণই দেখতে পাচ্ছি। শহরগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ি বা পুলিশের গাড়ি যতো, ময়লাতোলার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঢাকা দেওয়া ট্রাক সংখ্যায় তার চেয়ে ঢের বেশী।

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সান্দিনিস্তাদের বৈপ্লবিক প্রচার ও কাজকর্মও পুরোমাত্রায় ফলপ্রসূ। বিপ্লবের আগে যেখানে নিকারাগুয়ায় অসংখ্য লোক নানান অসুখে ভুগতো, প্রতি দশটি শিশুর মধ্যে একটি শিশু পোলিয়োয় আক্রান্ত হতো, আজ, বিপ্লবী নিকারাগুয়ায় সেখানে রুগ্ন লোকদের চিকিৎসা হচ্ছে অতি দ্রুত (এবং বিনা পয়সায়), কোনো শিশুই আর পোলিয়োর কবলে পড়েনা, শিশু মৃত্যুর হার প্রায় শূণ্য। সাধারণভাবে নিকারাগুয়ার জনগণকে স্বাস্থ্যবান স্বাস্থ্যবতীই দেখছি। সকলের মধ্যেই একটা বেশ তাজা, বলিষ্ঠ ভাব।

টেলিভিশনে বা রাস্তার প্রচারবোর্ডে নেতাদের ছবি প্রায় দেখাই যায়না। নেতাদের উক্তি কথায় কথায় উদ্ধৃত করার রেওয়াজও বোধহয় নেই তেমন। তিনটি শহর ঘুরে এখন পর্যন্ত কেবল একটি হোর্ডিং দেখেছি যাতে কমান্দান্তে তোমাস্ বোর্হের বাণী লেখা। সান্দিনিস্তা ফ্রন্টের একমাত্র জীবিত প্রতিষ্ঠাতা, বিখ্যাত গেরিলাযোদ্ধা, কমাণ্ডার, মার্কসবাদী ভাবুক, লেখক, তাত্ত্বিক ও অধুনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তোমাস্ বোর্হে'র সেই বাণীও আবার লেখা রয়েছে এক নির্জন সড়কের ধারে,—মানাগুয়ার বাইরে। সেই বাণীও আবার কবিতার একটি টুক্‌রোঃ

"বিপ্লবের সফলতা দেশের প্রতিটি নদীর বুকে দুধ ও মধুর প্লাবন এনে দেবে; তারই রসে এ-দেশের মাটি হবে সুফলা; দেশের প্রতিটি মানুষ হবে সুখী, শান্তিকামী।" হলুদ বোর্ডের ওপর সবুজ হরফে লেখা প্রবীন বিপ্লবীর

এই স্বপ্নময় কথার পেছনে দিগন্তছোঁয়া সবুজ ক্ষেত। ওপরে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বিপুল গভীর নীল আকাশ।

এর্নেস্তো কার্দেনালের ষাট বছর পূরণ উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি অভিবাদন জানিয়ে লেখা বিশাল হোর্ডিং দেখেছি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কাছাকাছি। তাতে শুধু লেখা ঃ "মানুষের প্রকৃত মূল্য শুধু তার ত্যাগে নয়, তার কাজে।"— সন্ন্যাসী-গেরিলা-বিপ্লবী-কবি এর্নেস্তোর যোগ্য মূল্যায়ণ।

নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রপতি, গেরিলা কমান্দান্তে দানিয়েল অর্তেগা বা অন্য কোনো নেতার বচন অথবা ছবি কোথাও দেখছিনা প্রচার হিসেবে।

দেওয়ালে দেওয়ালে ছবির ছয়লাপ। লড়াই-এর, বিপ্লবের, চাষ আবাদের, স্বাক্ষরতা-অভিযানের, চিকিৎসার ছবি। গোটা দেওয়াল জোড়া রঙীন ছবি। অধিকাংশ ছবি পাকা হাতে আঁকা। একবার তাকালেই দাঁড়িয়ে যেতে হয়, বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখতে হয়—এতো সুন্দর। নিকারাগুয়ার শিল্পীরা এইসব মিউরালের কিছু কিছু এঁকেছেন। কয়েকটা এঁকে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন ইতালী থেকে আসা বিপ্লবসমর্থক মিউরালিস্টরা। কয়েকজন ইতালীয় মিউরালিস্টের সংগে পরিচয় হয়েছে। সকলেই তরুণ তরুণী। বছরখানেকের ওপর রয়েছেন নিকারাগুয়ায়। নিকারাগুয়া সরকার তাঁদের খরচপত্র বহন করছেন। পছন্দমতো দেওয়ালে দেওয়ালে এই শিল্পীরা এঁকে চলেছেন বিপ্লবী নিকারাগুয়ার ছবি।

তেরোই মে—বিকেল

সাক্ষাৎকার :

লিসান্দ্রো চাভেস্ আল্‌ফারো। কম্‌পানিয়েরো লিসান্দ্রো এক খ্যাতনামা কাহিনীকার, প্রবন্ধলেখক, এবং রুবেন দারিয়ো জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক।

জাতীয় গ্রন্থাগারে ঢুকতেই চোখে পড়লো বড় বড় দুটো ঘরে যারা পড়াশুনো করছে তাদের বেশীরভাগই অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে। বয়স্ক পাঠক যে নেই তা নয়। তবে শতকরা পঁচানব্বুই জনই নবীন। দেখে মনে হলো বেশীরভাগই স্কুলের ছেলেমেয়ে।

অনেকেই দলে দলে ভাগ হয়ে একটা বই থেকে নোট নিচ্ছে। কোথাও বা আলোচনা চলছে বই-এর ওপর ঝুঁকে। খোসগল্প যে নয় তা মুখের ভাব দেখে, এবং নোট নেবার বহর থেকেই বোঝা যায়। অতোগুলো অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে বসে রয়েছে এক জায়গায়, অথচ কোনো হৈ হট্টগোল নেই। গুঞ্জন নেই।

কম্‌পানিয়েরো লিসান্দ্রো বললেন : "বিপ্লবের পর নিকারাগুয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে। ১৯৭৯ সালের আগে, অর্থাৎ বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করার আগে এ-দেশে মোট চল্লিশটা পাঠাগার ছিল। এখন, ১৯৮৫ সালের এই মে মাসে পাঠাগারের সংখ্যা চারশো। তবে যা দরকার তার অনেক কিছুই এখনো হয়ে ওঠে নি। জাতীয় গ্রন্থাগার তৈরী হয়েছিল ১৮৮২ সালে। তারপর দুটি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে হাজার হাজার বই ধ্বংস হয়ে যায়। তার ওপর সোমোসার আমলে 'গ্রন্থাগার' ব্যাপারটাই ছিল চূড়ান্ত অবহেলিত। সে-সময়ে লোকে লাইব্রেরি টাইব্রেরির কথা ভাবতোই না। বিপ্লবের আগে নিকারাগুয়ার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লাইব্রেরি সায়েন্স' নামে কোনো বিভাগই ছিল না। ফলে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের গুরুতর অভাব। আজ যাঁরা এই কাজ করছেন তাঁরা দিনে চাকরি করেন আর সন্ধ্যেবেলা 'লাইব্রেরি সায়েন্স' পড়েন।"

"বই-এর অভাব ছিল প্রকট। মেক্সিকো আর কিউবা যথেষ্ট বই দান করেছে। এখন প্রতিদিন গড়ে পাঁচশো পাঠক পাঠিকা আসেন এই জাতীয় গ্রন্থাগারে।"

"ছেলেমেয়েরা এসেছে স্কুলের ছুটির পর রেফারেন্স বই ঘেঁটে 'বাড়ির কাজ' করতে, পড়া তৈরী করতে। অনেকেই এসেছে। বিস্তর পথ ঠেঙিয়ে,

অনেকটা পথ বাসে চেপে। বিপ্লবের আগে এসব ভাবাই যেতো না। গ্রন্থাগারগুলো সেকালে মাছি তাড়াতো।"

স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়ার উৎসাহ প্রসংগে এসে পড়লো স্বাক্ষরতা-অভিযানের কথা। লিসানদ্রো চাভেস আল্‌ফারো বললেনঃ "ক্ষমতা দখলের ঢের আগেই বিপ্লবীরা মোটামুটি একটা ব্যাপক পরিকল্পনা এঁকে নিয়েছিলেন, বিপ্লব সফল হলে কোন কোন কাজ প্রথমেই করা দরকার সে-সম্বন্ধে। দেশের বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর মানুষকে অবিলম্বে লেখাপড়া শেখানো ছিল তাঁদের কর্তব্য তালিকার ওপরের দিকে। ১৯৭৯ সালে বিপ্লব সফল হয়। আর ১৯৮০ সালেই স্বাক্ষরতা অভিযানের পরিকল্পনা তৈরী হয়ে যায়। শহরের একলক্ষ ছাত্রছাত্রী ছয় মাস ধরে গ্রামের কৃষকদের সংগে ছিল। এ-দেশ কৃষিপ্রধান। অথচ শহুরে ছেলেমেয়েরা জানতোই না গাঁয়ের মানুষ কী অবস্থায় রয়েছে। গ্রামের নিরক্ষর জনগণকে লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে তারাও শিখতে লাগলেন অনেক কিছু। এই দেশ সম্পর্কে তাদের ধারণাই গেল পাল্টে।

দিনের বেলা তারা 'কাম্‌পেসিনোদের' (কৃষকদের) বাড়িতে থেকে তাদের কাজে সাহায্য করতো। কাজ শিখতো তাদের কাছ থেকে। আর সন্ধ্যেবেলা তারা লেখাপড়া শেখাতো কাম্‌পেসিনোদের। ছেলেমেয়েদের সংগে সংগে তাদের বাপমায়েরাও এবার গ্রামমুখো হলেন।

কারণ ছেলেমেয়েদের সংগে দেখা করার জন্য গ্রামে যেতে এবং সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে আনতে বাধ্য হলেন তাঁরা। শহরের মানুষ এই প্রথম স্বচক্ষে দেখলেন গাঁয়ের জনগণের আসল অবস্থাটা। এইভাবে শিক্ষার সংগে, শিক্ষা-ব্যবস্থার সংগে, জড়িয়ে পড়লো রাজনীতি, সমাজ— যেগুলো যে-কোনো শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংগ। কোনো শিক্ষাব্যবস্থাই মতাদর্শ নিরপেক্ষ নয়, রাজনীতি মুক্ত নয়। হতে পারে না।"

* * *

রুবেন দারিয়ো জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক লিসানদ্রো যে লেখেন, গল্প প্রবন্ধ লেখেন, সেই লেখাটাকেও তিনি একটা 'পুরোদস্তুর রাজনৈতিক কাজ বলে মনে করেন। বললেনঃ "সাহিত্যও মতাদর্শ নিরপেক্ষ নয়, রাজনীতিমুক্ত নয়। হতে পারে না।"

মানাগুয়ার কিছু বই-এর দোকানে ঘুরছি। লেনিন, মার্ক্স ও এংগেল্‌স্‌-এর বই প্রচুর। লাতিন আমেরিকার মার্কসবাদী ভাবুক, বিশেষত 'থিয়োলজি অফ লিবারেশন' সম্পর্কিত বই-ও রয়েছে। আছে কিছু কিউবান লেখকের বই। নিকারাগুয়ান কবিদের ক'টি বই-ও চোখে পড়ছে। উপন্যাস ও ছোট গল্পের সংকলন এতো কম কেন? নিকারাগুয়া শুনেছি কবিদের দেশ। তাই যদি হয় তো বই-এর দোকানে কাব্যগ্রন্থ এতো বাড়ন্ত কেন? প্রবন্ধের বই

তেমন চোখেই পড়ছে না। আলোচনাগ্রন্থও সংখ্যায় বেশী নয়। তোমাস্ বোর্হের লেখা কিছু আলোচনাগ্রন্থ দেখছি।

লেনিন, মার্কস ও এংগেল্স্-এর ছয়লাপ, কিন্তু মাও সে তুং অনুপস্থিত।? দু'একটা দোকানে চে গেভারার ভাষণসংকলন রয়েছে। ভিনদেশী সাহিত্যের বই প্রায় নেই বলা চলে। ভিনদেশী আলোচনাগ্রন্থের অবস্থাও তথৈবচ।

প্রায় সবকটি দোকানেই রয়েছে শুধু স্প্যানিশ ভাষায় লেখা বই। একটি দোকানে খান দুই ইংরিজী বই দেখলাম।

তেরোই মে—সন্ধ্যে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালে বামপন্থী মার্কিনী লেখিকা মার্গারেট র‍্যান্ডালের কাছে শুনেছিলাম নিকারাগুয়ার এক প্রথম সারির শিল্পী মারিয়া গাইয়ার কথা। তাঁর আঁকা কিছু ছবির আলোকচিত্রও দেখেছিলাম মার্গারেটের সৌজন্যে। সেই থেকে মারিয়া গাইয়ার সংগে আলাপ করার ইচ্ছে।

মারিয়া গাইয়া হলেন মানাগুয়ার গণললিতকলা কেন্দ্রের আঁকার বিভাগের পরিচালিকা।

সেখানে গিয়ে দেখি একটা ছোটমাপের ঘরে কয়েকজন সাংস্কৃতিক কর্মীর সংগে কথাবার্তা বলছেন কম্‌পানিয়েরা মারিয়া। ঘরের চারদিকে নানান হাতের কাজ ছড়ানো। দেওয়ালে প্রচুর ছবি। দিস্তে দিস্তে ছবি রাখা আছে টেবিলগুলোর ওপর।

মারিয়ার বয়েস বোধহয় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। কথা বলেন কিশোরীর মতো। সারাক্ষণই ছটফট করছেন, বেশ সরবে কলকল করে বলে চলেছেন, আর সেই সংগে অকৃপণ হাসি।

প্রথমে রাশি রাশি ছবি দেখালেন আমাকে। সেই সংগে চললো শিল্পী পরিচিতি। তারপর স্প্যানিশ ভাষায় বললেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি ইংরিজীতেই দেবো, এই সুযোগে ইংরিজীটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাবে।

মারিয়া ঃ এখানে আমার কাজ হলো অপেশাদার শিল্পীদের সংগঠিত করা। সংগঠনের দায়িত্বে আছি। নিকারাগুয়ার সব ধরণের মানুষ, সে কৃষকই বলুন, সরকারি কর্মচারীই বলুন, সৈন্যই বলুন আর ছেলেমেয়েই বলুন,—ছবি আঁকতে ভালোবাসে। আবার, রং তুলি দিয়ে আঁকাই শুধু নয়। নানাভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে চায় তারা, নানা মাধ্যমে। এই যেমন ধরুন, জামা-কাপড়ে নকসা তোলা ছুঁচ সুতো দিয়ে, প্রিন্ট ছাপানো। তাছাড়া হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, ঝড়তি পড়তি জিনিষ দিয়েও সুন্দর সুন্দর কাজ করছে লোকে। আমরা গরিব। তেলরং, তুলি, ক্যানভাস কেনার টাকা আমাদের নেই। কিন্তু তাই বলে তো আর মানুষের শিল্পকর্ম থেমে থাকতে পারেনা। তাই এটা ওটা, ভাঙাচোরা টুকরো, একটু কাগজ, একফালি রঙীন কাপড়, কয়েকটা দড়ি, একটুখানি রং—এইসব দিয়ে লোকে তৈরী করে মনের মতো কোনো জিনিষ। নিকারাগুয়ার সাধারণ মানুষ হাতের কাছে পাওয়া বা খুঁজে পেতে জোগাড় করা এটা ওটা দিয়ে স্রেফ মনের আনন্দে

নানান সুন্দর জিনিষ তৈরী করে। আমার দায়িত্ব হলো সেই শিল্পকর্ম সংগঠিত করা।

প্রশ্ন : বিপ্লবের আগে নিকারাগুয়ার শিল্প, ললিতকলার অবস্থা কিরকম ছিল?

মারিয়া : সে-আমলে ছিলেন শুধু মুষ্টিমেয় কিছু পেশাদার শিল্পী। আর্টকলেজে ঢুকতে পারতেন অতি অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান। জনজীবনে শিল্পের কোনো ভূমিকাই ছিলনা। কিন্তু বিপ্লবের পর জনগণের মনে দেখা দিল প্রবল স্ফূর্তি, আবেগ। লোকে তখন চাইলো নানান মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করতে। তাছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মধ্যে সম্ভাবনার বীজ ছিল, তা থেকে অংকুর বেরোনোর কোনো রাস্তা ছিলনা বিপ্লবের আগে। বিপ্লবের পর সেই রাস্তা তৈরী হতে লাগলো।

প্রশ্ন: আত্মপ্রকাশের, মনের কথাটা শিল্পমাধ্যমে জানিয়ে দেবার তাগিদ কাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এখন সবচেয়ে বেশী?

মারিয়া : ছেলেমেয়েদের মধ্যেই যেন বেশী দেখা যাচ্ছে। সৃষ্টির তাগিদ বড়দের মধ্যে যতোটা, কচিকাঁচাদের মধ্যে যেন তার চেয়ে বহুগুণ বেশী।

প্রশ্ন : এই রকম গণললিত কলাকেন্দ্র নিকারাগুয়ায় কটা আছে?

মারিয়া : অনেকগুলো। শুধু মানাগুয়াতেই রয়েছে চারটি। তাছাড়া সব শহরেই আছে,—লেয়ন, গ্রানাদা সর্বত্র। সাধারণ লোক ঐসব কেন্দ্রে যায়। কেউ ছবি আঁকে, কেউ গান গায়, বাজনা বাজায়, কেউবা নাচে। নাটকও আছে। তবে নাচের ব্যাপারে লোকের উৎসাহ অনেক বেশী।

আমরা করি কি, চারদিকে আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠিয়ে দিই। গ্রামে গ্রামে। ছবি আঁকার শিক্ষক, নাচগানের শিক্ষক। চেষ্টা করি স্থানীয় শিক্ষক জোগাড় করতে। তেমন ধরুন গ্রানাদায় যিনি আঁকা শেখান, তিনি গ্রানাদারই লোক। তাঁর কাজ হলো গ্রানাদার নানা এলাকায় ঘোরা। কে কোথায় কী আঁকছে, দেখা। উৎসাহ দেওয়া। দেখিয়ে দেওয়া কী করলে আরো ভালো হবে। তবে আমরা আমাদের মাপকাঠিগুলো, আমাদের পছন্দ অপছন্দগুলো লোকের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইনা। কোনো কট্টর ইস্কুল তৈরী করা আমাদের কাজ নয়। ধরুন, গাঁয়ের এক চাষী ছবি আঁকছেন। আমি তাঁকে স্রেফ নিজের মতো আঁকতে দেবো। মনের আনন্দে। আমাকে খুশী করার কোনো দায় তাঁর নেই। তাঁর কাজ হলো ছবির মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করা, নিজের খেয়ালে ছবি আঁকা। লোকে নিজেদের প্রকাশ করুক, মনের সুখে ছবি আঁকুক, গান করুক, নাচুক। কেউ যদি এসে বলে, এই ব্যাপারটা আমি আরো ভালো বুঝতে চাই, জানতে চাই তো সেই জানার সুযোগ আমরা দেবো। পড়াশুনো করতে বলবো। কিন্তু সে যদি তা না চায়, তো তার ঘাড়ে আমরা কিছুই চাপিয়ে দেবোনা।—এই হলো আমাদের নীতি।

প্রশ্ন : শিল্পীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে আপনার কী মত?

মারিয়া ঃ দেখুন শিল্পকে আমরা সমাজ ও রাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখিনা। আমরা মনে করিনা যে "শিল্প" একটা বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি। না। দেখুন না, আমি যখন ছাত্রী ছিলাম, তখন ইউরোপের শিল্পীদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হতো। এমনই ছিল আমাদের শিল্পশিক্ষা। ইউরোপের শিল্পীদের কাজ, তাঁদের ঠিকুজিকুষ্ঠি ঘাঁটতে ঘাঁটতে, তাঁদের ইতিহাস চর্চা করতে করতে দিন কেটে গিয়েছে তখন,—ছাত্রজীবনে। নিজের দেশের শিল্পীদের নিয়ে আমরা তখন ভাবতে শিখিনি। তাঁদের কথা চিন্তা করিনি। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের স্বকীয়তা, নিজস্বতা, আপন ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হয়েছি। ফিরে এসেছি আমরা নিজেদের কাছে। বিপ্লবের আগে আমরা আমাদের অতীতকে অবহেলা করেছি। যেমন ধরুন, কলোম্বাস আসার আগে এ-দেশে যে শিল্প ছিল, সেইসব অসাধারণ কাজ হয়েছে উপেক্ষিত, পদদলিত। বিপ্লবের পর আমরা সেই অতীত সম্পদগুলোকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি। মানুষ যতোভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, সবই আজ আমাদের কাছে জরুরী। কারণ এই প্রকাশের মধ্যেই রয়েছে আমাদের আপন বৈশিষ্ট্য, আমাদের ইতিহাস, সমাজ, ভাবনাচিন্তা, বর্তমান, ভবিষ্যত,—রাজনীতি। তাই রাজনীতি ও সমাজ থেকে শিল্প কখনোই বিচ্ছিন্ন নয়।

আজও আমরা লড়াই করছি। লড়াই করতে হচ্ছে। ফ্রণ্টে আমাদের ছেলেমেয়েরা যুদ্ধ করছে আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে। আমরা, শিল্পীরা, মাঝেমাঝেই চলে যাই ফ্রণ্টে। তাদের আমরা বলি ঃ তোমরা আর আমরা আলাদা নই। বিচ্ছিন্ন নই। আমরা এক। এসো, আমাদের সংগে ছবি আঁকো, গান গাও, নাচো। আমাদের সৈন্যরা, যোদ্ধারা যোগ দেয় আমাদের সংগে। আমরা ভিড়ে যাই তাদের দলে। এই শিল্পীদলকে বলা হয় 'শিল্পী ব্রিগেড'।

প্রশ্ন ঃ কবে তৈরী হয়েছে এটা?

মারিয়া ঃ বছর তিনেক আগে। আমাদের মনে হয়েছিল ঃ আমাদেরই ছেলেমেয়েরা লড়াই করছে ফ্রণ্টে। আমরা তাহলে এখানে বসে দিন কাটাচ্ছি কিসের জন্য? আমাদেরও উচিত ফ্রণ্টে যাওয়া।

প্রশ্ন ঃ শিল্পীরা কি লড়াইও করেন?

মারিয়া ঃ আমরা ট্রেনিং নিয়েছি ও নিচ্ছি। কিভাবে বন্দুক চালাতে হয় আমরা জানি। তবে আমাদের লড়াই করতে হয়না।

প্রশ্ন ঃ আপনি নিশ্চয়ই ফ্রণ্টে গেছেন?

মারিয়া ঃ নিশ্চয়ই। প্রথমে ভীষণ ভয় করতো। কিন্তু কদিন পরেই ভয় চলে যায়। সৈন্যদের সংগে কথা বললেই আর ভয় করে না।

প্রশ্ন ঃ শেষ কবে গিয়েছিলেন?

মারিয়া ঃ ছ'মাস আগে। দু'সপ্তাহ ছিলাম।

চোদ্দোই মে

সকালে গেলাম সংসদভবনে। আজ জাতীয় সংসদের পূর্ণ অধিবেশন।

রাষ্ট্রপতি কমান্দান্তে দানিয়েল অর্তেগা কদিন আগেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিম ইউরোপ সফরে গিয়েছেন। কাজেই উপরাষ্ট্রপতি সের্‌হিয়ো রামিরেস এখন রাষ্ট্রপতির কাজ চালাচ্ছেন। অধিবেশনে তিনি হাজির।

সংসদের সভাপতি কমান্দান্তে কার্লোস নুনিয়েস—ডাকসাইটে গেরিলা যোদ্ধা ও কমাণ্ডার।

দশটায় অধিবেশন শুরু হবার কথা। সাংবাদিকদের সারিতে আসন নিয়েছি সকাল সাড়ে ন'টায়। আগে আগে পৌঁছোনোয় একেবারে সামনের সারিতেই আসন পেয়ে গিয়েছি। আমার ডান দিকে বসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্‌সাস থেকে আসা এক তরুণ মার্কিনী সাংবাদিক। সংসদের পূর্ণ অধিবেশন দেখতে তিনি চলে এসেছেন। বাঁদিকে বসেছেন কিউবার হাবানা থেকে আসা আর এক তরুণ সংবাদদাতা। পেছনে বিস্তর ক্যামেরার বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন টাইম ও নিউজউইকের ফোটোগ্রাফাররা। ওপাশে রয়েছেন ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফাররা। সাংবাদিকদের স্ট্যাণ্ডে তিল ধারণের জায়গা নেই, কারণ, মার্কিন সরকার নিকারাগুয়ার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চাপানোর পর আজই সংসদের প্রথম পূর্ণ অধিবেশন। অর্থাৎ সান্‌দিনিস্তা সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আজই প্রথম সংসদে অর্থনৈতিক অবরোধ সম্পর্কে ভাষণ দেবেন এবং বিষয়টি নিয়ে প্রথম সংসদীয় বিতর্ক হবে সরকার বিরোধী দলগুলোর সংগে।

১৯৮৪ সালের চৌঠা নভেম্বর নিকারাগুয়ায় নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। বস্তুতপক্ষে সেটাই নিকারাগুয়ার ইতিহাসে প্রথম অবাধ নির্বাচন। ১৮৩৮ থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিকারাগুয়ার 'নাগরিক' ছিলেন কেবলমাত্র ভূস্বামীরা ও বিশেষ পরিমাণ পুঁজির মালিকরা। ফলে সে যুগে কেবল এঁদেরই ভোট দেবার অধিকার ছিল, অন্যদের সে অধিকার ছিলনা। যেমন, ১৮৭৫-এর নির্বাচনে মোট ৩৭৩,৩৮৩ জন নিকারাগুয়ানের মধ্যে মাত্র ৫৭০ জন ভোট দিয়েছিলেন।

১৯০৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত নিকারাগুয়া ছিল মার্কিন মেরিন সেনাবাহিনীর দখলে। ফলে সে-সময়ে মার্কিন সরকারের প্রতিনিধিরাই নিকারাগুয়ার নির্বাচন আইন তৈরী করে নিয়েছিলেন নিজেদের সুবিধে অনুসারে।

১৯০৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত নিকারাগুয়ার নির্বাচন শুধু যে মার্কিনী প্রতিনিধিদের মেজাজ-মর্জি অনুসারে এবং তাঁদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাই নয়, সে-সময়ে ভোটগোণার দায়িত্বটাও ছিল মার্কিনী মেরিন সৈন্যদের হাতে।

তারপর তো মার্কিন মেরিনবাহিনী আনাস্তাসিয়ো সোমোসা গার্সিয়াকে নিকারাগুয়ার ন্যাশনাল গার্ডের সর্বাধিনায়ক পদে বসিয়ে দেশে চলে গেল। আর সোমোসা অনতিবিলম্বে দেশের রাষ্ট্রপতির আসনটা বাগিয়ে নিয়ে ডিক্‌টেটর হয়ে গেলেন। মার্কিন সরকারের সাহায্য সমর্থন পুষ্ট ৪৫ বছর ব্যাপী সোমোসা জমানায় ভোট নামে যে প্রহসন হতো তার ইতিবৃত্ত এতোই হাস্যকর যে সে-প্রসংগে যাওয়া মানে সময়ের অপচয়।

নিকারাগুয়ার নির্বাচন ব্যবস্থার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে পাঠকরা অন্তত এটুকু বুঝে নিতে পারবেন যে ১৯৭৯ সালে সোমোসাশাহীর পতনের মুহূর্ত পর্যন্ত নিকারাগুয়ায় আর যাইই থাক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের নামগন্ধও ছিলনা। এই ঐতিহ্যটাই ছিল অনুপস্থিত।

ক্ষমতা দখলের পর বিপ্লবীরা নিকারাগুয়ায় জাতীয় পুনর্গঠন সরকার খাড়া করলেন। নানান সংস্কারমূলক কাজকর্ম ও গণমুখী বিপ্লবিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষকে তাঁদের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্বন্ধে সজাগ ও অবহিত করার প্রক্রিয়া শুরু হলো।

এদিকে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সি, আই, এ (মার্কিনী কবি ফেরলিংগেটি যাকে "that international terrorist organization" বলেছেন) প্রাক্তন ন্যাশনাল গার্ড, সোমোসাপন্থী আর ভাড়াটে সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র, টাকা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে জোটবদ্ধ করেছেন এবং সমানে আক্রমণ চালাচ্ছেন নিকারাগুয়ার ওপর। অপরদিকে মার্কিন সরকার বলে চলেছেন যে নিকারাগুয়ার সান্দিনিস্তারা "মার্কসবাদী-লেনিনবাদী একনায়কতন্ত্রী", কারণ তাঁরা নির্বাচন অনুষ্ঠান করাচ্ছেন না।

মনে রাখা দরকার যে তথাকথিত আমেরিকান বিপ্লবের বছর সাতেক পর তবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন হয়েছিল। এবং সেই গণতান্ত্রিক নির্বাচনেও কৃষ্ণাংগ ক্রীতদাসরা ও সর্ববর্ণের মহিলারা অংশ নিতে পারেননি। শুধু তাই নয়, ভোট দেবার অধিকার নির্ধারিত ছিল সম্পত্তির ভিত্তিতে।

সান্দিনিস্তা বিপ্লবীরা ১৯৭৯ সালে ক্ষমতা দখলের পর, ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করেন যে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে দেশে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ নির্বাচন।

জনগণ যাতে ব্যাপকভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন সেজন্য সান্দিনিস্তারা, সরকারের বিরুদ্ধে যাঁরা অস্ত্রধারণ করেছিলেন এমনকি তাঁদেরও সাধারণ ক্ষমার আওতায় মুক্তি দেন ১৯৮৩ সালের চৌঠা ডিসেম্বর। নির্বাচনী

প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় যথাসময়ে, অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে—নির্বাচনী আইন বিষয়ে রাষ্ট্রীয় পরিষদে ব্যাপক বিতর্কের মধ্য দিয়ে। পনেরোই মার্চ নির্বাচনী আইন অনুমোদিত হয়। এবং তার কিছুদিন আগেই ঘোষণা করা হয় যে ১৯৮৪ সালের চৌঠা নভেম্বর নির্বাচন হবে।

নিকারাগুয়ার প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হলো। তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন ঃ পপুলার সোশ্যাল খৃশ্চান পার্টি, মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট পপুলার অ্যাকশন মুভমেণ্ট, কনসার্ভেটিভ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ নিকারাগুয়া, সান্দিনিস্তা জাতীয় মুক্তিফ্রণ্ট, কমিউনিস্ট পার্টি অফ নিকারাগুয়া, ইন্‌ডিপেন্‌ডেণ্ট লিবেরাল পার্টি, সোশ্যালিস্ট পার্টি অফ নিকারাগুয়া।

সান্দিনিস্তা জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্টের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দানিয়েল আর্তেগা সাভেদ্রা ও উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সের্‌হিয়ো রামিরেস ভোটে জিতলেন।

* * *

সংসদভবনে সের্‌হিয়ো রামিরেসকে দেখছি। ভাষণ দিতে উঠছেন। ক্ষমতা দখলের পর থেকে রাষ্ট্রপতি-উপরাষ্ট্রপতি ও বিধান পরিষদ নির্বাচন পর্যন্ত যে হুন্‌তা দেশে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন, রামিরেস ছিলেন তার অসামরিক সদস্য। ইনি এক স্বনামধন্য ইতিহাসবেত্তা ও ঔপন্যাসিক। নিকারাগুয়ার নেতাদের মধ্যে যাঁরা ভাবুক ও ইনটেলেক্‌চুয়াল, সের্‌হিয়ো রামিরেস তাঁদের অন্যতম। সৌম্যকান্তি, শান্ত রামিরেস মার্কিনী সামরিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন ও নিকারাগুয়ায় তার পরিণাম বিষয়ে ভাষণ দিচ্ছেন। বিষয়টা বেশ নাটকীয় হলেও তাঁর ভাষণে আবেগের বাড়াবাড়ি নেই। অতি সংযত ভঙ্গিতে, বাগাড়ম্বরের দিকে না গিয়ে তিনি একের পর এক তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে চলেছেন। কথায় বা হাবেভাবে জংগীভাবের লেশমাত্র নেই।

মঞ্চে যাঁরা আসীন, তাঁদের সকলের ব্যক্তিত্বকে যেন ছাপিয়ে উঠছে কার্লোস নুনিয়েসের ব্যক্তিত্ব। আর সকলের মতো তিনিও নীরব শ্রোতা। কিন্তু তাঁর চোখদুটো যেন সারা সংসদভবনে ছুটে বেড়াচ্ছে চিতাবাঘের মতো। চোখেমুখে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির ছাপ। তরুণ, সুদর্শন কার্লোস নুনিয়েসকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি এখনো গেরিলাযোদ্ধা, প্রতি মুহূর্তে তিনি অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। সের্‌হিয়োকে দেখে মনে হয় না তিনি বিপ্লবী। কিন্তু কার্লোসকে দেখেই মনে হয়, এ লোক বিপ্লবী না হয়ে যায় না। এবং বাস্তবিকই তিনি এক তুখোড় গেরিলাযোদ্ধা, কমাণ্ডার। তাঁর আর একটি পরিচয় ঃ তিনি নিকারাগুয়ার এক অন্যতম আগুয়ান কবি।

কমান্দান্তে কার্লোস নুনিয়েসের পাশেই বসে রয়েছেন ডাকসাইটে সরকার-বিরোধী রাজনীতিক ক্লেমেন্তে গুইদো। নির্বাচনে ইনি ছিলেন কন্‌সার্ভেটিভ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী। এবং সান্দিনিস্তা প্রার্থী কমান্দান্তে দানিয়েল অর্তেগার কাছে তিনি হেরে যান মাত্র অল্পকিছু ভোটের ব্যবধানে।

ভাষণ শেষ। বিতর্ক শুরু হয়েছে। সরকারবিরোধী দলগুলোর প্রতিনিধিরা বেশ জোরেই বক্তব্য রাখছেন। বিরোধীদের সংসদীয় নেতা ক্লেমেন্তে গুইদো উপরাষ্ট্রপতি সের্‌হিয়ো আর সভাপতি কার্লোস—এই দুই সান্‌দিনিস্তার পাশে বসেই সান্‌দিনিস্তাদের তীব্র সমালোচনা করে চলেছেন। কোনো কোনো বিরোধী সদস্য সান্‌দিনিস্তাদের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ঠাট্টাবিদ্রূপ করতেও ছাড়ছেন না। বিরোধীদের তরফে অতি তীক্ষ্ণ, সমালোচনাপূর্ণ মন্তব্য শোনার পরেও সরকারসমর্থক সদস্যরা অধৈর্য হচ্ছেন না। বিতর্ক চলছে জোরালো ভাষায়, কিন্তু তিক্ততা নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বিতর্ক শুনছি আর সকলের হাবভাব লক্ষ্য করে যাচ্ছিঃ প্রত্যেক বক্তাই আবেগ নয়, বরং যুক্তিরই শরণার্থী।—নিকারাগুয়ার সর্বত্র যে শৃঙ্খলা ও সংযত ভাব দেখতে পেয়েছি, সংসদের অধিবেশনেও তা পুরোমাত্রায় উপস্থিত।

বিরোধীদের অসংখ্য প্রশ্ন, সমালোচনা ও বিদ্রূপের জবাব উপরাষ্ট্রপতি সের্‌হিয়ো রামিরেসই দিচ্ছেন সরকারের তরফে,—শান্তভাবে। তিনি যে শব্দের কারিগর, তাঁর চোস্ত উত্তরে সেটার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে থেকে থেকেই।

* * *

বিকেলে কার্লা ও লুইসা এসে হাজির। আবার মাসায়া যেতে হবে। আজ মাসায়ার কারিগরদের কাজকর্ম দেখতে যাবার কথা।

সোমোসার আমলে স্থানীয় শিল্পী কারিগর পটুয়ারা কোনো দিক দিয়েই হালে পানি পেতেন না। দীর্ঘকালের অবহেলা, অনাদরে অনেক মূল্যবান হাতের কাজ প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। অনেক কারিগর বাধ্য হয়েছিলেন অন্য কোনো কাজ খুঁজতে ও নিতে।

বিপ্লবের পর সান্‌দিনিস্তারা মন দিয়েছেন ঐসব সনাতন হস্তশিল্প, কুটীর-শিল্প ও শিল্পীদের দিকে। বাঁচিয়ে তুলেছেন তাঁরা কারিগরদের, তাঁদের শিল্পগুলোকে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও টাকায় গড়ে উঠেছে একটা বেশ বড় কেন্দ্র।

বিশাল জায়গা জুড়ে অসংখ্য ও বিচিত্র কুটীরশিল্পের সম্ভার। প্রাচীন রেড ইণ্ডিয়ানদের শিল্পের অনুকরণেও কিছু কাজ করেছেন এ-যুগের গ্রামীন কারিগররা। পাথর কুঁদে তৈরী করা বিভিন্ন ধরণের ম্যাডোনা মূর্তি, চটের কাজ, সূক্ষ্ম কাঠের কাজ, কাঠের খেলনা, চামড়ার জিনিষ, কাপড়ে তোলা বিচিত্র নক্‌সা, কারুকাজ করা মাটির পাত্র, পুতুল, 'সোলেন্‌তিনামে' শৈলীর ছবি, নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্র যেমন 'মারিম্বা', বাংলার আনন্দলহরী গোছের একটা বাজনা, ঢোলক—সবই খাঁটি নিকারাগুয়ার জিনিষ। সব কিছুই হারিয়ে যেতে বসেছিল। বিপ্লব এগুলোকে এদের স্রষ্টাসমেত উদ্ধার করেছে।

কাছেই কারখানা। সুন্দর বাড়িটা। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। গোটা বাড়িটাই যেন কাঠের তৈরী। প্রতিটি থামে সূক্ষ্ম খোদাই-এর কাজ, নক্সা আঁকা।

কারখানার ঘরে ঘরে নানান কাজ চলছে। একটি ঘরে শুধু মেয়েরা কাজ করছেন। যন্ত্রপাতিও রয়েছে আবার হাতও চলছে। একজন কম্‌পানিয়েরো আমায় বাইরে বললেন যে বিপ্লবের আগে এই মহিলা কর্মীদের অনেকেই গণিকা ছিলেন। বিপ্লবের পর তাঁরা এই নতুন কাজ শিখতে পেরেছেন এবং কাজ করছেন সসম্মানে।

এখানকার কাজের মালমশলা সব সরকারই দেন—সংস্কৃতি মন্ত্রক মারফৎ। শ্রমিকদের কিছুই ভাবতে হয়না। তাঁদের কেউ কেউ মাইনে-করা সরকারী কর্মী। অনেকেই আবার সমবায় করেছেন এবং সরকারের কাজ থেকে কাঁচামাল পাবার পর তাঁরা স্বাধীনভাবে পণ্য তৈরী ও বিক্রী করেন। দালালের উৎপাত নেই। কারণ তাঁদের অধিকাংশ 'কাজ' সরকারই সরাসরি কিনে নেন। এখানকার অনেক জিনিষই বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

আজ যাঁরা এখানে শ্রমিক, তাঁদের, প্রায় সকলেরই বাবামা বা পূর্বপুরুষ কারিগর, পটুয়া এইসব ছিলেন। বিশেষ বিশেষ কিছু শিল্প ও কারিগরিবিদ্যা পারিবারিক সূত্রে এঁদের অনেকেরই মোটামুটি জানা ছিল। কিন্তু বিপ্লবের আগে সেই বিদ্যে বেচে গ্রাসাচ্ছাদন করার কোনো উপায়ই বলতে গেলে ছিলনা। বিপ্লবের পর নিকারাগুয়ার গ্রাম অঞ্চলের শিল্পী কারিগররা শুধু যে সেই সুযোগ পেয়েছেন তাই নয়, নতুন নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে সনাতন কারিগরি বিদ্যাগুলোকে যুগোপযোগী করে তোলা, আরো উন্নত করে তোলার সুযোগও তাঁরা পাচ্ছেন।

পনেরোই মে

গন্তব্য : স্বাস্থ্য দপ্তর।

বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের বাড়িগুলো ছড়ানো। প্রায় সবকটা বাড়িই একতলা। এবং নতুন। আশপাশে আরো নতুন বাড়ি উঠছে। জনস্বাস্থ্য ও জনশিক্ষা—এই দুটি বিষয় সম্পর্কে বিপ্লবী নিকারাগুয়া সবচেয়ে সজাগ।

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে—গোটা এলাকাটা একেবারে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। কোথাও একটু আবর্জনা বা ময়লা নেই।

মন্ত্রণালয়ের চত্বরে ঢোকার সংগে সংগে শুনতে পাচ্ছি একাধিক স্পিকারে ভেসে আসা রাজনৈতিক গান, উদ্দীপক গান, শান্তির গান। গানগুলো খুব আস্তেও বাজছেনা আবার এতো জোরেও না যে চত্বরের বাইরে থেকে শোনা যাবে।

মাঝেমাঝে, গানের ফাঁকে ফাঁকে চলছে বৈপ্লবিক আহবান, অতি স্বল্প দৈর্ঘের ভাষণ।

স্পিকারগুলো নানা জায়গায় ছড়ানো,—বেশ সুপরিকল্পিতভাবেই রাখা। গানগুলো সবই স্প্যানিশ ভাষায়।

কোনো কোনো দেওয়ালে আগ্রাসনবিরোধী শ্লোগান লেখা, সান্‌দিনোর বাণী লেখা। এক জায়গায় চে গেভারার একটি উক্তিও চোখে পড়লো। কিন্তু কোনোটাই দেওয়ালে রং দিয়ে লেখা নয়। এগুলো লেখা হয়েছে কাগজের ওপর। আর সেই কাগজগুলো আল্‌তো করে লাগানো রয়েছে দেওয়ালে।—অসংখ্য ঘর। প্রায় প্রতিটি ঘরের দরজায় কোনো-না-কোনো বৈপ্লবিক বাণী, দেশাত্মবোধক উক্তি কাগজে লিখে বোর্ডপিন্‌ দিয়ে আটকানো, কয়েকটা স্কচ্‌ টেপ দিয়ে লাগানো। মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অনেক কিছুই লেখা রয়েছে।

বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা ঘরে আলোচনা-সভা চলছে। কেউ কেউ ভাষণ দিচ্ছেন। আলোচনা ও ভাষণের বিষয় : নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে বিদেশীদের, বিশেষ করে মার্কিন সরকারের সামরিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন এবং তার ফলাফল।

চারিদিকে বেশ সাজ সাজ রব। অনেকেই আশংকা করছেন, মার্কিন

সরকার হয়তো যে-কোনো মুহূর্তে মেরিন বাহিনীর সাহায্যে সরাসরি আক্রমণ করবেন নিকারাগুয়াকে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারীরা, স্বাস্থ্য কর্মীরা তার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কারণ, প্রথমত, প্রত্যক্ষ ব্যাপক আক্রমণ ও লড়াই শুরু হলে তাঁদের অসম্ভব তৎপর হতে হবে—আহতদের সেবা শুশ্রূষার জন্য। দ্বিতীয়ত, যে সামরিক আগ্রাসন এমনিতেই চলেছে এবং মার্কিন সরকার সম্প্রতি যে অর্থনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন তার চোট স্বাস্থ্য দপ্তরের ওপর, নিকারাগুয়ার জন-স্বাস্থ্যের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পড়ছেই। অনেক ওষুধপত্র ও চিকিৎসার সরঞ্জাম নিকারাগুয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করছিল এতোদিন। এখন তো সবই বন্ধ হয়ে গেল।

নিকারাগুয়া যে আগ্রাসন প্রতিহত করা ও আগ্রাসনের চোট সামলানোর জন্য কতোটা তৎপর, কিভাবে যে নিকারাগুয়ার বিপ্লবী জনগণ সার্বিক প্রস্তুতি নিচ্ছেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি এই স্বাস্থ্য দপ্তরে। এতোগুলো শহর ও গ্রাম ঘুরে কোথাও কোনো সামরিক কুচকাওয়াজ বা জংগী তোড়জোড় দেখতে পাইনি। আজ এই স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি বিপ্লবের রক্ষীদের। দপ্তরের কর্মী, চেয়ার টেবিলে বসে যাঁরা ফাইলপত্র ঘাঁটছেন, লিখছেন, শুভ্র এপ্রন পরা স্বাস্থ্যকর্মী, কী পুরুষ কী নারী, কী প্রৌঢ়া, কী তরুণ—সকলেই যেন সৈনিক, নিকারাগুয়ার স্বাধীনতার, বিপ্লবের অতন্দ্র প্রহরী। স্পিকারে বাজা গানের ভাষায়, দেওয়ালে দরজায় লেখা অসংখ্য বাণীতে, সহ-কর্মীদের সমাবেশে দেওয়া ভাষণে, দপ্তরের প্রতিটি ঘরে, প্রত্যেকের মুখের কথায়, চোখমুখের ভাবে একটা কথাই বৈপ্লবিক ঐক্যে প্রকাশ পাচ্ছে সমানেঃ "বিপ্লবের শত্রুরা আমাদের ওপর যতো আঘাতই হানুক, যতো আক্রমণই হোক, যতো দুঃখকষ্টই আসুক-না-কেনো, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেন অটুট থাকে। এই গরীব বিপ্লবী দেশের প্রতিটি মানুষ যেন অসুখ হলে ওষুধ পায়, ডাক্তার পায়, জনস্বাস্থ্য রক্ষার যে বৈপ্লবিক সংকল্প আমাদের রয়েছে তা যেন আমরা প্রতিনিয়ত পালন করি।"

বেশ কয়েকটা ঘর আর বারান্দা পেরিয়ে দেখা হলো 'প্রিভেন্‌টিভ মেডিসিন' বিভাগের মহাপরিচালক মিল্‌তন ভাল্‌দেস্‌-এর সংগে। বিপ্লবের আগে নিকারাগুয়ায় জনস্বাস্থ্যের অবস্থা কী ছিল, বিপ্লবের পর তা কী দাঁড়িয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে কম্‌পানিয়েরো ভাল্‌দেস্‌-এর কাছ থেকে কিছু তথ্য পেতে চাই। তিনি বললেনঃ

"বিপ্লবের আগে নিকারাগুয়ায় জনস্বাস্থ্য ছিল একেবারেই অবহেলিত। রোগ প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থাই ছিলনা। দক্ষ, পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মীর ছিল একান্তই অভাব। শহরে ভালো হাসপাতাল ছিল কয়েকটা মাত্র। আর গ্রামের দিকে হাসপাতালের বালাই ছিলনা। শহরের হাসপাতালেও চিকিৎসা ছিল বেশ ব্যয়সাপেক্ষ এক ব্যাপার। ডাক্তাররা মালদার রুগী খুঁজতেন। দেখা যেত,

হাসপাতালে গরীব রুগী এলে তাঁর কোনো পরিচর্যা হচ্ছে না। চিকিৎসা হচ্ছে শুধু বড়লোকদের। ডাক্তাররা হাসপাতালের ভেতরেই জমজমাট প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করতেন। যাচ্ছেতাই রকম বৈষম্য ছিল তাঁদের আচরণে।

"বিপ্লবের পর—'স্বাস্থ্য' এখন জনগণের মৌল অধিকার। এ-ব্যাপারে সরকার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন। চিকিৎসার জন্য এ-দেশের জনগণকে আজ আর খরচ করতে হয় না। সবটাই বিনামূল্যে।

"প্রথম থেকেই বিপ্লবী সরকার চেষ্টা করেছেন জনস্বাস্থ্য রক্ষার এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থায় জনগণকে সামিল করতে। তাঁদের মতামত নেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত আলোচনা সভা বসে। গোটা নিকারাগুয়া আজ বিভিন্ন ছোট ছোট এলাকায় বিভক্ত। প্রত্যেক এলাকায় একটা স্বাস্থ্য দপ্তর রয়েছে। সেই এলাকার বাসিন্দাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় ঐ দপ্তরে জমায়েত হয়ে তাঁদের সুবিধে অসুবিধের কথা জানাতে।

"গোটা দেশে আজ বাইশ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী। এঁরা মাইনে করা। এ ছাড়াও পঁচিশ হাজার 'ব্রিগাদিস্তা দে সালুদ' বা স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মী আছেন। ১৯৮১ সালে ম্যালেরিয়া নির্মূল করার জন্য একটা অভিযান চালানো হয়েছিল। তাতে সোত্তর হাজার স্বেচ্ছাসেবী অংশ নিয়েছিলেন।

"দেশের উত্তরে আজ যে লড়াই চলছে আগ্রাসী ও প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে, জনস্বাস্থ্য ব্যাহত হচ্ছে তার জন্য। কারণ সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নানান রোগ নিয়ে ফিরে আসছেন শান্তি এলাকায়। এসব রোগ এই এলাকাগুলোয় আগে ছিল না। যুদ্ধ এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মী পাঠানো মুশকিল। সৈন্যরাই সেখানে কাজ করছেন স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে।

"রেগানের বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার চোটে এ-দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেশ অসুবিধেয় পড়েছে। নিকারাগুয়ায় যতো ওষুধপত্র দরকার তার ২০% এ-দেশে তৈরী হয়।' কিন্তু ৪০% কেনা হচ্ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। চিকিৎসার অনেক জরুরী যন্ত্রপাতি আর সাজসরঞ্জামও কেনা হতো যুক্তরাষ্ট্রে। নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হবার পর সেসব আর আসছেনা। এ এক বিরাট সমস্যা।

ষোলোই মে

বিপ্লবের পর নিকারাগুয়ায় যেসব হাসপাতাল তৈরী হয়েছে তার অন্তত একটা দেখার ইচ্ছে ছিল, বিশেষত কোনো শিশু হাসপাতাল। তাই সকালের দিকে হাজির হলাম মানাগুয়ার এক শিশু হাসপাতালে। এখানে আসার আর একটা বড় কারণ, এই হাসপাতালের পরিচালক ডাক্তার ফেরনান্দো সিল্‌ভা এক খ্যাতিমান কবি ও লেখক।

বিরাটাকার এই নতুন হাসপাতালটা বাইরে থেকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছি। কোথাও একরত্তি ময়লা নেই। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। বাইরে সুন্দর বাগান করা হচ্ছে। বাইরেটা যেমন ভেতরটাও তেমন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মনে হয় তৃতীয় বিশ্ব নয়, প্রথম বিশ্বের কোনো নামজাদা নার্সিং হোমে ঢুকেছি।

ডাক্তার ফেরনান্দো সিল্‌ভার ঘরে ঢুকেই দেখি কয়েকজন ডাক্তার ও সেবিকার সংগে তিনি হাসপাতাল সম্পর্কে জরুরী আলোচনা করছেন। "আদেলান্তে কম্‌পানিয়েরো" (আসুন, আসুন কমরেড) এই বলে একগাল হেসে স্বাগত জানিয়েই ডাক্তার ফেরনান্দো সিল্‌ভা আবার আলোচনায় মন দিলেন। —সকলেরই গায়ে ধব্‌ধবে, পরিষ্কার এপ্রন।

ফেরনান্দোর টেবিলের সামনে একটা আসন নিয়ে টেবিলটা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছি: রাশিরাশি ওষুধের শিশি। কিছু ফাইল। আর তারই মধ্যে মাথা তুলে রয়েছে সোভিয়েত সাহিত্য সম্পর্কে একটি বই। আরো একটি বই রয়েছে। সেটির লেখক আর্জেনটিনার হহে লুইস বর্হেস।

সহকর্মীদের সংগে আলোচনা চুকিয়ে ফেরনান্দো এলেন আমার সংগে কথা বলতে। তাঁর বয়েস হয়েছে। কিন্তু চোখেমুখে বা দেহে কোথাও ক্লান্তির ছাপ নেই। বললেন:

"বিপ্লবের আগে এ-দেশে 'স্বাস্থ্য' বলতে কিছুই ছিলনা। স্বাস্থ্য বিভাগ এক-খানা ছিল বটে নাম-কা-বাস্তে। আর ছিল কিছু আল্‌গা চটক—যেন চিকিৎসা চলছে। আসলে 'চিকিৎসা' ছিল একটা পণ্য। যার অনেক টাকা ছিল, একমাত্র সে-ই কিনতে পারতো এই পণ্যটা। যার কিছু ছিলনা সে মরতো বিনা চিকিৎসায়। বিপ্লবের পর 'স্বাস্থ্য' এখন সকলের ব্যাপার। সকলেরই আজ 'চিকিৎসায়' অধিকার। এবং চিকিৎসার জন্য নানান স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর হাসপাতাল রয়েছে। ছোটখাটো অসুখে লোকে যায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ব্যারাম যদি কড়া হয় তো রুগীকে পাঠানো হয় হাসপাতালে।

"চিকিৎসা চলে বিলকুল নিখরচায়। হাসপাতালে থাকাখাওয়া, জামা-কাপড়, চিকিৎসা, অপারেশন, ওষুধ—কোনোটার জন্যই এ-দেশের মানুষকে আর পয়সা দিতে হয় না। এ-মুহূর্তে আগ্রাসন রুখতে সরকারি বাজেটের ৪০% থেকে ৬০% চলে যাচ্ছে। নয়তো চিকিৎসা খাতে আরো টাকা ঢালা যেতো।

"বিপ্লবের আগে শিশুদের জন্য কোনো আলাদা হাসপাতাল ছিলনা। বিপ্লবের তিন বছরের মধ্যেই এই বিরাট হাসপাতালটি তৈরী হয়েছে শিশু-দের জন্য। বিপ্লব শেষ হয়নি। তা চলছে। আর তারই সংগে পা মিলিয়ে এগোচ্ছে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি।"

ডাক্তার ফেরনান্দো সিল্‌ভাকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি তো লেখেনও। কবিতা, ছোটগল্প আর উপন্যাস। এতো বড় একটা হাসপাতালের পরি-চালকের কাজ করে লেখার সময় পান কখন?

ফেরনান্দো বললেন—"কেন? কাজের ফাঁকে ফাঁকে। এই দেখুননা, এই তো, এইখানেই একট পাণ্ডুলিপি রয়েছে। সুযোগ পেলেই লিখছি খানিকটা করে। তাছাড়া রাত্তিরে বাড়িতে বসেও লিখি। ঘুম থেকে উঠি ভোর ভোর। তখনো লিখি যতোটা সম্ভব।"

কবিতা, উপন্যাস আর ছোটগল্প মিলিয়ে সবশুদ্ধ ন'খানি বই বেরিয়েছে তাঁর। দুটো এখন যন্ত্রস্থ। চিকিৎসকদের আন্তর্জাতিক সভাগুলোতেও ফেরনান্দোর ডাক পড়ে, আবার লাতিন আমেরিকান সাহিত্যিকদের সম্মেলনও। নানা দেশের ডাক্তার, রোগবিশেষজ্ঞ, শল্যচিকিৎসক, এবং কবি, লেখক, শিল্পী ও বিপ্লবী—সকলেই নিকারাগুয়ায় এসে দেখা করে যান তার সংগে।

কথা শেষ হবার পর ফেরনান্দো আমায় সংগে নিয়ে বেরোলেন হাসপাতাল দেখাতে। যেখানেই যাচ্ছি, দেখছি সবকিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কর্মী, সেবক-সেবিকা ও ডাক্তাররা সকলেই ধব্‌ধবে পোষাক পরে। হাসিখুশী। আমায় দেখামাত্র স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন প্রত্যেকে।

অনেক বাবা-মা এসেছেন বাচ্চা কোলে। বাচ্চাদের কান্নাকাটি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। আউটডোরে সকলেই শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছে। এপ্রন পরা, স্টেথো গলায় তরুণ-তরুণীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁদের মধ্যে। রুগীর সংখ্যা যদি একশো হয়, তো ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা অন্তত তিরিশ। ডাক্তাররা শুধু যে ঘরে বসে আছেন তা নয়। তাঁদের অনেকেই চলে যাচ্ছেন অপেক্ষমান রুগীদের কাছে। অর্থাৎ রুগীদের সারিকেও পরীক্ষা চলছে সমানে। হাসপাতালের প্রবেশপথেও ডাক্তাররা চট্‌পট্‌ পরীক্ষা করে নিচ্ছেন বাচ্চাদের। ওরই মধ্যে প্রয়োজন মতো ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছেন সেবিকারা। ইনজেকশন চলছে। ডাক্তার ফেরনান্দো বললেন—"কতো লোক দূর দূর থেকে এসেছে হয়তো। এখানে এসে লাইনে দাঁড়াতে

দাঁড়াতে, অপেক্ষা করতে গিয়ে পাছে চিকিৎসার দেরী হয়ে যায়, পাছে কোনো শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে তাই ডাক্তাররাই চলে যান তাদের কাছে। প্রাথমিক পরীক্ষা ও শুশ্রূষা এই লাইনেই হয়ে যায়। তাতে রুগীর স্বাস্থ্য আর সময় দুটোই বাঁচে।"

আমার সংগে কথা বলতে বলতে আর হাঁটতে হাঁটতেই ডাক্তার ফেরনান্দো আদর করছেন বাচ্চাদের। সেই সংগে তরুণ-তরুণী ডাক্তার আর স্বাস্থ্যকর্মী-দের মাথায় হাত রাখছেন তিনি। তাঁর হাত চকিতে ছুঁয়ে যাচ্ছে কারুর মাথা, কারুর গাল, কারুর চিবুক, কারুর হাত। ওরই মধ্যে এক বৃদ্ধা স্বাস্থ্য-কর্মীকে আলিঙ্গন করলেন তিনি। আমি ছবি তুলতে যাচ্ছি, তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে সরে এসে বললেন—"করছেন কি! আমার ছবি না। এই বাচ্চাদের আর স্বাস্থ্যকর্মী ডাক্তারদের ছবি তুলুন। এরাই তো নিকারাগুয়ার বিপ্লব। এরাই তো বিপ্লবের ফুল, ফসল।"

যেসব শিশু তাদের মায়েদের ছেড়ে থাকতে পারে না তাদের সংগে মায়েরাও রয়েছেন কয়েকটা ঘরে। অথবা ঠাকুমা, দিদিমা। ওরকম একটি ঘরে ঢুকে দেখি ছোট একটি মেয়ে ধব্‌ধবে সাদা বিছানায় বসে, আর বোধহয় তার মা তাকে মৃদুস্বরে গান শোনাচ্ছেন। সুর শুনে মনে হলো বুঝিবা ছেলেভুলোনো-মেয়েভুলোনো গান বা ঘুমপাড়ানি। মেয়েটি হাসিহাসি মুখে শুনছে।

বিপ্লবের গান!

একটা অপূর্ব ব্যবস্থা দেখছি: 'বাংকো দে লেচে দে লাস্‌ মাদ্রেস্‌' (Banco de leche de las madres): মায়ের দুধের ভাঁড়ার।'

ডাক্তার ফেরনান্দো সিল্‌ভা বললেন: "সব মায়ের বুকে তো যথেষ্ট দুধ আসে না। কিন্তু শিশুরা যাতে মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত না হয় সে-জন্য এই ব্যবস্থা। দেশের মায়েরা তাঁদের বুকের বাড়তি দুধ দান করেন এই ভাঁড়ারে। যেসব শিশু তাদের আপন মায়ের দুধ পায়না, সে-বেচারিদের দুধ খাওয়ানো হয় এই ভাঁড়ার থেকে। আজ আমাদের দেশে এমন অনেক শিশু আছে যাদের মা একাধিক—জন্মদাত্রী আর দুধের মা। এই শিশুরা পুষ্ট হচ্ছে নিকারাগুয়ার মায়েদের স্তন্যে।" সম্রাট জাহাঙ্গীরের দুধ মা ছিল

বলতে বলতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ফেরনান্দো সিল্‌ভার মুখ।

আমি নিকারাগুয়ার বিপ্লব দেখছি। দেখছি একজন বিপ্লবীকে।

বিদায় নেবার সময়ে আর্জি জানালাম: 'আপনার মুখে আপনারই লেখা একটি কবিতা শুনতে চাই।' প্রৌঢ় ডাক্তার এক কথায় রাজি। বললেন—"দাঁড়ান, এমন একখানা কবিতা আপনাকে শোনাবো যেটা এক তরুণ মার্কিনী কবি ইংরিজীতে অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের একটা কপিও আপনাকে দিচ্ছি।

আপনার বুঝতে সুবিধে হবে হয়তো।"—প্রায় ছুটে ঘরে গিয়ে নিয়ে এলেন তিনি অনুবাদের কপি। এপ্রন পরা, স্টেথো হাতে ডাক্তার ফেরনান্দো সিল্‌ভা হাসপাতালের কম্‌পানিয়েরোদের সামনে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বলে গেলেন তাঁর কবিতা। স্প্যানিশ ভাষায়।

অনুবাদ :

There once was a good tree which
gave its shadow to anyone who
just wanted to sit and wait.
It was a large and sober tree
like a man who is listening to another one speak.

Always on the lookout for the changes of the wind and alert to the path of the sun. And such a tree he was that anyone could say from a distance—look at the tree.

Everything was right about him
Even in being a tree,
Which is a difficult thing for anyone to be.
But one day he died.
The same old story, as it happens to all beings.
He was hacked down, he was chopped up,
And afterward burned.
And the tree said nothing,
As those who felled him and burned him can testify.
No wonder, I said, since no one can
Know anything from a tree.

* * *

বেলা এগারোটায় 'লা প্রেন্‌সা' পত্রিকার আপিসে। 'লা প্রেন্‌সা' হলো নিকারাগুয়ার পয়লা নম্বর সরকার বিরোধী পত্রিকা। সান্‌দিনিস্তা সরকার সম্পর্কে গালমন্দ করার সময়ে মার্কিন সরকার ও একাধিক মার্কিনী পত্রিকা 'লা প্রেন্‌সার' খবরাখবর ও সম্পাদকীয়র উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন।

এই পত্রিকা এককালে সোমোসাশাহীর সমালোচনাও করতো। এবং 'লা প্রেন্‌সার' সম্পাদক পেদ্রো হোয়াকিন্ চামোর্‌রোকে খুন করেছিল সোমোসার ন্যাশনাল গার্ড। নিকারাগুয়ার ব্যবসায়ীদের যে অংশটা শেষ পর্যন্ত সোমোসার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল নিজেদের স্বার্থের কারণে, 'লা প্রেন্‌সা' বস্তুতপক্ষে তাদেরই প্রতিনিধি।

বর্তমানে এই পত্রিকা সান্‌দিনিস্তাদের ঘোর বিরোধী। এবং এই পত্রিকার সম্পাদক পাব্‌লো আন্‌তোনিয় কুয়াদ্রা সান্‌দিনিস্তা বিরোধীদের প্রথম সারিতে।

কুয়াদ্রা শুধু সাংবাদিক ও সংবাদভাষ্যকার নন। আধুনিক ও সমকালীন

লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের তিনি এক অন্যতম স্তম্ভ। এর্নেস্তো কার্দেনালের মতো তিনিও নিকারাগুয়া ও লাতিন আমেরিকার অগ্রণী কবিহিসেবে গণ্য।

'বিদেশী শক্তি ও দেশত্যাগী সোমোসাপন্থীদের সম্মিলিত আক্রমণ তুঙ্গে ওঠায় সান্দিনিস্তা সরকার কোণঠাসা হয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন নিকারাগুয়ায়।

পত্রপত্রিকার ওপর প্রথমে সেন্সর ব্যবস্থা চাপানো হয়নি। কিন্তু সরকার-বিরোধী ও বিপ্লববিরোধী পত্রপত্রিকা, বিশেষ করে 'লা প্রেন্‌সা' দেশের ঐ সংকটময় মুহূর্তেও সান্দিনিস্তা বিপ্লবের সমালোচনায় (এমনকি দক্ষিণপন্থীদের সমর্থনে) এতোই সোচ্চার হয়ে ওঠে যে সরকার 'লা প্রেন্‌সার' ওপর সেন্সর চাপিয়ে দেন শেষপর্যন্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কবি হিসেবে কুয়াদ্রা যে অতি শক্তিশালী ও মাননীয় এ কথা প্রকাশ্যে বলতে সান্দিনিস্তাদের বাধে না কোথাও। বিপ্লব-বিরোধী সাংবাদিক কুয়াদ্রাকে তাঁরা একেবারেই পছন্দ করেন না। কিন্তু কবি ও সাহিত্যবোদ্ধা কুয়াদ্রাকে তাঁরা সম্মান করেন।

উল্লেখযোগ্যঃ সান্দিনিস্তা সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে আমি যখন বললাম যে কবি ও সরকারবিরোধী পাব্‌লো আন্তোনিয় কুয়াদ্রার সংগে আমি দেখা করতে চাই, কথা বলতে চাই তখন কেউ আপত্তি তো করলোই না, বরং সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত মন্ত্রণালয় থেকেই করা হলো। সংস্কৃতি মন্ত্রকের কর্মী ও সাংবাদিক কার্লা'ই আমায় নিয়ে এসেছে 'লা প্রেন্‌সা' দপ্তরে।

পাব্‌লো আন্তোনিয় কুয়াদ্রা দীর্ঘদেহী, ধীর স্থির—দেখে মনে হয় না যে এঁর মধ্যে এক তুখোড় প্রতিবাদী কণ্ঠ রয়েছে। তাঁর ঘরে ছড়ানো রয়েছে অসংখ্য বই, কাগজ, পাণ্ডুলিপি। এই বর্ষিয়ান কবি ও সান্দিনিস্তা-বিরোধী সংবাদভাষ্যকার স্মিত হেসে, সস্নেহে আপ্যায়ন করলেন আমায় ও কার্লাকে। লক্ষ্য করছি, নবীনা সান্দিনিস্তা কার্লা ও প্রবীণ সান্দিনিস্তা-বিরোধী কুয়াদ্রা আন্তরিকতার সংগেই কথা বলছেন পরস্পরের সংগে। কুয়াদ্রা আমায় বললেনঃ "ভারতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে আমার বন্ধু অক্তাভিয়ো পাস-এর কাছে ভারতের গল্প শুনেছি।"

কুয়াদ্রা—নিকারাগুয়ার বেশীর ভাগ মানুষের মতোই—একবর্ণ ইংরিজী জানেন না। স্প্যানিশেই কথা বলছেন। আমার সমস্যা—স্প্যানিশ ভাষাটা দিব্যি বুঝি, এবং মামুলি প্রশ্ন আর অল্পবিস্তর জটিল প্রশ্নও স্প্যানিশে করতে পারি। কিন্তু প্রশ্নটা খুব ভারী হলেই দোভাষীর সাহায্য নিতে হয়। গুছিয়ে বলতে পারি না কুয়াদ্রা এতো নামী মানুষ, এতো বিতর্কিত তিনি এবং সব মিলিয়ে তাঁর গুরুত্ব এতো যে একজন ভালো দোভাষীর সাহায্য চেয়েছি, যাতে সাক্ষাৎকারে কোনো ভাষাগত বিভ্রান্তি বা সন্দেহের সুযোগ না থাকে। 'লা প্রেন্‌সা' পত্রিকারই এক সাংবাদিক হাজির আছেন, প্রয়োজনমতো আমায় সাহায্য এবং ভারী প্রশ্নগুলো স্প্যানিশে অনুবাদ করবেন বলে।

কুয়াদ্রার সংগে সাক্ষাৎকার শুরু হলো কবিতা ও সাহিত্যের প্রসংগ দিয়ে।

তিনি বললেনঃ "আমার ধারণা, ফরাসী কবিদের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী আমার ওপর। নাম করতে হয় আপোলিনেয়রের। তারপর, আমার সমসাময়িক অন্যান্য নিকারাগুয়ান কবির মতো আমার ওপরেও পড়েছিল উত্তর আমেরিকার কবিদের প্রভাব একসময়ে। এজরা পাউণ্ড ছিলেন এক বিরাট প্রভাব। প্রত্যেক প্রজন্মই তো পূর্বসূরীদের স্মরণ নেয় পথের নিশানার খোঁজে। পাউণ্ডের কবিতায় আমরা একসময়ে খুঁজে পেয়েছিলাম এক অনুসরণযোগ্য পূর্বসূরীর ঠিকানা।"

প্রশ্নঃ উত্তর আমেরিকান সাহিত্যে আর লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের মধ্যে ফারাক কতোটা?

কুয়াদ্রাঃ এ-প্রশ্নের প্রতি সুবিচার করতে গেলে একটা আস্ত বই লিখতে হবে যে! অল্প কথায় বলি, —দেখুন, কবিতার ক্ষেত্রে কিন্তু ফারাকের চেয়ে নৈকট্যই বেশী। আমেরিকা, তার ভূপ্রকৃতি, তার বৈশিষ্ট্য—এ সবের একটা সাধারণ ধারণায় আমরা দু'জনেই শরিক,—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। কয়েক জায়গায় তো একই পথ ধরে এগিয়েছি আমরা। যেমন ধরুন, জড়বাদের বিরুদ্ধে আমাদের মনোভাব আলাদা নয়। বড় বড় শহরের নৈর্ব্যক্তিক জীবনধারা সম্পর্কে, যেমন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কবিরা একই যন্ত্রণা ব্যক্ত করেছেন। প্রত্যেক কবিই তো স্থান ও কালের এক বিশেষ আবেষ্টনী ও পর্যায় থেকে লেখেন। এদিক দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কবিদের মধ্যে ফারাক নেই। একই সময়, একই ধরণের মাটি, একই প্রকৃতির সন্তান আমরা।

প্রশ্নঃ দক্ষিণ আমেরিকার ওপর উত্তর আমেরিকার যে প্রভাব বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পড়েছে, তার প্রেক্ষিতে উত্তর আমেরিকান লেখকদের সংগে দক্ষিণ আমেরিকান লেখকদের সম্পর্ক কি রকম? তাছাড়া, রাজনীতির ক্ষেত্রে, উত্তর আমেরিকা,—নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো লাতিন আমেরিকার ডিক্‌টেটরদের সাহায্য সমর্থন জুগিয়ে এসেছে চিরকাল, এবং আজও জুগিয়ে চলেছে—

কুয়াদ্রাঃ দেখুন, লাতিন আমেরিকার ওপর উত্তর আমেরিকার প্রভাব ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যতোটা পড়েছে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ততোটা পড়ছে না। এ-শতাব্দীর গোড়ায় অবশ্য উত্তর আমেরিকার বড় বড় কবি ও কাহিনীকারের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল লাতিন আমেরিকার লেখকদের ওপর। এখন আর তা নেই। এখন যেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে উত্তর আমেরিকার ঔপন্যাসিকদের লেখার মান পড়ে গিয়েছে। সে-তুলনায় লাতিন আমেরিকান কাহিনীকারদের লেখার উৎকর্ষ কিন্তু বেড়ে চলেছে। হর্হে লুইস বর্হে'র কথা ভাবুন। সাহিত্য রচনা ও চিন্তার যে ঘরানা তিনি গড়ে তুলেছেন তার প্রভাবে দুনিয়ার একাধিক বড় লেখক জোর গলায় জানিয়ে দিয়েছেন—

'আমি বহিস্তা' (বর্হেপন্থী)। ফক্‌নারের মতো শক্তিশালী মার্কিনী কাহিনীকারের প্রভাবও বর্হের মতো অতোটা জোরালো নয়—কি ইউরোপে, কি আমেরিকায়। সাংস্কৃতিক প্রভাব মার্কিন মুলুক থেকে যতোটা এসেছে তার অধিকাংশই বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের এটা একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে দক্ষিণ আমেরিকার ওপর প্রভাবটা প্রধানত বাণিজ্যিক। সাংস্কৃতিক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতোবারই হস্তক্ষেপ করেছে লাতিন আমেরিকায়, নাক গলিয়েছে,—সেটা তার নিজের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য, সাংস্কৃতিক স্বার্থের জন্য নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই চরিত্রটা খেয়াল করার মতো।

প্রশ্ন: সেনিয়র কুয়াদ্রা, এখন কী লিখছেন আপনি?

কুয়াদ্রা: নানা জিনিষ। দুটো কবিতার বই নিয়ে কাজ করছি। 'লা প্রেন্‌সার' একটা ইতিহাসও লিখছি আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। 'লা প্রেন্‌সা' আমরা বলি 'কাগুজে প্রজাতন্ত্র'। আমার সমগ্র রচনা সংকলনের কাজেও ব্যস্ত রয়েছি। চারটি খণ্ড বেরিয়ে গিয়েছে। আরো ছটা বেরোবে।

প্রশ্ন: নিকারাগুয়ায়, শুনতে পাই, অসংখ্য কবি। প্রায় সকলেই কবিতা লেখেন। গদ্যলেখকের সংখ্যাও কি অনেক?

কুয়াদ্রা: না। কারণ, নিকারাগুয়ার এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে কাব্য, কবিতাই হলো সাহিত্যে আমাদের উচ্চারণের স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত আঙ্গিক, মাধ্যম। কোনো দেশে হয়তো ছবি, কোথাও হয়তো সংগীত মানুষের সব-চেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ ও আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। নিকারা-গুয়ার মানুষদের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমটা হলো কবিতা। হাল্‌কা বা গভীর যে-কোনো ভাব, অনুভূতি কাগজে কলমে প্রকাশ করতে গেলেই আমরা, এ-দেশের মানুষ, অবধারিতভাবে কবিতা লিখে ফেলি। এমনকি সমালোচনাও লিখে থাকি আমরা কবিতার আঙ্গিকে। অর্থাৎ কবিতা আমাদের সমা-লোচনারও বাহন। রাজনৈতিক সমালোচনার। প্রত্যেক পার্টির ধ্যান-ধারণা, বক্তব্য, সমালোচনা ও যুক্তি কবিতার শরীরেই প্রকাশ পায় এ-দেশে।

এখন যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন, এটা হলো কেমন করে, বা এর কারণ কী,—তো কোনো সদুত্তর দিতে পারবোনা। কেউ কেউ বলেছেন—এ দেশ রুবেন দারিয়োর দেশ, তাই। কিন্তু এ-যুক্তিও দেওয়া যেতে পারে যে রুবেন দারিয়ো নিকারাগুয়ার মানুষ ছিলেন বলেই এক বিরাট কবি হতে পেরে-ছিলেন। এ-দেশে তাঁর জন্ম বলেই অমন কবিতা লিখতে পেরেছিলেন তিনি। কোনো দেশের মানুষ কী কারণে স্বাভাবিকভাবে কবিতার দিকে ঝোঁকে মনের ভাব প্রকাশের তাগিদে, সেটা আমার জানা নেই। আমাদের পূর্বপুরুষ "ইন্‌দিয়োরাও" (রেড ইন্‌ডিয়ান) ছিলেন স্বভাবকবি। [illegible]

প্রশ্ন: আপনার কি মনে হয়না যে নিকারাগুয়ার মতো একটা দেশে,—

Man is born Poet.

যেখানে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হওয়া প্রয়োজন,—গদ্যকে আরো গুরুত্ব দিলে ভালো হয় ?

কুয়াদ্রা: ভালো তো হয় ? কিন্তু দিচ্ছে কে ? আমাদের দেশে ভালো গদ্যলেখক তো হাতে গোনা যায়। জনা চারেক রয়েছেন। তাঁরা উপন্যাস আর গল্প লেখেন। কবিদের ভীড়ে তাঁরা হলেন একেবারেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

প্রশ্ন: আপনার কাগজ 'লা প্রেন্‌সা' সান্‌দিনিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে কেন ?

কুয়াদ্রা: সে এক দীর্ঘ কাহিনী। তবে মোদ্দা কারণটা হলো, যে বিপ্লব আমরা ওঁদের সংগে মিলে করেছিলাম—যে-বিপ্লবের কারণে আমাদের পত্রিকার প্রাক্তন পরিচালককে প্রাণ দিতে হয়েছে—তার দুটো শর্ত ছিল। প্রথম শর্তটা ছিল, দেশে গণতন্ত্র আনতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত: এ-বিপ্লব মুক্তি এনে দেবে। কিন্তু এর কোনোটাই পূরণ করা হয়নি। 'লা প্রেন্‌সা' ডিক্‌টেটরশিপের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে চিরকাল। তবু সেন্‌সরশিপ চাপানো হয়েছে তার ওপর। 'লা প্রেন্‌সা' সংবাদ স্বাধীনতার কথা বলে এসেছে সব সময়ে।

প্রশ্ন: কিন্তু সেন্‌সরশিপ চাপানো হলো কেনো ?

কুয়াদ্রা: কারণ, সান্‌দিনিস্তাদের মধ্যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবং এই প্রবণতায় কেবল একটা নীতিই স্বীকৃত। আমাদের তাঁদের অভিযোগ হলো—আমরা ভুল পথে চলেছি, লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়েছি, এবং বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছি। এই বলে তাঁরা সেন্‌সরশিপ চাপিয়েছেন আমাদের ওপর। আমাদের পরিকল্পনাটা কিন্তু অন্যরকম ছিল। আমরা বলেছিলাম—না, একটামাত্র মাপকাঠি নয়, বহু মাপকাঠি চাই। মতামতের বিভিন্নতায়, বহুত্বে আস্থাবান আমরা। তাঁরা তা নন। এখন আমরা প্রতিদিন আমাদের লেখাপত্র একটি বিশেষ সরকারি দপ্তরে পাঠাই। এবং তাঁরা আমাদের খবরাখবরে কাঁচি চালান।

প্রশ্ন: সেনিয়র কুয়াদ্রা, আপনি বলছেন যে সান্‌দিনিস্তারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও কট্টরপন্থী। কিন্তু আমি যখন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে জানালাম যে আমি আপনার সংগে দেখা করতে ও কথা বলতে চাই, তাঁরা কিন্তু আমায় বাধা দিলেন না বা এড়িয়ে গেলেন না। বরং সান্‌দিনিস্তা সরকারই আপনার সংঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করে দিলেন। এই ঘটনাটার কিরকম ব্যাখ্যা দেবেন আপনি ? কোনো কট্টরপন্থী, স্বাধীনতাবিরোধী সরকার কি একজন বিদেশী সাংবাদিক বা লেখককে জেনেশুনে একজন নেতৃস্থানীয় সরকারবিরোধীর কাছে পাঠাবেন ?

কুয়াদ্রা: দেখুন, সান্‌দিনিস্তারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং তাঁরা তাঁদের

কঠোর মানদণ্ড চাপানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এদিকে, দেশের ভেতরে ও বাইরে যথেষ্ট চাপও রয়েছে এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে। কিউবায় যা হয়েছিল ও হচ্ছে, এটা ঠিক সেরকম নয়। সান্দিনিস্তারা নিজেরাই কবুল করেছেন যে তাঁরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী।

প্রশ্ন ঃ সান্দিনিস্তাদের মধ্যে কাঁরা কবুল করেছেন এটা ?

কুয়াদ্রা ঃ ন'জন কমান্দান্তের সকলেই। তাঁদের আসল লক্ষ্যটাই হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। কিন্তু জনগণ বিরোধিতা করছেন। আমরা বিরোধিতা করছি। তাই তাঁরা ঠিক এঁটে উঠতে পারছেন না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কিন্তু আমার মূল প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। আমার প্রশ্নটা ছিল ঃ সান্দিনিস্তারা যদি এ-মুহূর্তে তাঁদের বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার জন্য এতোই তৎপর হবেন, তাঁরা যদি এতোই কট্টরপন্থী হবেন তো আমাকে আপনার কাছে কি করে আসতে দিলেন তাঁরা ? আপনার সামনে আমি টেপ রেকর্ডার খুলে বসে রয়েছি, আপনি সান্দিনিস্তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চারে কথা বলে চলেছেন, অকপট সমালোচনা করে যাচ্ছেন, এটা কি ভাবে সম্ভব হচ্ছে ?

কুয়াদ্রা ঃ দেখুন, এটা রাশিয়া বা কিউবা নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি বলতে চাইছেন যে নিকারাগুয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা একটা ভিন্ন পথ, আলাদা পন্থা নিয়েছেন ?

কুয়াদ্রা ঃ আমরা তাঁদের বাধ্য করছি একটা আলদা পথ ধরতে। এ-দেশে কঠোর প্রতিরোধ রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ সেনিয়র কুয়াদ্রা, সরাসরি জিজ্ঞেস করছি আপনাকে—আপনি কি এই বিপ্লবের সমর্থক ?

কুয়াদ্রা ঃ হ্যাঁ। কিন্তু সেই সমর্থনের দুটো শর্ত ছিল। আপনাকে আগেই বলেছি। এই পত্রিকার প্রাক্তন পরিচালক পেদ্রো হোয়াকিন্ চামোর্রো প্রাণ দিয়েছিলেন এই বিপ্লবের জন্য। এ ছিল আমাদের বিপ্লব। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লব এটা ছিল না। এ বিপ্লবের মূলে ছিল রাজনৈতিক বাহুত্ববাদ। আমরা সান্দিনিস্তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে চাই না। আমরা শুধু চাই যে বিপ্লব ঠিকপথে পরিচালিত হোক। আমরা যোগ দিতে চাই।

প্রশ্ন ঃ রনাল্ড রেগান ও তাঁর মার্কিন সরকারও আপনার মতো বিশ্বাস করেন যে সান্দিনিস্তারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী। আপনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকারাগুয়ানীতির সমর্থক ?

কুয়াদ্রা ঃ না। আমি রেগানের সংগে একমত নই। রেগান আর আমি দু'জনেই সান্দিনিস্তাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলছি মানে এই নয় যে আমি মার্কিনী নীতির সংগে একমত। বিপ্লববিরোধীদের গোপনে সাহায্য দেওয়াটাকে আমি নীতিগর্হিত বলে মনে করি। কিন্তু আমি এটাও বলবো যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কিউবা এ-দেশের সরকারকে লুকিয়ে লুকিয়ে

যে সাহায্য জোগাচ্ছে, আমি সেটারও সমর্থক নই।' আমি জাতীয়তাবাদী: আমরা চাই না কোনো সাম্রাজ্য—সে মার্কিনীই হোক আর রুশই হোক—আমাদের ব্যাপারে নাক গলাক।

প্রশ্ন: আপনার রাজনীতি ও সরকারবিরোধিতা যে সান্দিনিস্তাদের পছন্দ নয়, তা পরিষ্কার। কিন্তু লেখক হিসেবে আপনার যে উৎকর্ষ, যে প্রসিদ্ধি, রাজনৈতিক শত্রুতার সুবাদে তাঁরা কি সেটাও অস্বীকার করতে চান?

কুয়াদ্রা: না, তা তাঁরা চান না। এটা তাঁরা করেন না মোটেও। এর্নেস্তো কার্দেনালের ক্রিয়াকলাপ আমার একটুও পছন্দ নয়। কিন্তু তাঁর কবিতা তো আমার ভালো লাগে।'

প্রশ্ন: অর্থাৎ তাঁরা বলেন না যে পাবলো আনতোনিয় কুয়াদ্রা আমাদের বিরোধী, অতএব তাঁর সাহিত্যও বর্জনীয়।

কুয়াদ্রা: না, এসব তাঁরা একদম বলেন না। এতোটা বাড়াবাড়ি এখনো হচ্ছে না। (হাসি)

প্রশ্ন: সান্দিনিস্তাদের মধ্যে আপনার বন্ধুরা নেই?

কুয়াদ্রা: সকলেই তো আমার বন্ধু ছিলেন।'

প্রশ্ন: "ছিলেন" কেন বলছেন?

কুয়াদ্রা: কারণ, তাঁরা ত্যাগ করেছেন আমাকে, আর আমিও তাঁদের ত্যাগ করেছি।'

প্রশ্ন: আপনি কি আশংকা করেন যে আপনার প্রাণ এবং লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে আপনার জীবন ভবিষ্যতে বিপন্ন হতে পারে?

কুয়াদ্রা: না না, এখনো সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না আমার। এবং ওরকম পরিস্থিতি যেন কখনো না আসে, এটাই কামনা করি আমি।

প্রশ্ন: সেনিয়র কুয়াদ্রা, আপনার মতামতকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিচ্ছি আমি। কিন্তু আপনার সান্দিনিস্তা বিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সান্দিনিস্তা বিপ্লবীরা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, যে বলিষ্ঠ ও ফলদায়ক কাজ করেছেন, সেগুলোকেও কি আপনি উড়িয়ে দিতে চান, অস্বীকার করতে চান?

কুয়াদ্রা: সান্দিনিস্তা সরকার আমাদের ঠেলে দিয়েছেন পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের আবর্তে। এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের কাজগুলোকে আমি সুকীর্তি বলে মনে করি না। সেগুলোকে আমি অস্বীকার করি। পরাণশক্তির দ্বন্দ্বে আমাদের এইভাবে ঠেলে দেবার দরুণ সান্দিনিস্তাদের সমস্ত কৃতিত্ব মুছে গিয়েছে।"

সাক্ষাৎকারের সময়ে কোনরকম উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম না পাবলো আনতোনিয় কুয়াদ্রার কণ্ঠস্বরে বা চোখেমুখে। আমার দু'একটা প্রশ্ন শুনে তিনি

যে একটু বিব্রত হচ্ছেন, কিছুটা অস্বস্তি যে তাঁর হচ্ছে, এটা বোঝা গেল অবশ্যই। কিন্তু সেই অস্বস্তিটুকু হজম করেই উত্তর দিলেন তিনি—গুছিয়ে, সংযতভাবে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের নিষ্ঠাবতী সান্দিনিস্তাপন্থী কর্মী কার্লা আমার পাশে বসে বসে গভীর মনযোগ দিয়ে শুনে গেল সান্দিনিস্তাদের সম্পর্কে কুয়াদ্রার কঠোর সমালোচনা। তার আচরণেও অসহিষ্ণুতা বা বিরক্তির লেশ-মাত্র ছিল না।

সাক্ষাৎকারের শেষে পাব্‌লো আন্তোনিয় কুয়াদ্রা তাঁর লেখা কবিতার দুটি সংকলন উপহার দিলেন আমায়। তার একটিতে তিনি স্প্যানিশ ভাষায় লিখে দিলেন—"সুমন চট্টোপাধ্যায়কে দিলাম—আপনার সংগে আলাপ করে ভালো লাগলো বলে। এই বই-এর একটি কবিতা উৎসর্গ করলাম আপনাকে, কারণ সে-কবিতায় আপনারই দেশের কারণ নিয়েছি আমি।"

কবিতাটির নাম 'এল মাংগো'। তার এক জায়গায় রয়েছেঃ "দূর হিন্দুস্থান থেকে এসেছিল একটা আম এই নিকারাগুয়ায়।"

আমি, কলকাতার সুমন চট্টোপাধ্যায়, থুড়ি মানব মিত্র সুদূর নিকারাগুয়ার এক কবির লেখা কবিতা নিয়ে ফিরে যাবো "দূর হিন্দুস্থানে"। বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে।

বিদায় নেবার সময়ে দেখলাম কার্লা ও কুয়াদ্রা আন্তরিকভাবে করমর্দন করলেন। সাক্ষাৎকারে দোভাষী হিসেবে যিনি হাজির ছিলেন (এবং দরকার মতো আমি যাঁর সাহায্য নিচ্ছিলাম) তিনি কার্লাকে আমাদের সামনেই বললেন—"আমার ছেলেকে আমার কথা বোলো, আমার আদর দিও।"

ঘটনাটা ধরতে পারলাম না। বাইরে বেরিয়ে কার্লাকে প্রশ্ন করতে সে বললো—"এই ভদ্রলোক 'লা প্রেন্সার' কর্মী এবং সান্দিনিস্তা বিরোধী। গোঁড়া দক্ষিণপন্থী। আর এঁর ছেলে সান্দিনিস্তাদের দলে। সে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়েরই কর্মী। বাপ আর ছেলের মধ্যে ভয়ানক টানাপোড়েন চলছে আদর্শ ও মতবাদের কারণে।"

কার্লার কাছে জানতে চাইলাম, কুয়াদ্রা সম্পর্কে তার কী মত। বললো—"খুব শিক্ষিত, মার্জিত ভদ্রলোক উনি। তবে ওঁর মতামত আমার ভিত্তিহীন মনে হয়।"

* * *

সন্ধ্যেবেলা ম্যালকমের কল্যাণে আলাপ হলো বাল্‌দ্রাক্‌ আর দনাল্‌দের সংগে। দু'জনেই নিকারাগুয়ান তরুণ। দনাল্‌দ মানাগুয়ার ছেলে। বাল্‌দ্রাকের জন্ম অতলান্তিক উপকূলে। তার দেহে স্প্যানিশ রক্তের চেয়ে ইণ্ডিয়ান ও কৃষ্ণাংগদের রক্তই বেশী। নিকারাগুয়ার আতলান্তিক উপকূলে মিস্‌কিতো, সুমো, রামা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বাস। তাঁরা দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন ছিলেন

নিকারাগুয়ার মূল জনজীবন থেকে। বিপ্লবের পর তাঁদের সংগে যোগাযোগ বেড়েছে। ঐ অঞ্চলের লোকেরা মিস্‌কিতো, সুমো ইত্যাদি ভাষায় কথা বলে। এককালে এখানে ইংরেজদের ঘাঁটি ছিল। তাই ইংরিজীর প্রচলনও আছে' তবে তা ক্রেয়ল ইংরিজী। এই আতলান্তিক অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ আধিপত্য ঘুচে যাবার পরেও স্প্যানিশ সংস্কৃতি প্রভাবিত নিকারাগুয়ার শাসকগোষ্ঠী মিস্‌কিতো, সুমো, রামা সম্প্রদায়গুলিকে ব্রাত্য করে রেখেছিলেন। দীর্ঘকাল। কাজেই এইসব সম্প্রদায় আর নিকারাগুয়ার বাকি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ, সামঝোতার অভাব এবং কিছু টানাপোড়েনও রয়েছে।

আতলান্তিক উপকূল থেকে আসা বাল্‌দ্রাক্ সান্‌দিনিস্তা বিপ্লবের সোচ্চার সমর্থক। সে উত্তর সীমান্তে লড়াই করেছে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে এবং একাধিকবার কফি ব্রিগেডে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে ওর স্বীকার করতে আটকালোনা যে বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই সান্‌দিনিস্তারা মিস্‌কিতো সুমোদের ব্যাপারে কিছু ভুল করেছিলেন। দুই জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন, যোগাযোগ স্থাপনের কাজ যে আরো সমঝে করা দরকার, এ-কথা বারবার বললো বাল্‌দ্রাক্।

এখন অবশ্য অবস্থা অনেক ভালো। ঐ অঞ্চল থেকে এখন মিস্‌কিতো ভাষায় পত্রিকা বেরোচ্ছে, বই বেরোচ্ছে। মিস্‌কিতোদের নিজস্ব লিপি নেই। তাঁরা রোমান হরফেই লেখেন। তাঁদের মধ্য থেকেই বেছে নেওয়া হয়েছে সরকারি প্রতিনিধি। গত বছর তিনেকে ঢের উন্নতি হয়ে গিয়েছে আতলান্তিক উপকূল অঞ্চলে।

বাল্‌দ্রাক্ মুচ্‌কি হেসে সরবতের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো,—নানান সমস্যা রয়ে গেছে এখনো, যেমন কিছুটা বর্ণবাদ। কিরকম?—দনাল্‌দ, যে কিনা মানাগুয়ার ছেলে, একটু যেন বিব্রত। ম্যালকম, স্টোস আর আমি চেপে ধরলাম,—বর্ণবাদটা কিরকম এখানে?

বাল্‌দ্রাক্ বললো, "কিরকম আবার, স্প্যানিশভাষায় যারা কথা বলে না সেই আতলান্তিক উপকূলবাসীদের প্রতি কোনো কোনো স্প্যানিশভাষীর বিদ্বেষ।"

বাল্‌দ্রাকের চুল কালো, কোঁকড়া, পুরু ঠোঁট, গায়ের রং কালোই বলা চলে। দনাল্‌দের চুলও কোঁকড়া, তবে গায়ের রং তামাটে। স্পেনীয় বা কন্‌কিস্‌তাদোরেসদের ছাপ দনাল্‌দের চেহারায় যতোটা, বাল্‌দ্রাকের চেহারায় ততোটা নয়। সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম,—কি বন্ধু, সাদা-কালোর ব্যাপার আছে নাকি? বাল্‌দ্রাক্ বললো, "একেবারে যে নেই তা বলি কি করে। আসলে কি জানো, বর্ণবাদ, বর্ণবৈষম্য এগুলো তো সামন্ততন্ত্র আর পুঁজিবাদের পয়দা করা জিনিষ। আমাদের বিপ্লবের বয়স তো মোটে পাঁচ বছর।

বহুকালের পাপ বিদেয় করতে তো সময় লাগে, তাই না ? সমস্যা অল্পস্বল্প রয়েছে এখনো, তবে কেটে যাবে একদিন। বিপ্লব চলুক।"

দনালদ আশ্বস্ত হলো যেন। পাবলো আনতোনিয়, কুয়াদ্রার সংগে আজ সকালে কথাবার্তা হয়েছে এটা জানাতেই দুই তরুণ সানদিনিস্তা বালদ্রাক আর দনালদ লাফিয়ে উঠলো। বালদ্রাক চোখ পাকিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়ে ঘোষণা করলো—"কমরেড, যে ভদ্রলোকটির সংগে আজ তোমার দেখা হয়েছে,—জেনে রেখো,—তিনি হলেন এ-দেশে ফাসিবাদীদের পালের গোদা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন হিটলার মুসোলিনির ভক্ত। তারপর সোমোসার।" Fascist Ezra Pound.

আমি জানতে চাইলাম—"আচ্ছা বালদ্রাক, তোমার বা দনালদের কি মনে পড়ে, সানদিনিস্তা বিপ্লবী কমানদান্তেরা সবাই নাকি বলেছেন যে তাঁরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ?"

—"কোনোদিন, কোথাও, কেউ বলেনি এমন কথা। আমি যখন কিশোর ছিলাম, তখন থেকেই বিপ্লব করছি আমি। লড়াই করে চলেছি। সামরিক কর্মী, মিলিশিয়া ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ করছি আজ কয়েক বছর হয়ে গেল। কোনোদিন শুনিনি এমন কথা। আমরা আলবৎ বলেছি, সমানে বলে চলেছি যে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের পথেই আমরা এগোতে চাই। ব্যাস। এর বেশী কিছু বলেনি কেউ। অসম্ভব। বলতে পারে না।"

লিদিয়ার সংগে সান্দিনিস্তা মহিলা সমিতিতে। এই সমিতির পুরো নাম ঃ লুইসা আমান্দা এস্পিনোসা মহিলা সমিতি। লুইসা আমান্দা এস্পিনোসা ছিলেন সান্দিনিস্তা মুক্তি ফ্রন্টের প্রথম মহিলা শহীদ। ১৯৭০ সালে সোমোসার ন্যাশনাল গার্ডের হাতে তিনি খুন হন।

দেখা করলাম সমিতির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যক্ষা ইভোনে সিউ-এর সংগে।—'মহিলা সমিতি' নামটা শুনলেই, কেন জানি না, একটু ভারিক্কি চেহারার বয়স্কা মহিলাদের কথা মনে হয়। হাজির হলেন যিনি সেই তন্বীর বয়স পঁচিশের বেশী বলে মনে হয়না।

সিউ ঃ আমাদের সমিতির জন্ম বিপ্লবের দু'বছর আগে। ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে যে লড়াই তা থেকেই জন্ম নিয়েছিল এই সমিতি। ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহিলাদের যে ভূমিকা, আর আমাদের দেশে মহিলাদের যে ভূমিকা—দুটো বেশ আলাদা। কারণ, এ-দেশের সনাতন রাজনৈতিক দলগুলোয় মেয়েদের কোনো স্থান ছিল না। রাজনৈতিক সংগ্রামে মেয়েদের কোনো ভূমিকা ছিল না। সান্দিনিস্তা ফ্রন্টে অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গিয়েছে। যাই হোক, রাজনৈতিক সংগ্রামে মহিলাদের ভূমিকার প্রয়োজনীয়তাটা ক্রমশই বড় হয়ে দেখা দিতে লাগলো। সোমোসার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মেয়েরা ক্রমে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কালক্রমে আমাদের সমিতি, মহিলাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ গোটা জনগণের সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া, মহিলাদের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ,—কি অর্থনীতিতে কি সমাজে,—তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াই-এর জন্যেও এই সমিতির প্রয়োজন ছিল।

প্রশ্ন ঃ বিপ্লবের পরেও কি নিকারাগুয়ায় মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করা হচ্ছে?

সিউ ঃ হ্যাঁ, তা হচ্ছে বৈকি। কারণ, মেয়েদের বিরুদ্ধে বৈষম্য হলো এক সামাজিক সমস্যা। এটা মতাদর্শ, মতবাদের ব্যাপার। বহুকালের বদ্ধমূল ধ্যানধারণার ব্যাপার। এ সমস্যা রাতারাতি ঘোচানো যাবে না। তবে বিপ্লবের দরুণ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব হচ্ছে। আমরা বিলক্ষণ জানি যে এ এক বিরাট লড়াই। নানান দিকে। পুরুষদের তথাকথিত পৌরুষ একটা বড় সমস্যা। তারা চায় না যে মেয়েরা বিশেষ

বিশেষ কিছু কাজ করুক। অথচ আমরা তো ছেলেদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি। তাদের মতো আমরাও তো বন্দুক ধরেছি, সশস্ত্র সংগ্রাম করেছি।

প্রশ্ন ঃ কতোজন মহিলা গেরিলা লড়াই করেছেন সোমোসা-একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে ?

সিউ ঃ তা ধরুন না কেন, গেরিলাদের শতকরা তিরিশ জনই ছিলেন মহিলা। অবশ্য শহরে শহরে জনতার সংগ্রামে আরো বেশী সংখ্যক মেয়ে জড়িত ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ আপনার এই ঘরের দেওয়ালে ন'জন কমান্দান্তের ছবি। সকলেই তো দেখছি পুরুষ। একজন মহিলাকেও দেখছিনা কেন ?

সিউ ঃ এ হলো এক ঐতিহাসিক সমস্যা। যেসব কমাদান্তের ছবি দেখছেন, সশস্ত্র সংগ্রাম এঁরাই শুরু করেছিলেন। আমাদের সামাজিক কাঠামোটা এমন যে লড়াই শুরু করতে হয়েছে পুরুষদেরই। তাছাড়া, সব-কিছুর ওপর মেয়েদের সম্পর্কে একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব তো ছিলই। এটা তো ইতিহাসের ব্যাপার।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের এই সমিতির কাজটা কী ?

সিউ ঃ নানা রকম। মেয়েদের স্বার্থ দেখা। রক্ষা করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পেশায়, সামাজিকভাবে মেয়েদের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত হয়, শুধু মেয়ে বলে তাদের যেন অসুবিধেয় পড়তে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা। মেয়েরা আজকাল বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছেন—চিকিৎসায়, শিক্ষায়, নানা জায়গায়।

প্রশ্ন ঃ কোন্ পেশায় মেয়েদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ?

সিউ ঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে। বিশেষত ইস্কুলে। ইদানিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অধ্যাপিকাদের সংখ্যা বাড়ছে। যেসব পেশায় আগে মেয়েদের তেমন দেখা যেত না, আজকাল তাঁদের দেখা যাচ্ছে সেইসব পেশায়।

প্রশ্ন ঃ স্বাক্ষরতা অভিযানে কি আপনি ছিলেন ?

সিউ ঃ নিশ্চয়ই। শতকরা ৬০ জন ব্রিগাদিস্তা ছিল মেয়ে। ঐ অভিযান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল মেয়েদের জন্য। কারণ স্বাক্ষরতা অভিযানেই শহরের মেয়েদের সংগে গ্রামের মেয়েদের সরাসরি মোলাকাত হয়েছিল প্রথম। এক-সংগে থাকতে হয়েছিল, ওঠাবসা, কাজ করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনি তো শহরের মেয়ে। স্বাক্ষরতা অভিযানে গ্রামে যাবার আগে গ্রামের মেয়েদের সম্পর্কে আপনার কতোটা ধারণা ছিল ?

সিউ ঃ মোটের ওপর একটা ধারণা ছিল বটে। তবে অভিযানে গিয়ে আসল ছবিটা দেখতে পেলাম, আসল কথাগুলো জানতে পারলাম, গ্রামের মেয়েদের বাস্তবিক পরিস্থিতিটা টের পেলাম।

প্রশ্ন ঃ বিপ্লবী নিকারাগুয়ায় প্রচুর মেয়ে নানা ধরণের কাজ করছেন। আবার সংসারও করছেন। আমার অভিজ্ঞতা বলে, মেয়েরা যখন চাকরি নেন বা কাজ নেন, তখন তাঁদের দুটো চাকরি করতে হয়। একটা বাইরে, অন্যটা ঘরে। পুরুষরা সেদিক দিয়ে কিছু সুবিধে ভোগ করে থাকেন। তা এই বৈষম্যের বা অতিরিক্ত কাজের ব্যাপারে কী করছেন আপনারা?

সিউ ঃ হক্ কথা বলেছেন। এটা বাস্তবিকই একটা বড় সমস্যা। এবং জোর লড়াই করতে হচ্ছে এ-ক্ষেত্রে। পুরুষদের বোঝানো হচ্ছে। আলোচনা চলছে। প্রচার চালানো হচ্ছে। চেষ্টা চলছে, পুরুষরা যাতে বোঝেন যে নতুন দিন এসেছে এবং সাংসারিক ভূমিকায় রদবদল করতে হবে, ঘরোয়া কাজের ভার তাঁদেরও নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের দেশ তো ক্যাথলিক দেশ। তা নারীমুক্তির দিকে এগোতে গিয়ে, সামাজিক পরিবর্তন আনতে গিয়ে ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক বাধাবিপত্তির মুখে পড়তে হবেনা আপনাদের ?

সিউ ঃ হচ্ছে বৈকি। ধর্মীয় ধারণাগুলো তো মূলত মতবাদ, মতাদর্শের ব্যাপার। সমাজে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু কিছু ধর্মভিত্তিক ধারণা হরেদরে একটা বিশেষ মতবাদের ফল। ধর্ম থেকেই মতবাদটা এসেছে। যেমন ধরুন, বিয়ের পর স্ত্রী স্বামীর দাসী। তারপর ধরুন, নারীর ভূমিকা কেবলমাত্র মায়ের ভূমিকা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা একটা বাধা। তবে দেখুন, গণমুখী গীর্জাও তৈরী হয়েছে। লিবারেশন থিয়োলজির ভূমিকাটা শক্তিশালী। কাজেই ধর্ম ও সমাজ, গীর্জা ও সমাজের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটাও পাল্টাচ্ছে। ফলে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে যেসব পুরোনো ধারণা ছিল, সেগুলোও যাচ্ছে পাল্টে।

পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জন্মনিরোধ সম্পর্কে ঢালাও খবরাখবর দেবার একটা বিভাগ আছে। মেয়েদের নানান পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সেখানে। জন্মনিরোধক ওষুধ ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে বিনা পয়সায়।

প্রশ্ন ঃ নিকারাগুয়ায় ধর্মের প্রভাব যেহেতু বেশী সেহেতু নারী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারেও ধর্মীয় নীতি ও অনুশাসনের কড়াকড়ি থাকার কথা। বিপ্লবের পর নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে কি ?

সিউ ঃ এককালে, মানে বিপ্লবের আগে কড়াকড়ি ছিল ভীষণ। তখন ভালোলাগা বা ভালোবাসা যথেষ্ট ছিলনা। একসংগে থাকতে হলে বিয়ে করতে হতো। বিপ্লবের পর সেই বাধ্যবাধকতা আর নেই। এখন একটি ছেলে আর একটি মেয়ে বিয়ে না করেই স্বচ্ছন্দে একসংগে থাকতে পারে।

এবং লোকে থাকছেও। গীর্জায় বা সরকারি আপিসে গিয়ে বিয়ে করে তবে সহবাস করার বাধ্যবাধকতা ঘুচে গিয়েছে।?

প্রশ্ন : এবং সমাজের পাঁচজনে সেই মুক্ত সহবাস মেনে নিচ্ছে?

সিউ : নিশ্চয়ই। দু'জনে পরস্পরকে ভালোবাসলে একসংগে থাকবো। তার জন্য বিয়ে করতেই হবে, একটা সরকারি অনুমতিপত্র থাকতেই হবে, তা কেন? বিপ্লবের পর সত্যিকার স্বাধীনতা এসেছে। বিয়ে করার ঐ বাধ্যবাধকতা, নৈতিক অনুশাসন তো ছিল বুর্জোয়া অনুশাসন। এখন ছেলে-মেয়েরা, প্রেমিক প্রেমিকারা দিব্যি-একসংগে থাকতে পারে। পরে যদি বনিবনা না হয় তো তারা আলাদা হয়ে যায়। ছাড়াছাড়ির ব্যাপারেও সাবেক 'নৈতিকতার' বাধা আর নেই।

প্রশ্ন : আচ্ছা ধরুন, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে বিয়ে না করেই একসংগে ঘর করছে। এবার তাদের একটা ছেলে বা মেয়ে হলো।

সিউ : কোনো সমস্যা নেই। এখন নতুন আইন হয়েছে। 'অবৈধ' বলে আর কিছু নেই। সব বাচ্চাই বৈধ। তার বাবামা যদি বিবাহিত দম্পতি না হন তো তাতে কিছুই আসে যায় না। বিপ্লবের আগে এরকম ছিল না। তখন, এরকম ক্ষেত্রে, বাচ্চা হলে তাকে অবৈধ বলা হতো, তার কোনো অধিকারই থাকতো না। বিপ্লবের পর সেসব রীতিনীতি নিয়মকানুন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব শিশুই বৈধ। সকলেরই অধিকার আছে। এবং আইনটা হলো এই রকম যে, বাবাকে সন্তানের ভরণপোষণের জন্য টাকা দিতে হবে প্রতি মাসে। বিয়ে হোক আর নাই হোক, সন্তান জন্মালে তার দায়িত্ব বাবামার।

নেপথ্যে—অতিথিশালায়

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আসা ব্যালেশিক্ষক বরিস মহা উত্তেজিত। রুশ ছাড়া অন্য কোনো ভাষাই বেচারা তেমন জানেন না। তবে হ্যাঁ গুটিকয়েক ইংরিজী ও জার্মান শব্দ তাঁর দখলে। ফলে সকালবেলা প্রাতরাশের সময়ে লুবা ও ইউরি না থাকলে অংগভংগী আর ঐ বিচ্ছিন্ন ইংরিজী ও জার্মান শব্দের মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান চলে। আর লুবা বা ইউরি থাকলে তাঁরাই নেন দোভাষীর ভূমিকা : রুশ থেকে স্প্যানিশ, স্প্যানিশ থেকে রুশ।

কাজে বেরোনোর আগে পর্যন্ত বরিস বেশ খোসমেজাজেই থাকেন। কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজের সময়ে তিনি বাড়ি ফেরেন মহা উত্তেজিত হয়ে। ঐ সময়ে অতিথিশালায় বাসিন্দারা প্রায় সকলেই হাজির থাকেন।

লাতিন আমেরিকার চিরগ্রীষ্মের ভাপে সেদ্ধ হতে হতে আমরা দুই রাঁধুনি কম্‌পানিয়েরা পাউলিনে ও মাতিল্‌দার অমর সৃষ্টিগুলো তারিয়ে তারিয়ে খাই আর গালগল্প করি। মিতভাষী বরিসের মুখ থেকে মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে আসে একটি রুশ শব্দ : কাশ্‌মা। লুবা বলে দিলেন 'কাশ্‌মা' মানে দুঃস্বপ্ন। এই দুঃস্বপ্নের স্বরূপ জানতে চাওয়ায় লুবার মধ্যস্থতায় বরিস বললেন : "নিকারাগুয়ায় ব্যালে শেখানোটাই দুঃস্বপ্নের মতো। পিয়ানো একখানা যদি বা আছে, ভালো পিয়ানোবাদক নেই। নাচ শেখানোর সময়ে সুরতাল পাবো কোত্থেকে ? তার চেয়েও যা বিপদের কথা—ব্যালে নাচার জুতোই নেই। কি মুশ্‌কিল বলো দেখি। আমি সমানে খুঁচিয়ে চলেছি কর্তাদের। তাঁরা বলছেন জুতোর অর্ডার দেওয়া হয়েছে, এই এলো বলে।"

মার্কিনী মেয়ে স্টেসি আমার পাশেই বসেছিল। ইংরিজীতে প্রায় আমার কানে কানে বললো : "শোনো শোনো, বিপ্লবী দেশের শিল্পীর কথা শোনো। এই গরীব দেশটা যে ছেলেমেয়েদের সামনে যে-করে হোক এক নতুন শৈল্পিক অভিজ্ঞতার দরজা খুলে দিতে চাইছে সেটা এই কমরেডের কাছে যথেষ্ট নয়। যারা কোনোদিন কিছু পায়নি, তারা এই বিপ্লবী দেশে একটা ভালো জিনিষ নতুন জিনিষ অল্প করে হলেও শেখার সুযোগ পাচ্ছে, এটাও যথেষ্ট নয় এর কাছে। জুতো নেই তো হয়েছে কী! মুরোদ থাকলে খালি পায়েও ব্যালে শেখানো যায়। একটু মাথা খাঁটাও না বাপু!"

স্টেসি এতোগুলো কথা ইংরিজীতে বলায় ইউরি, লুবা আর বরিস তার এক বর্ণও বুঝতে না পেরে বেশ সন্দেহের চোখে তাকাতে লাগলেন আমাদের দিকে।

'রুশ-মার্কিন' বিরোধ আন্তর্জাতিক রাজনীতির লীলাভূমি ছেড়ে এবার বুঝি মানাগুয়ার এই শান্তিময় অতিথি নিবাসেও এসে পড়লো—এই ভয়ে আমি আমার সীমিত ভাষার পুঁজি নিয়েই মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলাম প্রসংগটা পাল্টাতে।

* * *

আমাদের এই ষোলো নম্বর সরকারি অতিথিনিবাসের রুশী কম্পানিয়েরোরা এমনিতে বেশ তোফা আছেন, যা দেখছি। কোন এক অজ্ঞাত পথে, বোধহয় সোভিয়েত দূতাবাসের আনুকূল্যে এঁদের হাতে টিনে-ভরা সালামি, মায় ক্যাভিয়ার, চকোলেট বিস্কুট আর সিগারেট পৌঁছে যায়। পৌঁছে যায় ভারী স্বাদু পনির। প্রাতরাশের সময়ে ম্যালকম, স্টেসি আর আমি তার প্রসাদ পাই মাঝেমধ্যে। বরিস—সকালের দিকে 'কাশ্মা' মুক্ত চেতনার বশবর্তী হয়ে—প্রায়ই কড়া রুশী সিগারেট খাওয়ায়। আমার প্রতি বরিসই সবচেয়ে সদয়। তার প্রধান কারণ ও একবার কলকাতায় এসেছিল অনুষ্ঠান করতে এবং কলকাতা শহর আর তার মানুষদের ভারী পছন্দ হয়েছে ওর। কাজেই সুদূর মানাগুয়ায় বলা-নেই-কওয়া-নেই কলকাতার এক লোককে নাগালের মধ্যে পেয়ে বরিস মাঝেমধ্যেই অভিভূত হয়ে পড়ে যেন। সকালের সেই স্নিগ্ধ অবস্থায় বরিস তার পেশীবহুল ডান হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেঃ "বুয়েনস্ দিয়াস, আমিগো" (সুপ্রভাত, বন্ধু)। তারপরেই এক প্যাকেট রুশী সিগারেট এগিয়ে ধরে বলে "কালকত্তা, কালকত্তা!" সেই সংগে ঠোঁটদুটো ছুঁচলো করে চুমু খাওয়ার শব্দ

* *

মাঝেমধ্যে স্থানীয় রুশী শিক্ষকরা (সকলেই সংগাত শিল্পী) সপরিবারে পার্টি করেন নিজেদের মধ্যে। আমাদের অতিথিনিবাসটা সবচেয়ে বড় বলে এখানেই খানাপিনা চলে। কিন্তু সেই আসরে অরুশীরা নিমন্ত্রিত হননা। ফলে ম্যালকম, স্টেসি আর আমি দূর থেকে দেখি।

* * *

খাবার টেবিলে ইউরি একদিন আচমকা জিজ্ঞেস করলেন আমায়ঃ "তুমি কি কোনো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য?"

—"না"।

ইউরি যেন একটু উৎসাহিত হয়ে বলে ফেললেন—"আমিও কমিউনিস্ট নই।"

ম্যালকম—যার জীবনের বেশ কিছুটা সময় রসিকতা করে কাটে—দড়াম করে মন্তব্য করে বসলোঃ "সেকি, আমি তো এতোদিন ভাবতাম রাশিয়ায় সকলেই কমিউনিস্ট। ইউরি বেচারি একটু যেন হক্চাকিয়ে গেলেন। আমি অগত্যা বলে দিলামঃ "তোমার প্রশ্ন, আমার উত্তর আর তার পিঠে তোমার

মন্তব্য—এই প্রসংগে আমি একটা কথা বলতে চাই। আমার দেশে কিন্তু কমিউনিস্ট হওয়া আর কোনো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া সব সময়ে এক জিনিষ নয়।"

*　　*　　*

দুই ফরাসী কম্‌পানিয়েরো এসেছেন আমাদের সংগে থাকতে। রাতের খাবার খেতে গিয়ে তাঁদের দেখা পেলাম প্রথম। আমি আমার আর আমার দেশের নাম বলে নিজের পরিচয় দিলাম। ফরাসী যুবক দুটি আমাকে একনজর দেখে নিয়ে, বিনাবাক্যব্যয়ে ফের খেতে লাগলেন। আমি একটু বোকাবোকা হেসে তাদের জিজ্ঞেস করলাম: "কম্‌পানিয়েরোস, তোমাদের বুঝি নাম নেই?"

ইউরি, লুবা সংগে সংগে হেসে উঠলেন। বরিস স্প্যানিশ একদম বোঝে-না, তবু ইউরি আর লুবাকে হাসতে দেখে সে-ও মুচকি হাসলো। স্টেসি আর ম্যালকম আমার স্বভাবচরিত্রর সংগে ঢের বেশী পরিচিত হয়ে উঠেছে এ-ক'দিনে (ইংরিজীর কল্যাণে ওদের সংগেই সবচেয়ে বেশী আড্ডা দিই বাড়ীতে), তাই ওরা বোধহয় প্রমাদ গণতে লাগলো। মুখে হাসি নেই। দুই ফরাসী যুবক খাওয়া থামিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। ক্লাসিক পরিস্থিতি: ঘরভর্তি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব, একজন শুধু তৃতীয়।

বেয়াড়া নীরবতা ভেঙে একজন জবাব দিলেন—"আমার নাম ফ্রাংক্।"—অপরজন বললেন—"আমার নাম দোমিনিক।" ফ্রাংক বললেন—"আমরা ফ্রান্সের লোক। পেশায় প্রত্নতত্ত্ববিদ।" স্টেসি, ম্যালকম আর আমার মধ্যে ততক্ষণে চোখাচোখি হয়ে গেছে। হয়ে গেছে সংকেত বিনিময়। আমি তখনো আসন নিইনি। বলে উঠলাম—"ভিভা সানদিনো!" স্টেসি আর ম্যালকম জবাব দিলো: "সিয়েম্‌প্রে ভিভে!" (তিনি চিরজীবী!) রুশী বন্ধুরা হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন। ফরাসী বন্ধুরা হাসলেনও না, কিছু বললেনও না।

পরে জেনেছি দোমিনিক নাকি কমিউনিস্ট। ফ্রাংক ও দোমিনিক দু'-জনেই নিকারাগুয়ায় এসেছেন পেশা আর পি.এইচ.ডি থিসিস লেখার তাগিদে। সানদিনিস্তা বিপ্লব ও নিকারাগুয়া সম্পর্কে তাঁদের কথাবার্তায় ও আচরণে দেখেছি শুধু ঔদ্ধত্য ও উন্নাসিকতা। অথচ তাঁরা ঐ গরীব দেশের অন্নে পুষ্ট হয়ে প্রায় একটা বছর নিজেদের গবেষণা করবেন এবং একদিন ফ্রান্সের কোনো এক নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর' খেতাব পাবেন।

আঠেরোই মে

আজ সান্দিনোর জন্মদিন। এই উপলক্ষে মানাগুয়ার এক ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জনসভা। কার্লা নিয়ে গেল।

পৌঁছে দেখি স্টেডিয়ামের দরজা খোলেনি তখনো, কিন্তু লোক জমতে শুরু করেছে। ফুটপাথে বসে আছে অনেকে। বাকি সবাই এদিক ওদিক ছড়িয়ে। দূর থেকে মিছিল আসছে শ্লোগান দিতে দিতে। ছোট ছোট দল। ছোট ছোট মহল্লার লোকজন। ব্যানার ধরে রয়েছে বাচ্চা মেয়েরা। পেছনে মহিলারা শ্লোগান দিচ্ছেন—'ন' পাসারান্'—'ওরা যেতে পারবেনা'—স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিখ্যাত শ্লোগান। শ্লোগান যাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ, উত্তোলিত মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত, গোটা দেহের দৃপ্ত ভংগী জানিয়ে দিচ্ছে তাঁদের দৃঢ় সংকল্পের কথা। শ্লোগানের বক্তব্যের সংগে তাঁরা সম্পূর্ণ একাত্ম।

আধঘণ্টার মধ্যেই অনেক লোক জমে গেল। দরজাও গেল খুলে। কার্লা আর আমি গ্যালারিতে দুটো চেয়ার দখল করলাম।

দেখতে দেখতে গোটা স্টেডিয়ামে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। বৃদ্ধবৃদ্ধা থেকে শুরু করে বালক-বালিকা পর্যন্ত সব বয়েসের লোক হাজির। কারুর কারুর হাতে—'এফ, এস, এল, এন' অর্থাৎ সান্দিনিস্তা মুক্তি ফ্রন্টের পতাকা। পতাকা নাড়ার বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করছি না। কার্লাকে দেখে এক তরুণ এগিয়ে এলেন বগলে 'ডাস ক্যাপিটালের' প্রথম খণ্ড। আলাপ হলো। জিজ্ঞেস করলাম: "মার্কস পড়ছো বুঝি ?" তরুণটি উত্তর দিলেন: "পরীক্ষা সামনে, তাই সময় পেলেই একটু দেখে নিচ্ছি।" খানিক পরেই তরুণটি পকেট থেকে ছোট একটা ব্যাজ বের করে সেটা আটকে নিলেন বুকের কাছে। উঁকি মেরে দেখলাম—সান্দিনোর ছবি আঁকা, আর লেখা: এফ, এস, এল, এন। এরকম ব্যাজ অনেকেরই নেই। নেই কার্লারও। আমার জিজ্ঞাসু মুখ দেখে কার্লা বললো—"এই ছেলেটি লড়াই করেছে। গেরিলা ছিল। সে-জন্যেই এই বিশেষ ব্যাজ।"

ভীড় বাড়ছে। পুলিশ বলতে গেলে নেই। সামরিক পোষাক পরা কিছু তরুণ-তরুণী রয়েছেন। জনা বিশেক। সকলে এক সংগেই বসেছেন। একটি ছেলে এগিয়ে এসে সবিনয়ে বললো: "আপনার ক্যামেরা আর কাঁধের ব্যাগটা যে একটু পরীক্ষা করা দরকার।"—সংগে নিয়ে গেল। কার্লা ছেলেটিকে সাবধান করে দিয়ে বলে উঠলো: "দেখো, ক্যামেরাগুলোর ভেতর ফিল্ম ভরা আছে কিন্তু।"

খানিক পরে ছেলেটি এসে বললোঃ "আপনি তো সাংবাদিক, তা গ্যালারিতে বসে কেন কম্পানিয়েরো, সামনে চলুন।" অতএব সামনে। সেখানে আরো কিছু ছেলেমেয়ে মাটিতে বসে। কার্লা জানিয়ে দিলো, এরা সকলেই সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। দেখে যা মনে হয়, কারুরই বয়েস বছর পঁচিশের বেশী নয়। তার মানে, সোমোসার ন্যাশনাল গার্ডের বিরুদ্ধে এরা যখন অস্ত্র ধরেছিল, তখন এদের বয়েস ছিল বড়জোর উনিশ-কুড়ি। জনাকয়েক যুবক হুইল-চেয়ারে বসে। কার্লা আর আমি মাটিতেই বসে পড়লাম।

এদিকে দু'পাশের গ্যালারিতে শ্লোগান শুরু হয়ে গিয়েছেঃ "আমাদের জয় হবেই", "সানদিনো জিন্দাবাদ"। একজন প্রথম অংশটা বলছেন, বাকি শয় শয় লোক দিচ্ছেন জবাব। মাঝেমাঝে হাততালি দিয়ে শ্লোগান চলছে। তালেতালে। কতকটা ছড়া কাটার মতো।

গ্যালারির এক পাশ থেকে কেউ একটা শ্লোগান দিল, অমনি ওপাশের গ্যালারির লোকেরা দিল তার জবাব। সংগে হাততালি। বেশ জমজমাট আসর। সকলেই চেঁচাচ্ছে। কার্লাও। একমাত্র আমিই কিছু বলছি না। বেশ অস্বস্তিকর। এক জায়গায় সবার দেখাদেখি আমিও ডান হাতটা মুঠি পাকিয়ে তুলে ধরলাম ওপরে।

কার্লা বলছিল কয়েকজন কমান্দান্তের আসার কথা। তাঁদের কিন্তু দেখা নেই। কার্লাকে জিজ্ঞেস করলাম অনুষ্ঠানটা কখন শুরু হবে। একগাল হেসে কার্লা জানালোঃ "কখন তা বলা মুশকিল। নিকারাগুয়ায় কিছুই সময় মতো শুরু হয় না।"

আমি বললাম, "কিছু আসে যায় না, আমাদের দেশেও রীতিটা একই রকম।"—বলতে-না-বলতে তুমুল হাততালি। সবাই দেখি উঠে দাঁড়াচ্ছে আর প্রবল বেগে হাততালি দিচ্ছে। দরজার কাছে, দেখছি, এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। গায়ে সামরিক পোষাক। তবে ব্যাজট্যাজ বা ডেকরেশন বিশেষ নেই। স্রেফ সৈনিকের পোষাক। তাঁর পাশেই একজন মহিলা। গায়ে একই ধরণের গেরিলা যোদ্ধার পোষাক। চমকে উঠলাম। ইনি সেই স্বনামধন্যা দোরা মারিয়া তেইয়েস্। ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে ২৫ জন অল্পবয়সী সানদিনিস্তা গেরিলা সোমোসার জাতীয় প্রাসাদটা দখল করে নিয়েছিলেন এক ঝটিকা-আক্রমণে। সোমোসার পুতুল-পার্লামেন্টের ৬০ জন সদস্যকে পণবন্দী রেখে গেরিলারা সেদিন আশিজন রাজবন্দীর (সানদিনিস্তা ফ্রন্টের এক অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কমান্দান্তে তোমাস বর্হেও ছিলেন তাঁদের মধ্যে) মুক্তি দাবি করেছিলেন। দাবির তালিকায় আরো ছিলঃ মুক্ত রাজবন্দীদের নিরাপদে দেশ ছেড়ে চলে যেতে দিতে হবে, দশ কোটি ডলার নগদ দিতে হবে, আর, নিকারাগুয়ার সবকটা কাগজে, বেতারে, টেলিভিশনে সানদিনিস্তাদের বৈপ্লবিক কর্মসূচী প্রচার করতে হবে।

আটাত্তোর সালের সেই দুর্দান্ত ও সফল গেরিলা আক্রমণের দু'নম্বর কমাণ্ডার ছিলেন এই দোরা মারিয়া তেইয়েস। তখন তিনি মাত্র বাইশ বছরের তরুণী। আজ তিনি গেরিলা কমাণ্ডারের পদ পেয়েছেন।

কমান্দান্তে দোরা মারিয়াকে দেখে আমিও ক্যামেরা মাটিতে রেখে তুমুল হাততালি দিতে লাগলাম। ছবি তোলা মাথায় উঠলো।

দোরা মারিয়ার পাশে ঐ দীর্ঘদেহী সুদর্শন পুরুষটি হলেন কমান্দান্তে বাইয়ার্দো আর্সে কাস্তানিয়ো। সান্দিনিস্তা ফ্রন্টের রাজনৈতিক কমিশনের প্রধান। দুই গেরিলা-কমাণ্ডারেরই হাবভাব দেখার মতো। টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ঋজু, বলিষ্ঠ। দেখেই মনে হয়, যে-কোনো মুহূর্তে এঁরা রাইফেল হাতে চলে যেতে পারেন পাহাড়ে জংগলে, গেরিলা লড়াই করতে।

দোরা মারিয়ার মুখে স্মিত হাসি। আর্সে কাস্তানিয়ো বেশ খোলাখুলি হাসছেন। হাততালি থামছে না। চলছে তো চলছেই। সেই সংগে শ্লোগান। জনতার এরকম স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা কতকাল দেখিনি (কোনদিন দেখেছি কি ?)।

খানিক পরে এক তরুণ এসে ঘোষণা করলেন কমান্দান্তে আর্সে কাস্তানিয়ো এবারে তাঁর বক্তব্য রাখবেন। এগিয়ে এলেন তিনি। আবার তুমুল করতালি। কয়েক মিনিট ধরে। আশপাশে তাকিয়ে দেখি অনেকেরই মুখে যেন ভালোবাসার হাসি। বাচ্চারাও লাফাচ্ছে। ছোট্ট একটি মেয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে কী যেন বলছে আমায় হাসতে হাসতে। হাততালি আর শ্লোগানের চোটে কিছুই শুনতে পাচ্ছিনা।

ভাষণ শুরু হলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক ভাষণ দিলেন আর্সে কাস্তানিয়ো। মার্কিন ও 'কন্ত্রা' (প্রতিবিপ্লবী) আগ্রাসনের কথা বললেন। জনগণের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথা বললেন। বললেন সান্দিনোর কথা। খানিকক্ষণ অন্তর যেই একটু থামছেন দম নেবার জন্য বা জলের গেলাসে চুমুক দেবার জন্য, অমনি সান্দিনিস্তাপন্থী শ্লোগান জুড়ে দিচ্ছে জনতা। দেখছি, গ্যালারির একেবারে ওপরে এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিচ্ছেন। সবাই তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন সমানে। মেয়েদের উৎসাহ-উদ্যম এখানে যেন ছেলেদের চেয়ে বেশী। —আবার ভাষণ শুরু, অমনি—এক লহমায়—জনতা সম্পূর্ণ নীরব। মন দিয়ে শুনছে সকলে। মাঝেমাঝে রসিকতা করছেন কমান্দান্তে। সকলে হেসে উঠছে হৈ হৈ করে। ভাষণ শুনে মনে হচ্ছে এক জনদরদী বিপ্লবী ইন্টেলেক্চুয়ালের কথা শুনছি। একের পর এক পরিসংখ্যান দিয়ে চলেছেন তিনি—উৎপাদনের ব্যাপারে, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে। আমদানি রপ্তানির বিষয়ে। দেশের যাবতীয় সমস্যার কথা অকপটে বলে চলেছেন আর্সে কাস্তানিয়ো। উত্তেজনা নেই তাঁর কণ্ঠে। রয়েছে উদ্বেগ, সংকল্প। আবেগের

বাড়াবাড়ি নেই। নেই শ্লোগানবাজী। একঘণ্টা পর ভাষণ শেষ হলো। এর মধ্যে সকলে জেনে গেলেন দেশের বর্তমান অবস্থা কী।

তারপর শুরু হলো নিকারাগুয়ার 'বিপ্লবের' গান। সবাই গাইছে, এক আমি ছাড়া। গানটা শুরু হলো একটু খাপছাড়া ভাবে। কিন্তু আধমিনিটের মধ্যেই মনে হলো সবাই যেন মহড়া দিয়ে নিয়েছে আগেভাগে। এবারে সকলে একসংগে গাইছে—এক সুরে, এক তালে। কোথাও ছন্দপতন হচ্ছে না। কেউ থামছে না। বেশ লম্বা গান। স্টেডিয়ামশুদ্ধ লোক যেন সারা দেশ, সারা দুনিয়া কাঁপিয়ে গাইছে। নিকারাগুয়ার 'মুক্তিযুদ্ধের, 'গণ-বিপ্লবের গান।

বিশে মে

সাক্ষাৎকার ঃ 'মোভিমিয়েন্তো দে আক্সিয়ন্ পপুলার মার্ক্সিস্তা-লেনিনিস্তা' অর্থাৎ 'মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট পপুলার এ্যাকশন মুভমেণ্ট'—এই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং সংসদ সদস্য কার্লোস কুয়াদ্রার সংগে।

এই দল হলো নিকারাগুয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি। এঁরা সান্দিনিস্তা-বিরোধী। পার্টির সদস্যসংখ্যা ছ'শো মতো। সংসদে এই পার্টির দুটি আসন। কার্লোস কুয়াদ্রা বললেন ঃ

"মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল গঠিত হয় ১৯৭২ সালে। সে-সময়ে সোমোসা প্রচণ্ড দমন অভিযান চালাচ্ছিলেন জনগণের ওপর। চলছিলো ব্যাপক গণহত্যা। সোমোসা বিরোধী দলগুলো তখন জনগণের আস্থা হারায়। অপরদিকে সান্দিনিস্তারা তখন গেরিলা যুদ্ধ চালাচ্ছেন। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তাঁদের কাজ তখন কাঁচা। শ্রমিকশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করার জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা পার্টি গঠন করেন।

"একটা জোরালো শ্রমিকফ্রন্ট সান্দিনিস্তাদের নেই। সান্দিনিস্তাদের পরিচালকমণ্ডলী ও তাঁদের ধ্যানধারণায় রয়েছে পাতিবুর্জোয়াসুলভ চিন্তা। শ্রমিকশ্রেণীকে তাঁরা ব্যবহার করতে চেষ্টা করছেন। এ-দেশের মেহনতী জনগণের মধ্যে শ্রেণীচেতনার কোনো দীর্ঘ ঐতিহ্য নেই। তাঁরা শোষিত, নিপীড়িত। কিন্তু সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তাঁরা সংগঠিত হননি দীর্ঘকাল। এখন অবশ্য সেই দুর্বলতা আর নেই। তাঁরা এখন সংগঠিত।

"সান্দিনিস্তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শ্রমিকরা ইদানিং একটু বিভ্রান্ত। কারণ একদিকে শ্রমিকরা চেষ্টা করছেন উৎপাদন বাড়াতে ও ডলার বাঁচাতে। আর অপরদিকে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন যে সান্দিনিস্তারা পাতিবুর্জোয়া মালিকদের হাতে ডলার তুলে দিচ্ছেন, তাঁদের তুষ্ট রাখতে। সান্দিনিস্তারা দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা পুরোপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত না করে, বেশ কিছু পুঁজিপতিকে পুষছেন যেন—বিশেষ করে শিল্পপতি আর খামারমালিকদের। মিশ্র অর্থনীতির কথা বলছেন তাঁরা। এর ফলে শ্রমিকশ্রেণী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। দেশের কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে শ্রমিকদের কোনো ক্ষমতা নেই। সান্দিনিস্তা বিপ্লবের এ-এক প্রকট দুর্বলতা।

"তবে এখন দেশ আক্রান্ত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আগ্রাসন চালাচ্ছে সমানে। তারা দক্ষিণপন্থীদের মদত জোগাচ্ছে। এ-অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী ও

পাতিবুর্জোয়াশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ—আক্রমণ ঠেকাতে ও বিপ্লবকে রক্ষা করতে।—মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাও এখন কয়েকটা ক্ষেত্রে সান্দিনিস্তা ফ্রন্টের সংগে সহমত। কিন্তু কোনো ব্যাপক ঐক্য নেই। দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁরা সংহতিবদ্ধ। সংসদে মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা সান্দিনিস্তাদের সমর্থন করে থাকেন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। তবে মতবিরোধ যথেষ্ট রয়েছে। যেমন, দু'দলই প্রথমে মিলিশিয়া গঠনের ব্যাপারে একমত ছিল : প্রতিরক্ষার জন্য মিলিশিয়াই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণসংগঠন। কিন্তু এখন সান্দিনিস্তা ফ্রন্ট মনে করছেন যে সেনাবাহিনীই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এ-ব্যাপারে একমত নন।

"মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা কাগজে-কলমে মার্কিন ও সোভিয়েত বিরোধী। কিন্তু কার্যত তাঁরা চেষ্টা করছেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে আরো ভালো করে বুঝতে।"

প্রশ্ন : সোভিয়েত ইউনিয়ন কি নিকারাগুয়াকে কব্জা করতে, বাগাতে চেষ্টা করছে?

কার্লোস : আমরা তা মনে করিনা। এ-মুহূর্তে তাঁদের ওরকম কোনো ফন্দি আছে বলে মনে হয় না। তবে দূর ভবিষ্যতে থাকতে পারে।

প্রশ্ন : কিন্তু ধরুন, নিকারাগুয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি নিজের প্রভাব পোক্ত করতে পারতো তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েতদের বেশ ভালো একটা ঘাঁটি হতে পারতো নিকারাগুয়া, তাই না?

কার্লোস : কেন? সে-জন্য তো কিউবা আছেই। নিকারাগুয়ার বিপ্লবকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর কোনো অভিপ্রায় রুশীদের এখনো নেই। তবে হ্যাঁ, তাঁরা আমাদের সাহায্য করছেন। এ-দেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা ও-দেশে যাচ্ছেন নানান কাজকর্ম শিখতে,—কোথাও একটা তো শিখতে হবে এইসব দরকারি কাজ। ওঁরা সেই সুযোগ দিচ্ছেন আমাদের।

প্রশ্ন : সান্দিনিস্তা কমান্দান্তেরা কি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী?

কার্লোস : না। তাছাড়া ফ্রন্টের ভেতরে মতবাদ-মতাদর্শের কোনো ঐক্যও নেই। এদিক দিয়ে সান্দিনিস্তারা ঐক্যবদ্ধ নন।

প্রশ্ন : আপনারা কি খোলাখুলি সমালোচনা করতে পারেন সরকারের?

কার্লোস : নিশ্চয়ই। মনে রাখবেন, নিকারাগুয়ায় গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল সোমোসা-একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে। সংগ্রাম কাকে বলে তার গভীর অভিজ্ঞতা আছে জনগণের। রাজনৈতিক ক্ষমতা কিভাবে লড়াই করে, রক্ত দিয়ে দখল করতে হয়, এ-দেশের জনগণ সেটা জানেন। এবং ক্ষমতার স্বাদও তাঁরা পেয়ে গিয়েছেন। এ-হেন জনগণের কণ্ঠ কোনো সরকারই কখনো রোধ করতে পারবেন না। কাজেই, এ-দেশের মানুষ, দরকার বুঝলে, সমালোচনা করবেই।

সেটা ঠেকায় কে ? মনে রাখবেন, কিউবায় যা হয় নি, নিকারাগুয়ায় তা হয়েছে—জনগণ লড়াই করতে শিখেছেন, জোটবদ্ধ হয়েছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ সান্দিনিস্তা ফ্রন্ট আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে যে সব মতপার্থক্য রয়েছে সেগুলো যদি তীব্র হয়ে উঠতে উঠতে এমন জায়গায় পৌঁছোয় যেখানে আলোচনা আর সম্ভব নয়, তাহলে কি এই দুই দলের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হওয়া সম্ভব ?

কার্লোস ঃ সে সম্ভাবনা যে একেবারে নেই, তা নয়। আমরা আজ কয়েকটা ব্যাপারে একমত। বিশেষত প্রতিবিপ্লবী শক্তি আর আগ্রাসী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই-এর ব্যাপারে। আমরা এ-বিপ্লবের সমর্থক এবং সান্দিনিস্তারা আমাদের শত্রু নন। বরং আমরা লড়াই করছি আমাদের সাধারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সব বিষয়ে আমরা তাই বলে একমতও নই।—

নিকারাগুয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির আপিসে কোথাও মার্কস বা লেনিন বা মাও কারুরই কোনো ছবি চোখে পড়লো না।

বিশে মে—বিকেল

নিকারাগুয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের সংগে সাক্ষাৎকার হবার কথা। লিদিয়ার সংগে পার্টি আপিসে গেলাম। এক সেক্রেটারি আপন মনে টাইপ করে চলেছেন। বেশ বড় মাপের আপিস। সেখানে মার্কস ও লেনিনের কয়েকটি অতিকায় ছবি। এতো বড় আকারের ছবি দেখলে আমি আবার একটু ভয় পেয়ে যাই। যাই হোক, কমিউনিস্ট পার্টির দপ্তরে ছবি, বই, পোস্টার, চেয়ার, টেবিল, টাইপরাইটার সবই রয়েছে ; নেই কেবল সম্পাদক মহাশয় বা অন্য কর্মকর্তারা। লিদিয়া বেশ বিব্রত ও বিরক্ত। সেক্রেটারিকে সে সোজাসুজি বলেই ফেললো : "এই কম্‌পানিয়েরো এতো দূর থেকে এসেছেন আমাদের দেশে, আমাদের কথা জানতে চাইছেন, আমরাও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে গেল দু'দিন ধরে বারবার টেলিফোন করে আজকের জন্য অ্যাপয়ন্টমেণ্ট পাকা করে রাখলাম, আর আপনাদের পার্টির লোকজন কেউ থাকলেন না, এটা কেমন হলো ?"

সেক্রেটারি বেচারি আমতা আমতা করে জানালেন কর্তারা যে যার বাড়ি চলে গেছেন, আজ আর ফিরবেন না।

কাজেই নিকারাগুয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কর্তাব্যক্তিদের সংগে মোলাকাত আর হলোনা সেদিন। পরেও হয়নি।

* * *

মানাগুয়ায় আবার কয়েকটা বই-এর দোকান ঘুরলাম। প্রথমেই চোখে পড়ছে মার্কস, এংগেল্‌স্ ও লেনিনের রচনা। রাশিরাশি। সোভিয়েত প্রকাশিত ছোটদের বই প্রচুর। বিশেষত রূপকথা। এগুলো, যথারীতি, ভারী সুন্দর।

মানাগুয়ার ইণ্টেলেক্‌চুয়ালদের এক নামজাদা আড্ডা হলো একটা কফি হাউস। তার ভেতরেই একটা বই-এর দোকান। সেখানেও মার্কস, এংগেল্‌স্ ও লেনিনের ছড়াছড়ি। স্তালিন ও মাও-এর বই এখানেও দেখছি না। চে'র ভাষণের একটা সংকলন আবার চোখে পড়লো। ইংরিজীতে। সানদিনিস্তা নেতাদের বক্তৃতা-সংকলন। এটাও ইংরিজী। 'দ্য গস্‌পেল্‌স্ অফ সোলেন্‌তিনামে' রয়েছে। এর্নেস্তো কার্দেনালের বিখ্যাত কীর্তি। থিয়োলজি অফ লিবারেশন বিষয়ে গুটি কয়েক বই। বিপ্লবী যোদ্ধাদের লেখা কবিতার বই। নিকারাগুয়ান লেখকের লেখা কোনো গদ্যের বই, প্রবন্ধের বই চোখে পড়ছে না। নিকারাগুয়ার লেখক মানেই যেন কবি।

ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস সেণ্টারের ছোট বই-এর দোকানে তোমাস বোর্হে'র একটা আলোচনা গ্রন্থ দেখেছিঃ সান্দিনিস্তা বিপ্লব বিষয়ে। কার্লোস ফন্সেকার রচনার একটা সংকলনও চোখে পড়েছে।

নাটকের বই একটাও দেখছি না। এক কম্পানিয়েরোর আপিসে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ব্রেশ্‌টের নাটকের ওপর লেখা একটা আলোচনা গ্রন্থ দেখেছিলাম। সংস্কৃতি-মন্ত্রণালয়ে লুইসার ঘরে দেখেছি লেনিন ও মার্কস। লুইসা ও কার্লা বললো, বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কস ও লেনিন পড়তে হয়।

গদ্যের অভাবটা বেশ চোখে পড়ে। গুটি কয়েক গদ্যশিল্পী লিখছেন বটে। কিন্তু কবিতার দুর্দান্ত তুফানের মুখে তাঁদের মুষ্টিমেয় কীর্তি যেন কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছে। সের্হিয়ো রামিরেস ঔপন্যাসিক হিসেবে নাম-জাদা। অথচ কোনো দোকানেই তাঁর বই দেখছি না। শুনেছিলাম ওমার কাবেসা এ-দেশের আর-এক তুখোড় কাহিনীকার। কিন্তু দোকানের তাকে তাঁর বই কোথায়?

আজ দেখা করতে গেলাম এক 'ধর্মযাজকের' সংগে। নিকারাগুয়ার বিপ্লবে অনেক যাজকও সামিল। লাতিন আমেরিকায় গড়ে উঠেছে 'থিয়োলজি অফ লিবারেশন'। দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করছেন বেশ কিছু ধর্মযাজক শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। গড়ে উঠেছে 'গরীবদের গীর্জা'। যাঁর সংগে দেখা করার কথা, সেই 'পাদ্রে রাফায়েল আর্‌গন্‌ একজন লড়াকু যাজক।

এক খ্রীষ্টান সংগঠনের তিনি সভ্য। সংগঠনটির নাম: 'সেন্ত্রো একুমেনিকো আন্‌তোনিয় ভাল্‌দিভিয়েসো।'

সাইনবোর্ডে লেখা:

আল্‌ সের্‌ভিসিয়ো দে লা রেফ্লেক্‌সিয়োন ক্রিস্‌তিয়ানা এন লা নুয়েভা নিকারাগুয়া / In the Service of Christian reflexions in the New Nicaragua.

ভুল করে অন্য একটা দরজা দিয়ে ঢুকে দেখি একটা বই-এর দোকান। জনা পাঁচ-ছ লোক বই দেখছে। আমিও একটু দেখে নিলাম ঘুরে-ফিরে। থিয়োলজি অফ লিবারেশন বিষয়ে নানান বই। বিপ্লব, লাতিন আমেরিকায় গরীবদের অবস্থা, সামাজিক শোষণ ও শ্রেণীসংগ্রাম বিষয়ে লেখা বই থরে থরে সাজানো। বেশ কিছু বই রয়েছে মার্কসবাদ সম্পর্কে।

এবার ঠিক দরজায় প্রবেশ। ঢুকেই দেখি দেয়ালে অস্‌কার রোমেরোর ছবি ও বাণী। এল্‌ সাল্‌ভাদোরের বিশপ রোমেরোকে সে-দেশের দক্ষিণ-পন্থী ঘাতকবাহিনী খুন করেছে কয়েক বছর আগে, তিনি স্বদেশের সমাজে শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে, শোষিত জনগণের পক্ষে কথা বলতেন বলে। বিশপ অস্‌কার রোমেরো ছিলেন এক সমাজসচেতন, দরদী মানুষ। তাঁকে যে খুন করা হবে, এটা সাল্‌ভাদোরের সরকার ও মার্কিন সরকারের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'সি. আই. এ' আগে থেকেই জানতো। মার্কিন সরকার পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন এ-ব্যাপারে। ঐ সরকার এখন এল্‌ সাল্‌-ভাদোরের দক্ষিণপন্থী বোম্বেটেদের সাহায্য করছেন, কৃষকনিধনে ও ঢালাও গণঅত্যাচারের রসদ জোগাচ্ছেন।—অন্য দেয়ালে জার্মান ভাষায় লেখা একটা পোস্টার: 'ফ্যুর আইন ফ্রাইয়েস এল্‌ সাল্‌ভাদোর।'—এক মুক্ত এল্‌ সাল্‌-ভাদোরের জন্য।

আর-এক দেয়ালে একটা বড় প্রচারবোর্ড। তার ওপরে লেখা : 'নিকারাগুয়ায় বিপ্লব এগিয়ে চলেছে।'—বোর্ডে নানান আলোকচিত্র আর খবরকাগজ থেকে কেটে-নেওয়া অংশ সাঁটা। গেরিলাদের ছবি। বন্দুক হাতে মেয়ে, বৃদ্ধ কৃষক হাতে রাইফেল, পথের ধারে ছোট একটি মেয়ে অবাক চোখে চেয়ে, কৃষক চাষ করছেন ক্ষেতে. কফি তুলছেন মেয়েরা।

ধর্মযাজক রাফায়েল আর্‌গন্ এলেন। তরুণ অধ্যাপকের মতো চেহারা। ভাবুক ভাবুক। সাধারণ একটা ডোরা কাটা সার্ট আর একটা আধময়লা প্যাণ্ট পরা। নিজের পরিচয় দিয়ে একটু লাজুক লাজুক মুখ করে বললেন—"আমি ধর্মযাজকের কাজই করি, প্রধানত এই মানাগুয়ায়। এখন এক গরীব পল্লীতে কাজ করছি। এই গীর্জায় ও এই সংঘে আমরা সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে কাজ করি, এবং মার্কসবাদ ও খ্রীষ্টধর্মের চর্চা? করি।" Religion is opium

প্রশ্ন : মার্কসবাদ ও খ্রীষ্টধর্ম কোথায় মিলিত হতে পারছে বলে আপনারা মনে করেন? দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী?

রাফায়েল : নিকারাগুয়ায় একটা বিশেষ স্বকীয় ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। ধর্মযাজকরা সামিল হয়েছেন বিপ্লবে। এ-দেশের বেশীর ভাগ মানুষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মবিশ্বাসী। এই জনগণের অধিকাংশই অংশ নিয়েছেন বিপ্লবে। ফলে একটা বিশাল সমন্বয় ঘটে গিয়েছে। নিকারাগুয়ার জনগণের যে সংগ্রামী অভিজ্ঞতা, সেটা বাস্তবিক সংগ্রাম, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে, হাতেকলমে। এ-জন্য তাঁদের বই পড়তে হয়নি বা মার্কসবাদ ও খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসের পাঠ নিতে হয়নি। এই সমাজে বিপ্লব কিভাবে হতে পারে সেটা তাঁরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝে নিয়েছেন। কেতাবী ব্যাপার, বা পড়াশুনোর দিকটা এসেছে বিপ্লব সফল হবার পর, ক্ষমতা দখলের পর। এই যে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া, এর একটা দর্শন, একটা মতবাদ অবশ্যই ছিল। নতুন নিকারাগুয়ার জন্মের পেছনে তিনটি ধারা কাজ করে গিয়েছে। প্রথমত, পাহাড়ে জংগলে সান্দিনোর সশস্ত্র সংগ্রাম—যা ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও জাতীয়তাবাদী। দ্বিতীয় ধারাটি হলো খ্রীষ্টধর্মের। এবং নিগৃহীত মানুষের হয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম-যাজকদের লড়াই করার ঘটনা এ-দেশে নতুন নয়। এক সময়ে এ-দেশেরই ধর্মযাজক আদিবাসীদের পক্ষ নিয়ে স্প্যানিশ বিজেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন ও শহীদ হয়েছেন। সমকালে এই ঐতিহ্যের সংগে যুক্ত হয়েছে লাতিন আমেরিকায় খ্রীষ্টের বাণী এবং তার সামাজিক প্রাসংগিকতা ও গুরুত্ব নিয়ে নতুন ভাবনাচিন্তা। দ্বিতীয় ভ্যাটিকানের উদারপন্থী মনোভাব ও সমাজ-চিন্তাও উল্লেখযোগ্য এই পরিপ্রেক্ষিতে। সোত্তরের দশকে সোমোসা-একনায়ক-তন্ত্র আর নিকারাগুয়ার জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্বগুলো খুব তীব্র হয়ে ওঠে। দ্বন্দ্বগুলো ছিল অবশ্যই বৈপ্লবিক। এবং সমাজসচেতন, রাজনীতিসচেতন ধর্মযাজকরা

তাতে জড়িয়ে পড়েন। বিপ্লবের সব স্তরেই যাজকরা জড়িত ছিলেন। মুক্তির অন্বেষায় খ্রীষ্টধর্মবিশ্বাসের এই ধারা খুবই গুরুত্বময়।

তৃতীয় যে ধারা আমাদের নতুন সংস্কৃতির জন্য গুরুতপূর্ণ তা হলো মার্কসবাদ। মার্কসবাদকে আমরা একটা নিখিল দর্শন হিসেবে যতো না দেখেছি, তার চেয়ে বেশী দেখেছি ও দেখছি বিশ্লেষণের একটা পদ্ধতি ও হাতিয়ার হিসেবে। মার্কসবাদকে দেখছি আমরা একটা বিজ্ঞান, এক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি হিসেবে। এর সাহায্যে আমরা বাস্তব জগৎটাকে, আমাদের সমাজটাকে আরো ভাল করে, যুক্তিসংগতভাবে চিনতে ও বুঝতে পারছি।

এই তিনটি ধারা—সান্দিনোবাদ, খ্রীষ্টধর্ম ও মার্কসবাদ—এই তিনের সমন্বয়ে গড়ে তুলছি আমরা নিকারাগুয়ার মানুষ ও সমাজের জন্য এক নতুন চেতনা ও সংস্কৃতি। মার্কসবাদ থেকে নিয়েছি আমরা ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ, বিশ্লেষণ নির্ভর দৃষ্টিভংগী ও প্রগতিশীল দর্শন। শোষিত, নিপীড়িত মানুষ সম্পর্কে মার্কসবাদের যা বক্তব্য, ভাবের দিক দিয়ে তা খ্রীষ্টধর্মের মূল বক্তব্যের খুব কাছাকাছি বলে আমরা মনে করি। এবং সমাজের একটি বিশেষ অবস্থায় একশ্রেণীর মানুষ কেন শোষিত হয়, কিভাবে সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব হয়, কিভাবেই বা শোষণ ও বৈষম্য ঘুচিয়ে শোষিতদের মুক্ত করা যায়, এক নতুন শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলা যায়—এই চিন্তা মার্কসীয় চিন্তার মূলে যেমন,—তেমনি দরিদ্রদের অভাবমোচন, শোষকশ্রেণীর বিলোপ-সাধন এবং গোটা সমাজ ও সকল মানুষের পার্থিব ও আত্মিক মুক্তি অর্জন—এটা খ্রীষ্টধর্মের গোড়ার কথা। কাজেই এই মৌলিক দিক দিয়ে মার্কসবাদ ও খ্রীষ্টধর্ম,—বিশেষ করে গরীবদের গীর্জার নিজস্ব দর্শন পরস্পরের আত্মীয়। সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে এই নতুন চিন্তাধারা প্রগতিশীল গীর্জা ও যাজক-সম্প্রদায়ের এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

সান্দিনোবাদ আমাদের এক নিজস্ব পরিচিতি দান করেছে। সান্দিনোর চিন্তাধারা ও সংগ্রাম থেকে জন্ম নিয়েছে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র সম্পর্কে মর্যাদাবোধ, এক বিশিষ্ট আত্মপরিচিতি— এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা।

এই সবকিছুর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে মুক্ত নিকারাগুয়ার জনগণের এক নতুন সংস্কৃতি।

মার্কসবাদ ও মার্কসীয় চিন্তাভাবনা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ তীব্র। প্রতি বছর জুলাই-আগস্ট মাসে মার্কসবাদ ও খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে নিকারাগুয়ায় ঢালাও আলোচনাসভা বসে। ইতালীয় পণ্ডিত, কম্পানিয়েরো জুলিয়ো জিরার্দি প্রতি বছর তিনমাসের জন্য নিকারাগুয়ায় আসেন—মার্কসবাদ ও খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে গবেষণা করতে। পুরো ব্যাপারটা খুবই জীবন্ত। মার্কসবাদ, খ্রীষ্টধর্ম ও সান্দিনোবাদ এই তিনের পারস্পরিক সম্পর্ক, আমাদের সমাজে এগুলোর ভূমিকা ও তাৎপর্য বিষয়ে আমরা যে গবেষণা করেছি তার ফলাফল, সেইসব

লেখা পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হতে চলেছে। আমি মনে করি আমাদের জন্য এই কাজ অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, লাতিন আমেরিকায় যে মুক্তিসংগ্রাম চলছে. খ্রীষ্টধর্মের মানবিক, কল্যাণময় মূল্যবোধগুলোকে জনগণের সেই সংগ্রামে সামিল করা দরকার, যাচাই করে নেওয়া দরকার। এই বিশাল মহাদেশের বেশীর ভাগ মানুষ খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী এবং সামাজিক অন্যায় অবিচার. শোষণ, নিপীড়ন দূর করার জন্যেই তাঁরা মুক্তিসংগ্রাম করছেন।

মার্কসবাদ সম্পর্কে আমাদের আগ্রহটা যে নিছক কেতাবী নয়, বুঝতেই পারছেন। লাতিন আমেরিকার বিশেষ পরিস্থিতিই এই আগ্রহের জন্ম দিয়েছে। 'লিবারেশন থিয়োলজি' কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা আলোচনা সভায় তৈরী হয় নি। যাজকবৃত্তি করতে গিয়ে, গরীব লোকদের সংগে শোষিত অবহেলিত জনগণের মধ্যে যাজকের কাজ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাতিন আমেরিকার অনেক ধর্মযাজকের হয়েছে, তা থেকেই এগিয়ে গিয়েছি আমরা মার্কসবাদের দিকে। আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছেঃ এই যে এতো অসংখ্য মানুষ যুগ যুগ ধরে শোষিত দারিদ্রের, ক্ষিধের, অসুখ-বিসুখের শিকার, এর কারণ কী? কেন এরা নিঃসম্বল. কেন এরা চরম দুর্দশাগ্রস্ত. কেন এদের কোনো উন্নতি হতে পারছে না. কেন এরা বেকার. গরীব, শোষিত এবং অবহেলিত? কেন এরা সমাজের অপর প্রান্তে বাস করছে? এইসব 'কেন'র উত্তর খুঁজতে গিয়ে, সমাজ অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ে ভাবতে গিয়ে, সামাজিক কাঠামো. শ্রেণী-ভাগ, শোষক-শোষিতের সম্পর্ক নিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে গিয়ে আমরা মার্কসবাদের কারণ নিয়েছি। কেন না মার্কসবাদ আমাদের বুঝতে সাহায্য করছে, কারণ-গুলো কী এবং সেগুলোকে দূর করে কিভাবে মুক্তির দিকে এগোনো যেতে পারে। কিন্তু এই যে কারণ-খোঁজার চেষ্টা, সমাজটাকে, শ্রেণীসমাজটাকে, আমাদের ভূখণ্ডের বাস্তব অবস্থাটাকে বোঝার এবং নতুন সমাজ গঠনের এই যে লড়াই, এগুলো শুরু হয়েছে যাজকবৃত্তি থেকে। কোনো ইণ্টেলেকচুয়াল অন্বেষা থেকে এর উৎপত্তি নয়। এ অতি রক্তমাংসের ব্যাপার, প্রাত্যহিক জীবনের ব্যাপার। নিত্যজীবনের লড়াই. অভিজ্ঞতা, বোধ এবং সংগ্রামই মার্কসবাদ ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সেতু রচনা করেছে।

প্রশ্নঃ লাতিন আমেরিকার অনেক ধর্মযাজকের এই যে নতুন উপলব্ধি, এই যে গরীবের গীর্জা গড়ে তোলা, এগুলো তো ভ্যাটিকানের মোটেও পছন্দ নয়। এবং যথেষ্ট বাদানুবাদ, টানাপোড়েন চলছে দুই শিবিরের মধ্যে। আপনার কি মনে হয়, এর ফলে পৃথিবীর এই অঞ্চলে একটা পৃথক চার্চের জন্ম হতে পারে?

রাফায়েলঃ দেখুন, বিশ্বের খ্রীষ্টানরা কোনদিনই পুরোপুরি একমত নন। নানান মতের ঘাত-প্রতিঘাত চিরদিনই ছিল, আজও আছে। এই গেল একদিক। অপর দিকে দেখুন, ইতিহাস পড়লে বোঝা যায় যে 'চার্চ'

অনেক কিছুই মেনে নিতে পারেনি ও চায়নি এক সময়ে। কিন্তু কালক্রমে সেই গোঁয়ার্তুমি ছাড়তে হয়েছে চার্চকে, নড়ে-চড়ে বসতে হয়েছে, আপোষ করতে হয়েছে। গ্যালিলিয়োর কথাই ভাবুন না। একসময়ে তাঁকে কি হেনস্তাই না হতে হয়েছে। চার্চ তাঁর তত্ত্ব মানেনি। কিন্তু পরে তো সেই মানতেই হলো। এখন তো আর কোনো পাদ্রি বা পোপ বলেননা যে পৃথিবী হলো কেন্দ্রবিন্দু আর সূর্য তার চারদিকে ঘুরে চলেছে।

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর যে অভ্যুত্থান, তাঁদের যে উদারনীতি, সেই খরস্রোতের মধ্যে ক্যাথলিক চার্চকে বাঁচতে হয়েছিল,—বিজয়ী বুর্জোয়া উদারনীতির সংগে মানিয়ে নিতে হয়েছিল নিজেকে। আমি মনে করি, বর্তমানে আমরা পরিবর্তন, ক্রান্তির এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে রয়েছি। ভ্যাটিকানের সংগে মতবিরোধ রয়েছে, সংঘাত রয়েছে। কিন্তু এ থেকে দুটো আলাদা চার্চ তৈরী হবে বলে আমি মনে করি না। মনে করিনা যে দুই শিবির সংঘর্ষের মনোভাব নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াবে।

প্রশ্ন : আপনি বলছেন বটে যে সংঘর্ষ হবে না, কিন্তু ভ্যাটিকান আর পোপ জন পল তো এদিকে ফাদার এরনেস্তো কার্দেনাল, তাঁর ভাই, আপনাদের শিক্ষামন্ত্রী ফাদার ফেরনেন্দো কার্দেনাল ও সান্দিনিস্তাপন্থী সকল ধর্মযাজককে মহা বকাবকি করছেন, তাঁদের ধিক্কার দিচ্ছেন, নিকারাগুয়ার বিপ্লবে তাঁদের ভূমিকার জন্য।?

রাফায়েল : এই যে সংঘাত, দেখুন, এটা কিন্তু চিন্তাধারার, ভাবধারার সংঘাত। বিশ্বাসের লড়াই এটা নয়। এরনেস্তো ও ফেরনান্দো দুজনেই বলেছেন যে পোপকে তাঁরা মান্য করেন। ভ্যাটিকান বলছেন, তাঁরা একটা নিয়ম ভংগ করেছেন। সেইজন্য এই তিরস্কার। ধর্মবিশ্বাস বা বিশ্বাস ও মর্যাদা নিয়ে কোনো বিবাদ নেই। বিবাদটা একটা নিয়ম, একটা বিধি নিয়ে। এটা, বলা যায়, আইনের ব্যাপার। পোপকে আমরা সম্মান করি। তাঁর যা বিশ্বাস, আমাদেরও তাইই বিশ্বাস। ঈশ্বর বা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভক্তি অটুট।

প্রশ্ন : আপনারা পোপকে মান্য করেন, এবং মনে করেন যে আপনারা বিশ্বচার্চের অংশ, সবই বুঝলাম। কিন্তু পোপ তো আপনাদের বিরুদ্ধে। দারুণ ধিক্কার দিয়েছেন তিনি আপনাদের। অতএব এরকম মনে হওয়া কি স্বাভাবিক নয় যে ভ্যাটিকান আর নিকারাগুয়ার সান্দিনিস্তা ধর্মযাজককুল এবং সেইভাবে দেখতে গেলে লাতিন আমেরিকার বিপ্লববাদী যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যে দুই চার্চের মধ্যে একটা বেশ বড় মাপের ফারাক তৈরী হয়ে গিয়েছে?

রাফায়েল : একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। অবশ্যই। কিন্তু সেই দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক। বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব সেটা নয়। পোপ এবং আমাদের বিশ্বাস অভিন্ন।

আমাদের মধ্যে তফাৎ হলো এই যে পোপের পছন্দ বুর্জোয়া সমাজ, আর আমরা চাইছি এক বৈপ্লবিক সমাজ। কাজেই দ্বন্দ্বটা একেবারেই রাজনৈতিক।

প্রশ্নঃ মানলাম। কিন্তু এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থেকেই কি লাতিন আমেরিকায় একটা আলাদা, স্বতন্ত্র চার্চের জন্ম হতে পারে না?—যে চার্চ গরীব মানুষের, শ্রমিক ও সর্বহারা শ্রেণীর পাশে দাঁড়িয়ে, তাঁদের সংগ্রামে সামিল হয়ে ভ্যাটিকান থেকে একেবারে আলাদা হয়ে যাবে? এটা কি সম্ভব?

রাফায়েলঃ এটা সত্যি যে ভ্যাটিকান এখন দক্ষিণপন্থী রাজনীতির সমর্থক, মার্কিন সরকারের কট্টর দক্ষিণপন্থী নীতির সমর্থক। এবং এটাও সত্যি যে আমরা আমাদের সমাজে আমূল পরিবর্তন চাই, বিপ্লব চাই, মুক্তি চাই। মনে রাখা দরকার, খ্রীষ্টের বাণী তো দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের জন্য মুক্তির শুভ খবর। তাই যদি হয় তো আমরা ভুল পথে নেই। ঠিক পথেই চলেছি আমরা। কেউ কেউ মনে করেন যে ভ্যাটিকানের দক্ষিণপন্থা ও বিত্তপ্রীতি এবং আমাদের বিপ্লববাদের মধ্যে ফারাকটা এতোই বড় যে এ থেকে একদিন পূর্ণ বিচ্ছেদ দেখা দিতে পারে। মার্টিন লুথারের সংগে যেমন হয়েছিল এককালে। আমাদের দুই শিবিরের মধ্যে টানাপোড়েন বাড়ছে বই কমছেনা। ভবিষ্যতে কী হবে তা কে বলতে পারে? তবে সেই দুঃখজনক পরিণতি আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই না।

প্রশ্নঃ সাধারণত মনে করা হয় যে যীশুর ধর্ম শান্তির, অহিংসার ধর্ম। আপনারা ধর্মযাজক হয়েও সশস্ত্র বিপ্লব ও অভ্যুত্থানের সমর্থক। অর্থাৎ হিংসার আশ্রয় নিচ্ছেন আপনারা। দুটোকে মেলাচ্ছেন কী করে?

—তরুণ ধর্মযাজক রাফায়েল আর্‌গন্‌ স্মিত হাসলেন এই প্রশ্ন শুনে। তারপর বললেনঃ

সন্দেহ নেই যীশুর বাণী শান্তির বাণী, এবং নীতিগতভাবে অহিংসার বাণী। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রয়োজনে হাতিয়ার ব্যবহার, বলপ্রয়োগও যে খ্রীষ্টধর্মে স্বীকৃত তার প্রমাণ বাইবেল-এ নেহাৎ কম নেই। অন্যায় ও পাপ দূর করার জন্য ঈশ্বর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন। মোসেসও ছেড়ে কথা বলেননি। ডেভিড লড়াই করেছেন গলিয়াথের বিরুদ্ধে। দেখুন, শ্রেণীসমাজে গরীবদের ওপর যে চূড়ান্ত অন্যায় অবিচার চলে, যে শোষণ চলে অবিরত, সেই পাপ অতি হিংসাত্মক পাপ। এবং বড়লোকের, উচ্চ শ্রেণীর এই শোষণ, অবিচার এক প্রাতিষ্ঠানিক হিংসা। এর বিরুদ্ধে গরীব লোকের লড়াই, সর্বহারার সশস্ত্র সংগ্রাম বৈধ, নীতিসম্মত। কারণ, সর্বহারা শ্রেণী যদি মুখের কথায় মুক্তি চায়, যুক্তি দেখায় তো সে মুক্তি পাবে না। শাসক-শোষক শ্রেণী সেই সুযোগ দেবেনা। আত্মরক্ষার জন্য, বিপন্ন আক্রান্ত অবস্থায় নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য অস্ত্র ধারণ করা ও আক্রমণকারীকে বধ করা কোন-

মতেই 'অধর্ম' নয়, 'নীতিগর্হিত' নয়। সর্বহারাশ্রেণী, গরীবরা শ্রেণীসমাজের অস্ত্রে আক্রান্ত, তাই তারা মরিয়া হয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করছে। এটাই সুনীতি। আমরা নিকারাগুয়ায় ও গোটা লাতিন আমেরিকায় সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক এই কারণেই। আমরা 'আক্রান্ত। আজও 'মার্কিনী 'সাম্রাজ্যবাদীরা সমানে আমাদের ওপর অন্যায় আক্রমণ চালাচ্ছে। প্রচণ্ড হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে তারা আমাদের বিরুদ্ধে। এ-অবস্থায় আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ, বিপ্লবকে বাঁচানোর জন্য, 'বিপ্লব করার জন্য' সশস্ত্র সংগ্রাম সব অবস্থাতেই 'যুক্তিসংগত,' বৈধ ও নীতিসম্মত।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সংগীত বিভাগের পরিচালক আল্‌ফ্রেদো বার্‌রেরার সংগে সাক্ষাৎকার। আল্‌ফ্রেদো বার্‌রেরা এক তরুণ কণ্ঠশিল্পী। দীর্ঘকাল তিনি ইউরোপিয় উচ্চাংগ সংগীত, অপেরার গায়নশৈলী ইত্যাদি শিখেছেন। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে তাঁর ঘরে ঢুকেই দেখি বেটোফেনের একটি আবক্ষ মূর্তি রাখা। একপাশে একটি গিটার।

প্রশ্ন ঃ সোমোসার আমলে নিকারাগুয়ায় সংগীতের অবস্থা কেমন ছিল?

আল্‌ফ্রেদো ঃ দেখুন, সব দেশেরই মানুষ বহু যুগ ধরে কোনো-না-কোনো ধরণের গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে চলেছে। নিকারাগুয়াতেও নিজস্ব লোক-সংগীত, পল্লীসংগীতের একটা ধারা ছিল। আপনি তো জানেনই, এ-দেশের ওপর একসময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল প্রভাব পড়েছিল। সেই প্রভাবটা, অবশ্যই, দেখা গিয়েছিল বিশেষ একটি শ্রেণীর মধ্যে। এইভাবে এ-দেশে বিদেশী যন্ত্রপাতির সংগে বিদেশী বই আর রেকর্ডেরও আমদানি হয়। ইউরোপিয় সংগীতের ধাক্কা লাগে নিকারাগুয়ার বিশেষ একটি শ্রেণীর সাংস্কৃতিক রুচিতে। এবং কোনো কোনো পরিবার ঐ সংগীতের চর্চা শুরু করে দেন। যন্ত্রী ও কণ্ঠশিল্পীরা বেরিয়ে আসেন ঐসব পরিবার থেকে। এমনও দেখা যেতো যে একটা গোটা পরিবারই অর্কেস্ট্রা বাজাচ্ছেন। এই-ভাবে নিকারাগুয়ায় এক ধরণের পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের ঘরাণা গড়ে ওঠে। সেকালে সংগীত বিষয়ে রীতিমতো অধ্যয়ন করার কোনো সুযোগ এ-দেশে ছিল না। সংগীত শিল্পীরা নিজেদের তাগিদে অল্পবিস্তর শিখতেন। কিন্তু মূলত ছিলেন তাঁরা জাতশিল্পী। কানে শুনে আর মন থেকে বাজাতেন। বিদেশী যেসব 'ওয়াল্‌ৎস্' বা 'পোল্‌কা' তাঁরা শুনতেন, সেগুলোই বাজাতেন তাঁরা মনের আনন্দে। কিন্তু সংগীতকে এ-দেশের মানুষ তখনো পেশা হিসেবে দেখতে শুরু করেননি। সংগীতকে পেশা বানিয়ে খাওয়া-পরার রীতি সেকালে ছিল না। সে সুযোগও ছিল না।

তাছাড়া, বেশ কিছু সংগীত শিল্পী ছিলেন গরীব। তাঁরা হয়তো আজ কোনো গীর্জায় ধর্মীয় সংগীত পরিবেশন করছেন, কাল হয়তো তাঁরা কোনো-এক শহরে গুটি কয়েক ছাত্রকে পিয়ানো শেখাচ্ছেন,—এইভাবে কায়ক্লেশে দিন চলতো অনেকের।

সোমোসার আমলেও সংগীত শিল্পী হয়ে সমাজে নাম করা' বা মোটা টাকা বানানোর কোনো রীতি গড়ে ওঠেনি। সংগীতকে তেমন গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। একটা ছোট স্কুল ছিল। তার নাম ছিল গালভরা ঃ 'কন্‌সারভেটরি' আসলে সেটা ছিল ছোট্ট একটা স্কুল। সোমোসা কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপ থেকে কিছু সংগীত শিল্পীকে টাকা দিয়ে নিয়ে আসতেন। তাঁরা ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। জনা তিরিশেক শিল্পীর একটা ছোট সিম্‌ফনি অর্কেস্ট্রা গড়ে উঠেছিল এইভাবে। এই শিল্পীরা সামান্য কিছু নিকারাগুয়ান সংগীত বাজাতেন। কিন্তু তাঁদের শিক্ষা, চিন্তা, অনুশীলন ও অনুষ্ঠানের বেশীর ভাগ জুড়েই ছিল 'আন্তর্জাতিক সংগীত' যা কিনা বিদেশী, যেমন চাইকভ্‌স্কি বা ব্রাম্‌স্‌-এর রচনা।

সংগীতে সৃজনশীলতার নামগন্ধ ছিলনা। ছিলনা কোনো নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা। এবং শিল্পীদের মাইনে ও মজুরিও ছিল ভীষণ কম। সমাজে তাঁদের কোনো মর্যাদা তো ছিলই না, বরং বদনাম ছিল। ঐ শিল্পীদের আসল কাজ ছিল যে-কোনো অবস্থায় কিছু লোকের মনোরঞ্জন করা। লোকে হয়তো বসে বসে মদ খাচ্ছে, আর কয়েকজন শিল্পী তাদের সামনে গান-বাজনা করছেন—এই আর-কি। ফলে লোকে সংগীত শিল্পীদের ছোট চোখে দেখতো। 'তুমি গানবাজনা করো ?—তার মানেই তুমি মদ্যপ, লম্পট'—এরকম একটা মানসিকতা ছিল সোমোসার আমলে। অপরদিকে, এ-দেশে যে অল্পসংখ্যক 'শিক্ষিত' দক্ষ সংগীতশিল্পী ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কোনো স্বাধীন, স্বতন্ত্র, বা সংগীতের দিক দিয়ে বৈপ্লবিক মনোভাব অথবা স্বপ্ন ছিলনা। গোটা জিনিষটাই ছিল অনুকরণনির্ভর ও প্রাণহীন।

প্রশ্ন ঃ নিকারাগুয়ার গণ-অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের সময়ে সংগীতের ক্ষেত্রে কী ধরণের পরিবর্তন দেখা গেছে ?

আল্‌ফ্রেদো ঃ রাজনৈতিক পরিবর্তন যখন এলো, গণ-সংগ্রাম যখন শুরু হলো, তখন সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরেই ঘটতে লাগলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এবং বৈপ্লবিক সংগীতও উঠে এলো নিকারাগুয়ার জনগণের মধ্য থেকে। লোকসংগীত থেকে উঠে এলো বৈপ্লবিক সংগীত।

প্রশ্ন ঃ এই 'লোকসংগীত' কথাটা একটু ব্যাখ্যা করবেন কি? এটা কি শুধু এ-দেশের 'পল্লীসংগীত'?

আল্‌ফ্রেদো ঃ না না, তা কেন হবে? গ্রাম ও শহর সর্বত্র লোকে যে গান স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাঁধে ও শোনে সেটাই লোকসংগীত। লোকসংগীতের নানান আংগিক আছে নিকারাগুয়ায়। একটাতে, যেমন, তিনজন শিল্পী গিটার বাজিয়ে গান করেন। এই আংগিক এসেছে মেক্সিকো থেকে। নিকারাগুয়া ছিল

স্প্যানিশ উপনিবেশ। দীর্ঘকাল। তাতে মেক্সিকান প্রভাবও ছিল। তারপর এলো উত্তর আমেরিকার প্রভাব। এই যে মূলত ইউরোপিয় সংগীত, এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এ-দেশের জনপ্রিয় লোকসংগীত। আমাদের লোকসংগীতের আদর্শগুলো—ঐতিহাসিক কারণেই—ইউরোপিয় বা উত্তর আমেরিকান। কাজেই আমাদের জনপ্রিয় লোকসংগীত কয়েকটা দিক দিয়ে মূলত ইউরোপিয় সংগীত। নিকারাগুয়ান লোকসংগীতের যে প্রাচীনতম নিদর্শন আমাদের হাতে রয়েছে, সেটা নাট্যসংগীত। এক ধরণের সনাতন লোকনাট্য আছে। তাতে নাচ আর গান থাকে। এ-ধরণের ব্যাপক-প্রচলিত লোকগীতিতেও পাবেন চোদ্দটা সুরের লাইন, আর তার কাঠামো, সুরপরম্পরা বা স্বরবিন্যাসের মূল ধাঁচটা ইউরোপিয়।

প্রশ্ন ঃ ধাঁচটা কি ইউরোপিয় গানের?

আল্‌ফ্রেদো ঃ ইউরোপিয় গানে মেলডির লাইন যেরকম হয়, এটা সেই রকম। কাঠামোটা ইউরোপিয়।

প্রশ্ন ঃ এ-দেশে যেসব ইণ্ডিয়ানের বাস,—যাঁরা কিনা এ-দেশের আদিবাসী,—তাঁদের গানগুলো কেমন?

আল্‌ফ্রেদো ঃ অনেকদিন আগে সংগীতজ্ঞ ধর্মযাজক মধ্য আমেরিকায় ঘুরে, যাকে বলে 'খাঁটি' ইণ্ডিয়ান-সংগীত সংগ্রহ করেছিলেন, তার স্বরলিপিও করেছিলেন। 'লেয়ন' এলাকার ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব গানের একটা সংকলন তিনি করে গিয়েছেন। সেই স্বরলিপিগুলো পড়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে 'খাঁটি' ইণ্ডিয়ান সুর সেগুলো মোটেও নয়। মূলত তা স্প্যানিশ সংগীত। সেই মূল উপাদানটা জারিয়ে এসেছে ইণ্ডিয়ানদের ভাবনায়, রুচিতে, মানসিকতায়। তাঁদের সংগীতচেতনা, বলা যায়, একটা ফিল্‌টারের কাজ করেছে মাত্র। জিনিষটা আসলে স্প্যানিশ। তবে তা গাওয়া বা বাজানো হচ্ছে ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব আংগিকে, ভংগিতে।—কাজেই, এ-দেশের জনপ্রিয় লোকসংগীতের বুনিয়াদে রয়েছে ইউরোপীয় সংগীত।

প্রশ্ন ঃ ইণ্ডিয়ানরা তাঁদের গানবাজনার জন্য কী ধরণের যন্ত্র ব্যবহার করতেন?

আল্‌ফ্রেদো ঃ সবচেয়ে জনপ্রিয় বাজনাটা আপনি নিশ্চয়ই নিকারাগুয়ায় এসে দেখে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। কাঠের তৈরী এক ধরণের 'সাইলোফোন' (Xylophone)—যার নাম 'মারিম্বা'। দু'ধরণের মারিম্বা ছিল এবং আজও আছে। একটা বড়, অন্যটা বেশ ছোট মাপের। এই ছোট মারিম্বাটাই লোক-শিল্পীদের বেশী পছন্দ, কারণ এটাকে কাঁধে নিয়ে বা বগলদাবা করে তাঁরা সহজেই চলাফেরা, ঘোরাঘুরি করতে পারতেন। পথে পথে, পাহাড়ে পাহাড়ে,

এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে। ইদানিং এই মারিম্বার সংগে যোগ করা হয়েছে দুটো ছোট গিটার। গিটার দুটোর কাজ হলো সংগত করা।

প্রশ্ন : ইণ্ডিয়ানদের মধ্য থেকে উঠে আসা এই যে লোকশিল্পী ও তাঁদের সংগীতের কথা আপনি বলছেন, শুনে মনে হচ্ছে এটা নিকারাগুয়ার গ্রাম অঞ্চলের ব্যাপার। এই সংগীত কি শহর অঞ্চলেও জনপ্রিয় ?

আলফ্রেদো : সোমোসার আমলে, বিপ্লবের আগে এই ধরণের লোক-সংগীতকে শহুরে লোকেরা অবহেলা করতো, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতো। কেন ? —না, এতো হলো গিয়ে গ্রাম্য শ্রমিকদের গান। বিপ্লবের আগে ইণ্ডিয়ান-দের যাবতীয় কাজ ও সৃষ্টিকে ভদ্রলোকশ্রেণী অপাংক্তেয়, তুচ্ছ বলে মনে করতো। কারণ ইণ্ডিয়ানরা তো ছিলেন গরীব চাষী, মজুর। তখন বুর্জোয়াশ্রেণীর খানাপিনার আসরে বা সৌখীন সংগীত আসরে এ-ধরণের লোকসংগীতের কদর হবে কোত্থেকে ? বিপ্লবের পর আমরা এ-দেশের লোকসংগীত, পল্লী-সংগীত, জাতীয় সংগীতকে মর্যাদা ও মূল্য দিতে শিখেছি। এটা শিল্পের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিপ্লবী নিকারাগুয়ায় দেশের জনগণকে, সাধারণ লোকেদের তাঁদের নিজস্ব সৃজনশীলতার জন্য ন্যায্য দাম দেওয়া হচ্ছে।

দীর্ঘকাল স্প্যানিশ বিজেতাদের উপনিবেশ ও তার মতবাদের প্রচণ্ড চাপে নিকারাগুয়ার ইণ্ডিয়ানদের কাছে তাঁদের নিজেদের কোনো দাম ছিল না। তাঁরা ভাবতেন, আমাদের জীবনের, সৃষ্টির কতোটুকুই বা দাম ! এমনকি দুই ইণ্ডিয়ানে ঝগড়া লাগলে তাঁরা পরস্পরকে "ইন্দিয়ো" বা ইণ্ডিয়ান বলে গাল দিতেন। এতোটা আত্মবিদ্বেষ, আত্মগ্লানি ছিল তাঁদের। এটা উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরিণাম। এই বিরাট চাপ ও বিকৃত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে দারুণ লড়াই করতে হচ্ছে আমাদের,—বিপ্লবের পর। আমাদের যে নিজস্ব লোক-শিল্প, লোকসংগীত (যা কিনা সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের সৃষ্টি), সেটাকে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে বসাতে গিয়ে, যথার্থ মূল্যায়ন করতে গিয়েও চালাতে হচ্ছে এই লড়াই।

প্রশ্ন : নিকারাগুয়ার জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম কি এ-দেশের সংগীতে প্রভাব ফেলেছে ?

আলফ্রেদো : এর উত্তর দিতে গিয়ে আমাকে টানতে হবে সাহিত্যের প্রসংগ। ভাষার প্রসংগ। এর্নেস্তো কার্দেনাল ও করোনেল উরতেচোর মতো কবিরা মোটামুটি চল্লিশ বছর আগে ভাষায় একটা বড় পরিবর্তন ঘটান। সে-সময়কার অধিকাংশ লেখক ছিলেন রুবেন দারিয়োর নিষ্ফল অনুকরণে ব্যস্ত। এক অবক্ষয়ী "মদের্নিস্মো" (modernism) তখন গ্রাস করে বসে ছিল নিকারাগুয়ার সাহিত্য। কার্দেনাল, উরতেচো এ'রা সেই নিষ্প্রাণ চক্র থেকে

বেরিয়ে এলেন। তাঁরা লিখতে শুরু করলেন সুনির্দিষ্ট, বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে। তাঁরাই প্রথম এ-দেশের ঐতিহ্য নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করলেন। কার্দেনাল, পাব্লো আনৃতোনিয় কুয়াদ্রা, উর্তেচো এ'রা সাহিত্যের জন্য একটা নতুন ভাষা গড়ে তুলতে লাগলেন নিকারাগুয়ার মানুষের দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহার করে। প্রাত্যহিক জীবনের সোজাসাপ্টা কথাগুলো বলতে শুরু করলেন তাঁরা রোজকার জীবনে ব্যবহার করা ভাষায়। নান্দনিকতা, কল্পনার ফেনা, উপমা-অলঙ্কারের বাহুল্য পরিহার করে। ভাষার ক্ষেত্রে এই যে পরিবর্তন, নিকারাগুয়ার সংস্কৃতির পক্ষে এটা ছিল অতি গুরুত্বময়।

আমরা, সত্যি বলতে, সেই প্রথম টের পেলাম যে স্রেফ আটপৌরে ভাষায়, আমাদের মুখের ভাষায় খুবই জরুরী, প্রয়োজনীয় কথা বলে দেওয়া যায় কবিতায়, সাহিত্যে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আবার সেই একই সময়ে বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। কবিতায় যে সহজ, অনাড়ম্বর উচ্চারণ, স্পষ্টভাষণ সম্ভব, সোজা কথাটা সোজাসুজি বলে দেওয়া সম্ভব, এই উপলব্ধি সামাজিক দিক দিয়ে সহজেই হাত মেলালো রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার সংগে। কারণ সেই দাবি-গুলোও তো অতি বাস্তব, রক্তমাংসের ব্যাপার। সুনির্দিষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, সোজাসাপ্টা।

যাঁরা গান করছিলেন সেই সময়ে তাঁরাও এর প্রভাবে আটপৌরে মুখের কথায় বাঁধতে লাগলেন নতুন ধরণের গান। নিত্য জীবনের মোদ্দা কথাগুলো তাঁদের মুখ দিয়ে এবার বেরোতে লাগলো তাঁদের মুখের কথার মাধ্যমে, গান হয়ে।

মুক্তিসংগ্রাম চলাকালে নিকারাগুয়ার দিকে দিকে এ-ধরণের অসংখ্য গান বাঁধা হতে লাগলো। তার কতো বিচিত্র বিষয়, উপজীব্য। কিভাবে বন্দুক সাফ করতে হয়, কিভাবে বোমা বানাতে হয়, কিভাবে যতো রাজ্যের কাজ করা হয়—সমস্ত বিষয় নিয়েই গান আছে। এমনকি, দরকারি টেলিফোন নম্বরগুলো মনে রাখার জন্যেও গান বাঁধা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের গানগুলো দারুণ জনপ্রিয়। কারণ সাধারণ লোকে এগুলো তৈরী করেছে। এইসব গান নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের কথা বলে, বাস্তব পরিস্থিতির কথা বলে। প্রাত্যহিক জীবনের সংগে ওতপ্রোত জড়ানো এইসব গান।

নাটকও তৈরী হয়েছে এইভাবে। সকালে সোমোসার সৈন্যদের সংগে লড়াই হলো। বিকেলে বা সন্ধ্যেবেলা সেই লড়াইটাকে কেন্দ্র করে নাটক করা হলো। লড়াই সম্পর্কে জনগণের মনে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হলো অভিনয়ের মাধ্যমে।

অনেক সময়ে গান রচনার কাজও চলেছে একই পদ্ধতিতে। যিনি গেরিলা-

যোদ্ধা, তিনিই গীতিকার। বেলায় একচোট লড়াই হয়ে গেল সরকারি সৈন্যদের সংগে। সন্ধ্যের দিকে ফুরসৎ হলেই গেরিলারা বসে গেলেন দু'তিনটি গিটার হাতে। মুখে মুখে গান লেখা হলো বেলার সংগ্রামী অভিজ্ঞতার ওপর, সুরও দেওয়া হলো। তারপর সেই গান শিখিয়ে দেওয়া হলো অন্য গেরিলাদের। মুখে মুখে ফিরতে লাগলো সেইসব গান। গেরিলারা যেসব লোকজনের আশ্রয়ে ও সাহায্যে লড়াই করেছেন, তাঁরাও শিখে গেলেন গানগুলো।

অনেক পরে, ক্ষমতা দখলের পর এইসব গান লিপিবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা, রেকর্ড করা হয়েছে। অবস্থা ও সময়ের হেরফেরে একই গান পেয়েছে নানান বিচিত্র রূপ। কারণ হাতের কাছেই আরো জরুরী কোনো কাজ অপেক্ষা করছে। সেই কাজ ফেলে রেখে, বসে বসে গানের কথা বা সুর মুখস্থ করাটা কোনো কাজের কথা নয়। তাই লোকমুখে ফিরতে ফিরতে, নানান বিচিত্র ও সংগ্রামী অবস্থা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে গানগুলো পেয়েছে নানান আকৃতি। এগুলো ভারি মজাদার।

সশস্ত্র গণসংগ্রাম চলাকালে যেসব গান রচিত হয়েছিল, তারই ভেতর থেকে উঠে এসেছে নিকারাগুয়ার 'নতুন গান'। 'নিউ সং'।

সোমোসার আমলে একাধিক শিল্পীদল বৈপ্লবিক গান, সংগ্রামের গান গাইতেন। তাঁদের জেলে পোরা হতো। অত্যাচার, নির্যাতন চলতো তাঁদের ওপর। আপনি তো জানেনই যে এদেশের বহু রাজনৈতিক কর্মী ও বিপ্লবীকে খুন করা হয়েছে, বন্দী অবস্থায় যাচ্ছেতাই নির্যাতন করা হয়েছে সোমোসার আমলে। কিন্তু মনে রাখবেন, সাংস্কৃতিক কর্মীদেরও মার খেতে হয়েছে, জেল খাটতে হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শিল্পী, কবি, গীতিকাররা ছিলেন। এই যে তীব্র সংগ্রামী সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, এরই মধ্যে রাখা ছিল নিকারাগুয়ার 'নতুন গানের' বীজ। আজকের গায়ক গোদোই বা শিল্পীদল 'মানকোতাল'—এঁরা এবং আরো অনেকে এই 'নতুন গান' আন্দোলনের প্রতিভূ। 'নতুন গান' হলো সামাজিক দিক দিয়ে প্রাসংগিক গান। সমাজের বাস্তব প্রসংগই এই গানের বিষয়।

প্রশ্ন : মনে হচ্ছে আপনি গানের 'কথা', 'লিরিকের' কথা বলছেন। সংগীত, সুরের দিক দিয়ে দাঁড়াচ্ছে কিরকম জিনিষটা।

আল্‌ফ্রেদো : সুরের দিক দিয়ে তাঁদের যা প্রয়োজন, সেটা তাঁরা নিয়েছেন লোকসংগীত, জনপ্রিয় সংগীত থেকে। দেখুন, লোকসংগীতই আমাদের জনপ্রিয় সংগীত, জনতার সংগীত। তারই আবহে নতুন কম্পোজিশন করছেন শিল্পীরা, নতুন সুর বাঁধছেন।

প্রশ্নঃ সোমোসার আমলে, বিপ্লবের আগে যেসব গান ও সুর জনপ্রিয় ছিল, সেগুলোর কি হলো?

আল্‌ফ্রেদোঃ দেখুন, 'নিউ সং' আন্দোলনে সুর করতে গিয়ে শিল্পীরা শরণ নিচ্ছেন লোকসংগীতের। জনপ্রিয় সংগীতের যেসব পোষাকী সংগীত-রীতি ছিল, সেগুলো এড়িয়ে চলা হচ্ছে। আজকের নতুন শিল্পীরা তাঁদের সুর, 'থিম', বিষয় খুঁজে নিচ্ছেন ক্যারিবিয়ান অঞ্চল আর লাতিন আমেরিকায় প্রচলিত জনপ্রিয় সংগীত, লোকসংগীত থেকে। একটা মিশ্রণ ঘটে চলেছে। মাঝে মাঝে আপনি হয়তো শুনবেন কিউবান সংগীতের ব্যঞ্জনা। ভেনেজুয়েলার সংগীতের প্রভাবও পেতে পারেন। অনেক সময়ে বেশ পুরোণো বা প্রচলিত কিছু সুর নতুন আংগিকে, নতুন ভাবনা দিয়ে সাজানো হচ্ছে, 'অ্যারেঞ্জ' করা হচ্ছে। নতুন বিন্যাসে সাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে পরিচিত সুর। 'পোল্‌কা' ছন্দেও 'নতুন গান' বাঁধা সম্ভব। খুবই আন্তর্জাতিক মনোভাব নিয়ে, খোলা মন নিয়ে কাজ করছেন শিল্পীরা। মনটাকে খোলা রাখতেই হবে, কারণ বহু শিল্পী ও গায়ক-বাদক একযোগে কাজ করছেন 'নিউ সং' নিয়ে। সহযোগিতা করে চলেছেন। লাতিন আমেরিকার বহু শিল্পী তাঁদের দেশে দেশে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত। তাঁরাও আজ কাজ করছেন নিকারাগুয়ার শিল্পীদের সংগে। কাজেই পটভূমি ও কাজের ক্ষেত্রটা খুব বড়। এখানে উদার মনে, খোলা মনে, সহযোগীর মন নিয়ে কাজ না করলেই নয়।

প্রশ্নঃ বিপ্লবীরা কি সংগীতের কোনো মাপকাঠি ঠিক করেছিলেন, বা আজকের বিপ্লবী সরকার কি কোনো মান বেঁধে দিয়েছেন,—যে বৈপ্লবিক সংগীত এইরকম হতে হবে?

আল্‌ফ্রেদোঃ না। একেবারেই না। আমরা শুধু দেখতে চেষ্টা করছি কতো ধরণের সংগীতশিল্পী আমাদের দেশে রয়েছেন। কেউ পেশাদার, কেউ অপেশাদার। সংগীতসৃষ্টির প্রেরণা আসছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক পরিস্থিতি থেকে। তরুণ শিল্পীরা একটা কথা স্পষ্ট জানেনঃ খুব সুনির্দিষ্ট, বাস্তব বিষয়ের কথা বলতে হবে সংগীতে, গানে। প্রাসংগিক বিষয়ের কথা বলতে হবে। রোমান্টিক গানও রয়েছে। কেউ হয়তো তার প্রেম, প্রেমিক বা প্রেমিকার কথা বলতে চাইছে কোনো গানে। কিন্তু সেই বক্তব্যটা স্পষ্ট, বাস্তবিক হওয়া চাই। আবার সেইসংগে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা ও বুর্জোয়াদের ক্রিয়াকলাপ, তাদের পরিস্থিতি নিয়েও অসংখ্য গান বাঁধা হচ্ছে। এইসব গান হলো বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি থেকে শিক্ষা নেবার প্রচেষ্টা। এগুলো হাতিয়ারের মতো। সামাজিক হাতিয়ার।

প্রশ্ন ঃ 'নিউ সং', 'নতুন গান' মানেই কি রাজনৈতিক গান? প্রেমের গানও কি 'নতুন গান' বলে গণ্য হতে পারে?

আল্‌ফ্রেদো ঃ 'আলবৎ। নিশ্চয়ই হতে পারে। 'নতুন গান' মানেই যে রাজনৈতিক গান, তা নয়।

প্রশ্ন ঃ আমি স্পষ্ট জানতে চাই 'নতুন গানের' ন্যূনতম শর্ত কী?

আল্‌ফ্রেদো ঃ সমাজের

সম্পর্কে একটা স্পষ্ট বোধ যেন গানে ধরা দেয়। এবং সমাজের ভেতরে তো আপনি সব কিছুই পেয়ে যাবেন। সমাজের সমস্তটা, গোটা সমাজটাই যখন বিপ্লবের অন্তর্গত, তখন আপনি যে-কোনো বাস্তব অবস্থার কথা বা অনুভূতির কথা বললে সেটা তো বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভেতরেই থাকছে, তাই না? শর্ত চাপানোর দরকারটা কী? আপনি যদি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, সবকিছুই তো রাজনীতির অংশ। এমনকি ভালোবাসাও। কারণ এক নতুন সমাজ গড়ে তোলার জন্য তো হাতিয়ার হিসেবে ভালোবাসাই দরকার। কাজেই বিপ্লবে ভালোবাসার একটা রাজনীতি, একটা রাজনৈতিক মাত্রা থাকতে পারে। বিপ্লবী হিসেবে নিকারাগুয়ার সংগীতশিল্পীরা নিজেরাই নিজেদের ওপর এই একটিমাত্র শর্ত আরোপ করছেন ঃ বাস্তবিকই যা ঘটছে, যে বাস্তব অবস্থার জন্য আমার মনে একটি বিশেষ ভাব বা অনুভূতি জাগলো, সেটাকেই সোজাসুজি গানে ফুটিয়ে তোলা।

প্রশ্ন ঃ আপনারা এমন একটি দেশের খুব কাছাকাছি রয়েছেন, যে দেশটি আপনাদের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসন চালাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ঐ দেশের এক বিশাল সাংস্কৃতিক প্রভাবও ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ায়। মার্কিন সংস্কৃতি, বিশেষত সংগীতের প্রভাব নিকারাগুয়ায় যা পড়ছে, সেটাকে কি বিপ্লবী নিকারাগুয়া কোনো উপদ্রব বা সমস্যা বলে মনে করে?

আল্‌ফ্রেদো ঃ না, তা মনে করবে কেন? আমাদের সংগে অনেক মার্কিনী শিল্পী ও সংগীতকারের সুসম্পর্ক রয়েছে। আপনাকে আরো সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। মানাগুয়ায় তো কয়েকটা 'ডিস্‌কোথেক' আছে, তাই না? সেখানে গেলে 'হার্ড রক্‌', 'হার্ড জ্যাজ' এইসব শুনবেন। এখন যান, দেখবেন মাইকেল জ্যাক্‌সনের গান শুনে ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ করে নাচছে। তারা ঐ গান ভালোবাসে। ওটা আমরা কেড়ে নেবো কেন তাদের কাছ থেকে? তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা তো আর আমেরিকান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়ছি না। আমরা লড়ছি একটা সরকারের বিরুদ্ধে, যে-সরকার নেহাতই নির্বোধ, মূর্খ। যে-সরকার সমানে অন্যায় কাজ করে চলেছে।

প্রশ্ন : নিকারাগুয়ায় সংগীত ও সংগীতশিল্পীদের নতুন বিকাশ ও উন্নয়নে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা কী?

আল্ফ্রেদো : ভারি সুন্দর প্রশ্ন এটা। দেখুন, নিকারাগুয়ার জনগণ তাঁদের সংস্কৃতিটাকে কিভাবে রূপ দিচ্ছেন, প্রকাশ করছেন সেটা বুঝতে চেষ্টা করাই হলো সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের একটা প্রধান কাজ। জনগণের সংস্কৃতিটাকে বোঝার জন্য আমরা কিছু ব্যবস্থা গড়ে তুলছি। কোনো দলীয় মতবাদের ভিত্তিতে একটি বিশেষ মার্কামারা বা কোনো 'সান্দিনিস্তা সংস্কৃতি' গড়ে তোলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের ধারণা, বিপ্লব হলো কোনো দেশের সংস্কৃতির একটা উন্নত, উঁচু অবস্থা, এক অন্যতম শীর্ষবিন্দু। —আমরা চেষ্টা করছি লোকসংগীত জিনিষটাকে ভালো করে বুঝতে, এ-সম্পর্কে গবেষণা করতে। বুঝতে চাইছি, সংগীতে আমাদের পরিস্থিতিটা কী, কোন্ কোন্ সংগীতকে আমরা সত্যি সত্যিই 'নিকারাগুয়ান' বলতে পারি। আমাদের সংগীত বাস্তবিকপক্ষে কোন্‌টা বা কিরকম, এটা জানতে চাইছি আমরা। এই গবেষণা চলছে। তার মানে এই নয় যে বিদেশী সংগীতের প্রভাব আমরা বর্জন করবো, বা কট্টর জাতীয়তাবাদী মন নিয়ে নিজেদের সংগীতকে 'শুদ্ধ' করে তুলবো, আমাদের বৈশিষ্ট্য নিয়েই শুধু ব্যস্ত থাকবো। কারণ, আমরা যেটাকে স্প্যানিশ সংগীত বলছি, সেটা তো নিকারাগুয়ার মানুষের রক্তের মধ্যে রয়েছে। স্প্যানিশ বা অন্য কোনো সংগীতের প্রভাব আমাদের ওপর পড়ে একটা আলাদা রূপ নিয়েছে এই সমাজে। এই রূপটা তো আমাদের সম্পত্তি।

মোট কথা, নিকারাগুয়ায় যতো রকমের, যতো আংগিকের সংগীত বর্তমান, তার সবকটাই আমাদের গবেষণার বিষয় : কোথায় তার উৎপত্তি, কিভাবে তা এলো এ-দেশে, কিভাবে তা অমুক রূপ নিলো —এই নিয়ে আমাদের প্রশ্ন, আগ্রহ ও গবেষণা।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের হাতে একটা ছোট চেম্বার অর্কেস্ট্রা আর একটা বৃন্দ-সংগীতদল আছে। তারা আমাদের গবেষণাধীন সংগীত পরিবেশন করে থাকে। বাজায় ও গায়।

আমাদের সংগে কম্পোজাররা আছেন, পরিচালকরা আছেন। তাঁরা এই অর্কেস্ট্রা ও বৃন্দসংগীতদল পরিচালনা করেন। সংগীত ও গানের নতুন অ্যারেঞ্জমেণ্ট তৈরী করে দেন তাঁরা। আমাদের বৃন্দসংগীতদলের শতকরা আশিভাগ গানই হলো লোকগীতি। জাতীয় অর্কেস্ট্রা যা বাজান তার শতকরা ষাট ভাগ হলো নিকারাগুয়ান সংগীত।

সংগীত নিয়ে আমরা যাইই করি, তার সামনে থাকে গবেষণা, অনু-সন্ধান ও পর্যালোচনার লক্ষ্যটা। সংগীতকে আমরা সামাজিক বিবর্তনের

একটা অংশ হিসেবে দেখার ও বোঝার চেষ্টা করছি। যদি কোনো সংগীতের কথা বলি, তো দেখতে চেষ্টা করি সমাজের কোন্ বাস্তব অবস্থা থেকে উঠে এসেছে ঐ সংগীত। কাজেই সংগীতের কোনো আংগিক বা রূপ নিয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা করার সময়ে অন্য আরো নানান বিষয় সম্পর্কে জানার, গবেষণা করার দরকার হয়। ফলে অনেক জরুরী ও চমৎকার কাজ রয়েছে আমাদের হাতে।

প্রশ্ন ঃ নিকারাগুয়ার সংগীত শিল্পীদের সাহায্য করার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কী করছেন? আমার ধারণা, আপনাদের দেশে অনেক শিল্পীরই অনেক কিছু দরকার।

আলফ্রেদো ঃ বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলো থেকে আমরা বাজনা কেনার টাকা বা অনেক সময়ে বাজনাগুলোই পাই। এই যেমন কিউবা কয়েক মাস আগে আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এক কোটি চল্লিশ লক্ষ পেসেতা দামের যন্ত্র পাঠিয়েছে। এর বেশীর ভাগটাই যায় আমাদের সংগীত শিক্ষায়তনগুলোয়। নিকারাগুয়ায় এরকম তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছেঃ মানাগুয়া, লেয়ন ও মাতাগাল্পায়। অন্য শিল্পরাও কিছু ভাগ পান। কয়েকজন কিউবান যন্ত্রী কিছুদিন ধরে ভালো ভালো গিটার তৈরী করছিলেন এখানে। কাজও শেখাচ্ছিলেন। তাঁরা অবশ্য দেশে ফিরে গিয়েছেন।

অনেক কাজ করার আছে আমাদের। আমরা শুরু করেছি মাত্র। তবে, শুরু করেছি খুব খোলা মন নিয়ে। যেমন ধরুন, সংগীত শিক্ষায় আমরা প্রথমে কিউবান পদ্ধতিটা ব্যবহার করছিলাম। ওটা এক আদর্শ পদ্ধতি। খুবই বৈপ্লবিক। কিন্তু কাজ শুরু করার কিছুদিন পর আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের ঠিক সুবিধে হচ্ছেনা। আমরা পেরে উঠছি না। কিউবানরা আমাদের ভাইবোন, সহবিপ্লবী। কিন্তু তাই বলে তাঁদের সংগীতশিক্ষা পদ্ধতিটা আমরা আর আঁকড়ে থাকিনি। ওটা পাল্টে দিয়েছি নিজেদের প্রয়োজনে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আমরা লোকসংগীত ব্যবহার করছি। সংগীত শিক্ষা হচ্ছে বলে যে অমনি মোৎসার্টের একটা লাইন ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরতেই হবে, সেটা বিশ্লেষণ করতে বা অনুশীলন করতে শেখাতেই হবে, তা কেন? জনপ্রিয় কোনো সুরের সাহায্যেও তো এটা করা যায়। পদ্ধতিটা আমরা গড়েপিটে নিচ্ছি নিজেদের প্রয়োজনে।

* * *

নিকারাগুয়ায় শুধু যে ইউরির মতো বুশী সংগীত শিক্ষক আছেন, তাই নয়। টেক্সাস কন্‌সারভেটরি থেকে পাশ করা এক মার্কিন পিয়ানোবাদকও কাজ করছেন এখানে। তিনি নিকারাগুয়ান পিয়ানো শিক্ষকদের শেখান। এ-ছাড়াও, জাতীয় অর্কেস্ট্রায় দুই গুয়াতেমালান শিল্পীও কাজ করছেন।

বাইশে মে

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে জানিয়ে রেখেছিলাম, অন্তত একটা স্কুলে গিয়ে একটু ঘুরে দেখতে চাই, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। সেইমতো, কার্লা আজ আমায় নিয়ে গেল মানাগুয়ার একটা স্কুলে। সংগে চালকবন্ধু ভিসেন্তে। লিয়েস ও হাইমের পর ভিসেন্তেই এখন আমার সারথী।

স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকতেই চোখে পড়লো একটা প্রকাণ্ড প্রাচীরচিত্র। রঙীন। বাঁদিকে—সোমোসার ন্যাশনাল গার্ডের সংগে লড়াই করছে মুক্তিযোদ্ধারা। ডান-দিকে—একটি মেয়ে কফিক্ষেতে কাজ করছে।

ছবিটার সামনেই কয়েকটি ছেলেমেয়ে জটলা করছে। প্রধান প্রবেশপথের ধারেই এক মহিলা ঝোলায় করে কিসব খাবার বিক্রি করছেন। দু'একটি কিশোরী কলাপাতায় করে সেই খাবার তারিয়ে তারিয়ে চাখছে। চারদিক মোটামুটি শান্ত। বুঝলাম বেশীরভাগ ঘরেই ক্লাশ চলছে। জটলা করা ছেলেমেয়েদের সংগে একটু আধটু আলাপ করছি, এমন সময়ে দেখি দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে এগিয়ে আসছে আমার দিকে তিনমুখ কৌতুহল নিয়ে। কারুরই বয়েস চোদ্দর বেশী হতে পারেনা। একটি মেয়ে তো নেহাতই কচি। যে মেয়েটি একটু বড়, সে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। ইতিমধ্যে কার্লা এসে পড়েছে আমার পাশে। পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে কার্লা বললোঃ "এরা আমাদের কিশোরী কম্পানিয়েরা।" স্প্যানিশ ভাষায় আপনি-তুমির ভেদ আছে। মেয়েটি আমায় সরাসরি "তুমি" সম্বোধন করেই জানতে চাইলো কোন্ দেশ থেকে এসেছি। 'ভারত' নামটা বলতেই সকলের মুখেচোখে বিস্ময় ও মিষ্টি হাসি। মেয়েটি বললোঃ "কোনো ভারতীয়কে এই প্রথম দেখছি আমরা নিজের চোখে। সামনাসামনি। কতো দূরের দেশ ভারত। সেখান থেকে কেউ আমাদের সংগে দেখা করতে এসেছে এটা ভাবতেই কেমন লাগছে।"

ছেলেমেয়েরা এ ওকে দেখে নিলো হাসিহাসি মুখে। আর একটু কাছে ঘেঁষে এলো। বড় মেয়েটি মনে হচ্ছে 'লিডার'। চোখেমুখে কথা বলে চলেছে সমানে। কথা বলার ঢং-এ বেশ নেতা-নেতা ভাব। প্রথমেই, সে সামনের প্রাচীরচিত্রের তাৎপর্য বোঝাতে শুরু করলো আমায়। কফির চাষ

নিকারাগুয়ার জন্য কতো গুরুত্বপূর্ণ, কফি তুলতে গিয়ে কিভাবে লড়াই করতে হয় আগ্রাসী প্রতিবিপ্লবীদের সংগে।

—'তোমরাও কি যাও কফি তুলতে?'

—'নিশ্চই। ছাত্রছাত্রীরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যায় বৈকি।'

সে নিজেও গিয়েছে। কিশোরী কম্পানিয়েরা তারপর দেওয়ালে আঁকা ঐ বিশাল ছবিটা দেখিয়ে বলতে লাগলো, বিপ্লব যাতে সফল হতে পারে সে-জন্য দেশকে রক্ষা করা কতো জরুরী, লড়াই করা কতো দরকার।

প্রশ্ন ঃ মনে করো যদি প্রচণ্ড এক আক্রমণ হয় তোমাদের ওপর, এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তা ঠেকানোর দরকার পড়ে, তাহলে তোমরা, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কি লড়তে যাবে?

কিশোরী ঃ একশোবার। আমরা যদি বিপ্লবের জন্য লড়াই না করি, তো সেটা করবে কে শুনি?

প্রশ্ন ঃ বন্দুক চালাতে জানো?

কিশোরী ঃ সবাই কি আর জানে! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জানে। বাকিরা ট্রেনিং নেবে। এই তো, আসছে শনিবার আমি ট্রেনিং-এ যাবো। তাছাড়া, আমাদের দেশে স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই মিলিশিয়ায় আছে, লড়াই করছে আগ্রাসী প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে। অনেকেই সামরিক শিক্ষা নিচ্ছে, বাকি সকলেও নেবে।

ঐটুকু মেয়ের মুখে 'আগ্রাসী', 'প্রতিবিপ্লবী', 'বিপ্লব' কথাগুলো অনায়াসে এসে যাচ্ছে। যখন সে কথা বলছে, বাকি ছেলেমেয়েরা তাতে সায় দিচ্ছে। একেবারে ছোট্ট মেয়েটিও। এই সর্বকনিষ্ঠা কম্পানিয়েরা একফাঁকে আমায় জানিয়ে দিলো যে সে 'সান্দিনিস্তা' কিশোর সমিতির' সদস্যা।

প্রশ্ন ঃ এই বিরাট ছবিটা কে এঁকেছে?

সমস্বরে উত্তর ঃ আমরা। এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।

লিডার মেয়েটি বললো—"স্কুলের ভেতরে চলোনা, দেখবে দেওয়ালে দেওয়ালে আরো কতো ছবি আঁকা, কথা লেখা।"

প্রশ্ন ঃ স্কুলের ছাত্রছাত্রী হিসেবে তোমাদের কোনো সমস্যা আছে কি এখন?

একটুক্ষণ চুপ করে থাকলো সকলে। তারপর ছোট্ট মেয়েটি বললো ঃ "সারা দেশে 'স্কুলপাঠ্য' বইপত্রের বেশ অভাব। 'বিপ্লবের আগে যেসব বই চালু ছিল, তার অনেকগুলোই খুব' বাজে। 'মিথ্যে কথায় ভরা। তাই নতুন বই লেখা হচ্ছে।"

বড় মেয়েটি বললো : "নানান বন্ধুদেশ থেকে আমরা বইপত্র পেয়েছি। তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক যে স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য বই খুব বেশী নেই। লাইব্রেরি থেকে আমরা অবশ্য বই পাই। তবু নতুন বই দরকার।"

প্রশ্ন : তোমাদের স্কুলের লাইব্রেরিটা কেমন ?

বড় মেয়েটি : এমনিতে খারাপ না। তবে বেশ কিছু বই পুরোণো। নতুন বই আসবে শুনছি। এখন আমরা দলে দলে ভাগ হয়ে বই পড়ি। টুকে নিই। কপি তৈরী করি হাতে লিখে। এটা অবশ্য তেমন বড় সমস্যা নয়।

(এক লহমায় আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো মানাগুয়ার জাতীয় পাঠাগারের দৃশ্য : ছেলেমেয়েরা দলে দলে ভাগ হয়ে বই থেকে নোট নিচ্ছে।)

কিশোরী কম্‌পানিয়েরা তখনো হাত-পা নেড়ে বুঝিয়ে চলেছে : "বুঝলে না, আমাদের দেশে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আগ্রাসন ঠেকানো। সারাক্ষণ লড়াই চলছে। সারাক্ষণ পাহারা দিতে হচ্ছে। উত্তর আমেরিকা শেষ করে দিতে চাইছে আমাদের। বিপ্লবকে রক্ষা করতে গিয়ে অনেক জরুরী কাজ হয়ে উঠছেনা। এ এক বিরাট সমস্যা।"

ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে যোগ দিয়েছে।

প্রশ্ন : স্কুলের লেখাপড়া ছাড়া তোমরা আর কী কী করো ?

বড় মেয়েটি : কফি তোলার মরশুমে আমরা ছাত্রছাত্রীরা দল বেঁধে কফি তুলতে যাই। তারপর ধরোনা, জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারেও আমরা সাহায্য করি। এই যেমন, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে লোকদের বোঝানো যে ঘরদোর, বাড়ির আশ-পাশ পরিষ্কার রাখা কতো দরকার। পোলিয়ো আর অন্যান্য রোগের টিকে দেবার অভিযানেও আমরা যাচ্ছি নিয়মিত। লোকদের বোঝাই। সাহায্য করি। টিকেও দিয়ে থাকি আমরা। এসব আমরা সকলেই শিখে নিয়েছি।

প্রশ্ন : কম্‌পানিয়েরা, চারদিক পরিষ্কার রাখার কথাটা তুললেই যখন তো বলি, এই মানাগুয়া শহরে জায়গায় জায়গায় কিন্তু বেশ ময়লা আর জঞ্জাল জমে আছে। এগুলো তোমরা, ছাত্রছাত্রীরা, পরিষ্কার করোনা ?

(কার্লা এতক্ষণ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে কথাবার্তা শুনছিল। আমার প্রশ্ন শুনে এবারে সে ফিক্ করে হেসে ফেললো একটু। ছাত্রছাত্রীরা সেই হাসিটাকে আমল দিলোনা একদম।)

বড় মেয়েটি : নিশ্চয়ই করি। যথাসাধ্য কাজ করি। কিন্তু বছরের পর বছর লোকে এসব নিয়ে ভাবেনি। আবর্জনা জমিয়ে রাখাটা যে কি ক্ষতিকর,

এই বোধটাই অনেকের নেই। তাই পরিষ্কার করার পরেও আবার ময়লা জমছে। এই দিকে এখনো বিস্তর কাজ করার আছে। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তবে সব দিক সামলে উঠতে পারছি না। ময়লা সরানোর অভিযান কিন্তু চলছে। দেখতেই পাচ্ছো, বিপ্লবের এই চারপাঁচ বছরে কতো কী করতে হচ্ছে আমাদের। আস্তে আস্তে আমরা সব করে ফেলবো।”

যে কিশোরটি এতোক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল, এবারে সে মুখ খুললো:
“অনেক কাজ আছে যেগুলো ধাপে ধাপে করা দরকার। সেইমতোই এগোচ্ছি আমরা। চারদিক পরিষ্কার রাখা, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, চিকিৎসা, ওষুধপত্র বিলি করা, লোকদের বোঝানো, শিক্ষা দেওয়া—এসব তো আর রাতারাতি হবার নয়। হাজার সমস্যা। কাজ এগোচ্ছে। আমরা সমস্যাগুলো একের পর এক সমাধান করতে করতে এগোচ্ছি।”

এইসব কথা যারা আমায় বোঝাচ্ছে তাদের কারুর বয়স পনেরোর বেশী নয়। সান্দিনোর ছেলেমেয়ে এরা।

এবারে স্কুলের ভেতরে ঢোকা। মস্ত বড় বাড়ি। মাঝখানে উঠোন, বাগান। চারদিকে বিস্তর জায়গা। ফলের গাছ। কয়েকটা ক্লাশ বোধহয় সবে ভেঙেছে। দুদ্দাড় করে বেরিয়ে আসছে ছেলেমেয়ের দল। আমাকে দেখে সকলেরই কৌতুহল। আমার কিশোরী সংগিনী সবাইকে বেশ গর্বের সংগে জানিয়ে দিচ্ছে—‘এই কম্পানিয়েরো ভারতের লোক।’

সব ছাত্রছাত্রী একই ধরণের পোষাক পরে আছে। সাদা জামা, নীল স্কার্ট বা প্যাণ্ট। জানলাম যে সব স্কুলেরই ইউনিফর্ম এক।

এঘর-ওঘর ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম ল্যাবরেটরি এলাকায়। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন আর জীববিজ্ঞানের তিনটি ল্যাবরেটরি পরপর। অনেক ছেলেমেয়ে আমাদের মিছিলে এসে পড়েছে। তারাই ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে সব কিছু। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এ-মিছিলে কোনো শিক্ষক নেই। জীববিজ্ঞানের ল্যাবে দেখি অনেক চার্ট, অনেক প্রাণীর স্পেসিমেনের নাম জার্মান ভাষায় লেখা। এক কিশোর বললো, এগুলো পূর্ব জার্মানী থেকে এসেছে উপহার হিসেবে।

প্রশ্ন: জার্মান পড়তে পারো তোমরা?

সকলে: না।

প্রশ্ন: তাহলে বুঝছো কী করে কোথায় কী রয়েছে, কোন্‌টার কী নাম?

এক কিশোর: কেন? শিক্ষকরা সব শিখিয়ে দেন, বলে দেন। আমাদের সব মনে থাকে।

লিডার মেয়েটি আমাদের কথা শুনছিল এতোক্ষণ। তার সহপাঠীর কথা যে কতোটা সত্যি তা প্রমাণ করার জন্য নানান স্পেসিমেনের বাক্স ধরে সে স্প্যানিশ ভাষায় নামগুলো বলে যেতে লাগলো গড়গড় করে। আমি বললাম--"তুমি ঠিক ঠিক বলছো কিনা তা যাচাই করার সাধ্য আমার নেই। আমার স্প্যানিশের দৌড় দেখছো তো তোমরা! নামগুলো উল্টোপাল্টা বলে গেলেও ধরতে পারবো না।"

হৈ-হৈ করে হেসে উঠলো ছেলেমেয়েরা—রসায়নের ল্যাবে এক শিক্ষকের সংগে আলাপ। তাঁকে প্রশ্ন: চার্টগুলো জার্মান ভাষায় কেন? স্পেসিমেন-গুলোর নামই বা জার্মানে কেন?

শিক্ষক: আসলে, এত কাজ জমে রয়েছে যে সবদিক সামাল দিয়ে উঠতে পারছি না আমরা। আর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সবকিছু নিজেদের মতো করে বানিয়ে ফেলবো। কিছুই তো ছিলনা এখানে বিপ্লবের আগে। স্কুলবাড়িটা ছিল শুধু। বিজ্ঞানচর্চার নামগন্ধও ছিল না। এই যে ল্যাবরেটরি-গুলো দেখছেন, এর একটাও ছিল না। বিপ্লবের পর গত পাঁচ বছরে আমরা সব জোগাড় করেছি। এটুকু সময়ে কতোটাই বা সম্ভব, বলুন? আমাদের টাকা-পয়সা কম, মালমশলা কম। গরীব দেশ আমাদের। চেষ্টা করছি প্রাণপণ। যেখান থেকে যা পেয়েছি তা দিয়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। আপাতত। কিছুদিনের মধ্যেই সামলে নিতে পারবো সবকিছু।

প্রশ্ন: আপনি তো বিজ্ঞান পড়ান। আপনিই ভালো বলতে পারবেন,—ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে গিয়ে কোন্ বিষয়গুলোর ওপর জোর দিচ্ছেন আপনারা?

শিক্ষক: যে দিকগুলো আমাদের দেশের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী। বিজ্ঞানের মধ্যে রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও কৃষি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য। নিছক কেতাবী পড়াশুনো, বই মুখস্থ করাটাকে আমরা সময়ের অপচয় বলে মনে করি। যে যতোটুকু শিখছে, হাতেকলমে শিখছে। ছাত্রছাত্রীরা সারাক্ষণই যন্ত্রপাতি ঘাঁটছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে যতোটা সম্ভব। আমাদের দেশে রাসায়নিক কারখানা দরকার, ওষুধের কারখানা দরকার, ডাক্তার, ইন্‌জিনিয়ার, মিস্ত্রী, রসায়নবিজ্ঞানী, স্থপতী দরকার। সেইমতো তৈরী করছি ছেলেমেয়েদের। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো—ছাত্রছাত্রীরা যতোটুকু শিখবে তা যেন দেশের সব মানুষের কাজে লাগে।

—এই শিক্ষকের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে খেয়াল করলাম কিশোর-কিশোরীরা সকলেই তাদের শিক্ষককে "কম্পানিয়েরো" বলে সম্বোধন করছে। শিক্ষকটিও ছেলেমেয়েদের "কম্পানিয়েরো" বা "কম্পানিয়েরা" বলছেন। সবাই সবার বন্ধু, সতীর্থ, সহগামী।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা এবারে আমায় নিয়ে গেল গানবাজনার ঘরে। যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম,—আগেও খেয়াল করেছি,—দেওয়ালে দেওয়ালে বিপ্লবী শ্লোগান লেখা। কোনো কোনো শ্লোগান একেবারে কাঁচা হাতে লেখা। সান্দিনোর বাণী। আহবান: 'দেশকে রক্ষা করো, উৎপাদন বাড়াও।'—'দেশের যুবশক্তি রয়েছে বিপ্লবের পেছনে।'

খানিক দূরে ড্রাম বাজছে। একটু এগিয়ে দেখি এক কিশোর বাগানে দাঁড়িয়ে আপন মনে ড্রাম বাজিয়ে চলেছে। রেওয়াজ করছে মেজাজে। ট্রাম্পেটের সুর ভেসে এলো। বাজনার ঘরে পৌঁছোতেই সহগামী এক কিশোর সংগীত শিক্ষকের সংগে আলাপ করিয়ে দিলো আমার। মাঝবয়সী সেই শিক্ষক হাত বাড়িয়ে আহ্বান করলেন—"আদেলান্তে"—আসুন, আসুন।

ঘরে ছেলেমেয়েদের জটলা। একপাশে একরাশ ট্রাম্পেট, ট্রম্বোন, নানা ধরণের হর্ণ, ক্ল্যারিওনেট, সারিসারি গিটার, ড্রাম, কংগা ড্রাম্স্। শিক্ষক বেশ গলা চড়িয়ে সগর্বে ঘোষণা করলেন: "এই স্কুলের যে ব্যাণ্ডপার্টি, সেরকমটি আর কোথাও পাবেন না এই নিকারাগুয়ায়। চল্লিশজনের ব্যাণ্ড আমাদের, ভাবতে পারেন? চল্লিশজনের। আর কোথাও এতো বড় দল নেই। এই ছেলেমেয়েরাই সব করে। খুব উৎসাহী এরা।"

নানান যন্ত্র দেখাতে দেখাতে শিক্ষক জানতে চাইলেন কোন দেশ থেকে এসেছি। 'ভারত' শুনে ভদ্রলোক সবিস্ময়ে আমার হাতদুটো ধরে বেশ আবেগের সংগে বললেন: "এতো দূর থেকে এসেছেন আমাদের সংগে দেখা করতে? আর কেউ তো আসেনি এমন!" বিদায় নেবার সময়ে সংগীত শিক্ষক আবার আমার হাত ধরে বললেন: "আপনার দেশবাসীদের আমাদের প্রীতি ও অভিবাদন জানাবেন।"

বেরিয়ে এসে ট্রাম্পেটবাদককে খুঁজলাম। পেলাম না। ড্রামবাদক ছেলেটি তখনো হাত গরম করে চলেছে আপন মনে।

আরো জনা দুই কিশোর জুটে গিয়েছে আমাদের মিছিলে। দলবেঁধে গেলাম আর-একটা ঘরে। এখানে লোকনৃত্যের সাজসরঞ্জাম। রঙচঙে মুখোশ, নানা ধরণের 'সমব্রেরো' বা পেল্লায় টুপি। এ-ঘরে লোকনৃত্য শেখানো হয়। দেওয়ালে একটি মেয়ের ছবি। এই স্কুলেরই ছাত্রী ছিল। সোমোসার সৈন্যদের বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হয় এই কিশোরী। ছেলে-মেয়েরা সগর্বে বলতে লাগলো এই শহীদ কম্‌পানিয়েরার কথা।

পাশের ঘরে বেশ সোরগোল। ঢুকে দেখি বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ে হৈ হৈ করে ছুতোরের কাজ শিখছে। কিশোরীরা কোমর বেঁধে র‍্যাঁদা আর করাত চালাচ্ছে বড় বড় কাঠের টুক্‌রোয়। হাতুড়ি পড়ছে দমাদ্দম। দেওয়ালে

ঝুলছে চে গেভারার ছবি। সেদিকে তাকাতেই পাশের কিশোরটি অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো: "কমান্দান্তে চে।" এর্নেস্তো স্মিতমুখে দেখছেন এই বিপ্লবী দেশের ছেলেমেয়েদের কাজ।

এবারে বিদায় নেবার পালা। ছেলেমেয়েরা সদলবলে আমায় পৌঁছে দিল বাইরের দরজা পর্যন্ত। একে একে করমর্দন। সেই লিডার মেয়েটি এগিয়ে এলো। তাকে শুধোলাম: "নিকারাগুয়ার বিপ্লবের জন্য তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কী করা উচিত বলে তুমি মনে করো?" সে বললো: "তোমরা আমাদের পাশে থেকো, আমাদের সমর্থন করো, তাহলেই হবে।"

ডান হাত তুলে মুঠো পাকিয়ে সংগ্রামী অভিবাদন জানালাম আমার কিশোরী কম্‌পানিয়েরাকে। সে-ও একই ভংগিতে আমায় অভিবাদন জানিয়ে বললো: "সম্পূর্ণ বিজয়, চিরকালের জন্য,—ততোদিন সংগ্রাম।"

নেপথ্যে—অতিথিশালা

পরশু ম্যালকম চলে যাচ্ছে দেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সান্দিনিস্তা বিপ্লবের প্রতি সংহতি দেখিয়ে চার মাস কাটিয়েছে ম্যালকম এই নিকারাগুয়ায়। যে প্রচণ্ড পাপ মার্কিন সরকার করে চলেছেন, যে অযৌক্তিক বিদ্বেষ, অ-মানবিকতা ও স্বৈরাচার জাহির করে চলেছেন তাঁরা নিকারাগুয়া নামে এই ছোট দেশটার বিরুদ্ধে, মানবতাবাদী, বিপ্লববন্ধু এই মার্কিনী তরুণ ম্যালকম যেন নিজের পন্থায় তার প্রায়শ্চিত্ত করে চলে যাচ্ছে। দেনা শুধে চলেছে মার্কিনী তরুণী স্টেসি। সে রইল। ম্যালকম চললো।

আজ সন্ধ্যেবেলা ম্যালকমের বিদায় আসর। নাচগান। খানাপিনা। উত্তর সীমান্তের কাছাকাছি কফি তুলতে গিয়ে ম্যালকমের সংগে যেসব নিকারাগুয়ান তরুণ-তরুণীর বন্ধুত্ব হয়েছিল, যাদের পাশাপাশি সে ক্ষেতে কাজ করেছিল, রাতভোর রাইফেল হাতে পাহারা দিয়েছিল, অপেক্ষা করেছিল প্রতিবিপ্লবী ও সি, আই, এ'র ভাড়াটে সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণের জন্য, তাদের অনেকেই আজ হাজির। মানাগুয়ার জাতীয় ঐতিহাসিক সম্পদ রক্ষা দপ্তরে ম্যালকম দীর্ঘদিন কাজ করেছে। সেখানকার সহকর্মীরাও এসেছেন সপরিবারে।

নাচ হতে গেলে গানবাজনা হওয়া চাই। 'লাইভ' গান হবার উপায় নেই তেমন। অতএব রেকর্ড বা টেপ। চল্লিশ পঞ্চাশজন তরুণ-তরুণীকে নাচিয়ে দেবার জন্য চাই গম্‌গমে আওয়াজওয়ালা 'সাউণ্ড সিস্টেম', বড় বড় 'স্পিকার'। সে সব জিনিষ পাবো কোথায় এখানে? সুতরাং দনালুদের আনা ছোট্ট একটা 'পোর্টেব্‌ল্ টু-ইন্‌-ওয়ান্'। তার ক্ষীণ আওয়াজই সই।'

পানীয় কেনার ভার নিয়েছি আমরা তিনজন—স্টেসি, ম্যালকম আর আমি। পাউলিনে ও মাতিলদা স্বেচ্ছায় টেনে নিয়েছে এন্তার মুর্গী ভেজে দেওয়া আর স্যালাড বানিয়ে দেবার দায়িত্ব। তিন রুশী বন্ধু লুবা, ইউরি ও বরিস মহা উৎসাহে হাজির করেছে বিস্তর মুখরোচক, চকোলেট, বিস্কুট, সসেজ ইত্যাদি। অতিথিশালার অন্য দুই বাসিন্দা—দুই ফরাসী তরুণ—এসেছেন শূন্য হাতে, তবে রাতভোর নাচানাচি করার অদম্য বাসনা নিয়ে।

ষোলো নম্বর 'কাসা দে প্রোতোকল'-এ, অর্থাৎ আমাদের এই অতিথিশালায়

আজ মার্কিনী কম্‌পানিয়েরো ম্যালকমের বিদায়-উৎসব। নাচ শুরু হলো। লাজুক প্রকৃতির লুবা আর ইউরিকে কিছুতেই টেনে আনা গেলনা। ওরা খিলখিল করে হাসতে হাসতে দর্শক হয়েই রয়ে গেল। বরিস হাসাহাসির মধ্যে নেই। বেশ খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে দেখছিল কাণ্ডকারখানা। হঠাৎ বিনা নোটিসে বরিস লাফ দিয়ে নেমে পড়লো নাচের আসরে। নেমেই উদ্দাম গতিতে নাচতে লাগলো রক্‌-এ্যাণ্ড-রোল। রুশী কম্‌পানিয়েরো বরিস পেশাদার নাচিয়ে, ব্যালেশিল্পী ও শিক্ষক। ও যে এরকম ভৈরবমূর্তি ধারণ করে 'রক্‌' নাচবে, এটা কেউ কল্পনাও করেনি। লাতিন নাচগুলোর বেলা (যেমন ট্যাংগো ও সাল্‌সা) নিকারাগুয়ান তরুণ-তরুণীরাই আপন-আপন লাতিন মুন্সিয়ানা দেখাচ্ছিল আশ্চর্য সৌকর্যে। রক্‌-এণ্ড-রোলের সনাতন কিছু মুদ্রা স্বদেশী মাহাত্মে জাহির করছিল স্টেসি ও ম্যালকম—যেহেতু এ-নাচের উৎপত্তি তাদেরই দেশে। কিন্তু বরিস সোভিয়েত ইউনিয়নের লোক। কোনো রুশী, তার ওপর আবার এক রুশী ব্যালেশিল্পী যে এভাবে রক্‌-এ্যাণ্ড-রোল নাচবে, এটা কারুর হিসেবে ছিলনা।

মিনিট পনেরো একা একা নাচলো বরিস। আশপাশের নাচিয়েরা ওর নাচের মুন্সিয়ানা ও বলিষ্ঠতা দেখে নিজেদের নাচ থামিয়ে, সসম্ভ্রমে দর্শকের ভূমিকা নিয়ে ফেললো। চললো তালে তালে সমবেত হাততালি। শিল্পী বরিস আধুনিক নাচের শৈলী দিয়ে রক্‌-এ্যাণ্ড-রোলকে উত্তীর্ণ করে ফেললো এক পূর্ণাঙ্গ শিল্পে।

বরিসের ঐ আকস্মিক ও দুর্দান্ত একক অনুষ্ঠানের পর অন্যদের নাচানাচি আর জমলোনা তেমন। খাওয়া আর পান শুরু হলো। শুরু হলো আড্ডা। ইউরি সস্ত্রীক বিদায় নিলো ঘুম পেয়েছে বলে। বরিস কিন্তু জমে গেছে ততোক্ষণে। বেচারির ভাষার ভাঁড়ার তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির মতো,—প্রায়শূন্য ও টলোমলো। তা সত্ত্বেও বরিস এক হাতে আমাকে আর অপর হাতে এক নিকারাগুয়ান তরুণকে জড়িয়ে ধরে ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে বলতে লাগলোঃ "সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইন্দিয়া, নিকারাগুয়া—ব্রাদার, ফ্রেণ্ড।" তারপর নিকারাগুয়ান তরুণটিকে ছেড়ে স্টেসির হাত ধরে আবেগবিহ্বল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলোঃ "সোভিয়েত ম্যান, আমেরিকান ম্যান, ইন্দিয়ান ম্যান,—অল্‌ ব্রাদার। অল্‌ ফ্রেণ্ড।" –ছেলেমেয়েদের দল ততোক্ষণে ঘিরে ফেলেছে আমাদের। কেউ কিছু বলছেনা। সকলেরই মুখে ভালোবাসার হাসি। দলে এক স্ক্যান্‌ডিনেভিয় তরুণী ছিলেন। সান্‌দিনিস্তা-বিপ্লবের ডাকে তিনিও হাজির এই নিকারাগুয়ায়। মেয়েটি ইংরিজী ও স্প্যানিশ দুটো ভাষাই বেশ জানেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি দোভাষীর দায়িত্ব নিয়ে বরিসের কথাবার্তা (ও হাবভাব) সমবেত নিকারাগুয়ানদের জন্য অনুবাদ করতে শুরু করলেন।

বিশ্বের সব দেশের মানুষই যে একে অন্যের ভাইবোন বন্ধু,—সাবেগে ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে এ-কথা বার বার বলতে বলতে বরিস হঠাৎ প্রস্থান করলো। ওর এই আকস্মিক নিষ্ক্রমণে আমরা সবাই একটু হকচকিয়ে গেলাম। ওমা, মিনিট দেড়েকের মধ্যেই বরিস ফের ঝড়ের মতো ফিরে এলো। এক হাতে কয়েকটা ব্যাজ, অন্য হাতে একঠোঙা চকোলেট আর রুশী সিগারেট। আমার পাশে ধপাস্ করে বসে পড়ে চকোলেটগুলো ঢেলে ফেললো সামনের টেবিলে। সিগারেটের একটা প্যাকেট আমার হাতে গুঁজে দিয়েই বলা-নেই-কওয়া-নেই দুহাত দিয়ে নিজের বুক চাপড়াতে লাগলো বরিস। মুখে তীব্র যন্ত্রণার ভাব। আমরা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম,—মাত্রাধিক নিকারাগুয়ান 'রন্' (রাম্) খেয়ে আমাদের "কম্পানিয়েরো সোভিয়েতিকো" বেসামাল হয়ে পড়লো বুঝি! ম্যালকম এরই মধ্যে এক ফাঁকে নিজের ঘর থেকে একটা মস্ত খাতা আর কলম নিয়ে এসেছে। কে কী বলছে, করছে সব লিখে চলেছে সে মন দিয়ে, গম্ভীর মুখে। বরিসের বুক-চাপড়ানি দেখে ম্যালকমও লেখাটেখা থামিয়ে একমুখ উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। এমন সময়ে বরিসের যন্ত্রণাকাতর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—সজোরে—এক স্প্যানিশ শব্দ: "বম্বা"।—'লা বম্বা' মানে বোমা। বুক চাপড়ানোর তালে তালে কয়েকবার 'বম্বা, বম্বা' করে বরিস শেষপর্যন্ত ককিয়ে উঠলো: "নো বম্বা, নো বম্বা।"—এ-কথাটির অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন—বুঝে সেই স্ক্যান্ডিনেভিয় তরুণীও চুপ। এবারে বরিস বেচারা আর কথাটথা খুঁজে না পেয়ে দু'হাত মুঠো পাকিয়ে ঘুঁষোঘুঁষির অভিনয় করতে করতে চেঁচাতে লাগলো "নো, নো, নো।"—আমরা বুঝে নিলাম আমাদের রুশী বন্ধু বলতে চাইছে—"যুদ্ধ নয়।"—আমার ভাষার ভাঁড়ারে তিনটি রুশ শব্দ আছে:—"নিয়েৎ" (না), "মির" (শান্তি) আর,—বরিসেরই সৌজন্যে—"কাশ্‌মা" (দুঃস্বপ্ন)। আমি সেই পুঁজি নিয়েই বলে উঠলাম "মির", "পাস।" স্প্যানিশে 'লা পাস' মানে শান্তি। ব্যাস্। সমবেত সকলের মধ্যে—বরিসের নেতৃত্বে—এমন এক বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে যে এক লহমায় সকলে চেঁচাতে লাগলো: "মির, মির মির।" দনাল্দ আর কয়েকজন নিকারাগুয়ান ছেলেমেয়ে চেঁচাতে লাগলো "পাস, পাস, মির, মির।"

স্টেসি ছুটে এসে আমার কাছ থেকে জেনে নিলো "মির, পাস, পীস"-এর বাংলা। তারপর আমরা দুজন কোরাসে গলা মেলালাম "শান্তি, শান্তি" বলে। বরিস তখনো বুক ঠুকে আর্তনাদ করে চলেছে "নো বম্বা।" এরই মাঝখানে বরিস তার একহাতের মুঠি খুলে পেতল বা ঐ জাতীয় কিছুর তৈরী ছোট্ট দুটো ব্যাজ দেখালো। ব্যাজে একটা বোমার ছবি আঁকা। বোমার মাঝখানটা ভাঙা। আর সেই ভাঙা জায়গাটায় রুশ ভাষায় লেখা 'নিয়েৎ'—না। যুদ্ধ-

বিরোধী, পরমাণু বোমা বিরোধী ঐ ব্যাজদটোর একটা আমাদের রুশী কম্‌-পানিয়েরো বরিস লাগিয়ে দিলো আমাদের মার্কিনী কম্‌পানিয়েরা স্টেসির জামায়,—সযত্নে। আমরা মহা সোরগোল তুলে সাবাস দিলাম, বাহবা দিলাম। স্টেসি বরিসকে সশব্দে চুমু খেলো। আবার সমবেত হর্ষধ্বনি। তারই মধ্যে আমরা কেউ কেউ চোখ মুছছি। বরিসের বিরাট মুখে হাসি, দু'গাল বেয়ে চোখের জল। স্টেসি থেকে শুরু করে আশপাশে যতোজন ছিল তাদের প্রায় সকলের হাত একবার করে নিজের বুকে টেনে নিলো বরিস। প্রতিটি হাত নিজের বুকে লাগিয়ে সে তার আবেগভেজা ভরাট গলায় বলতে লাগলো : "আমিগো (বন্ধু), অল ফ্রেণ্ড, নিকারাগুয়া আমেরিকা সোভিয়েত ইন্দিয়া ব্রাদার, ফ্রেণ্ড, নো বম্‌বা, মির, পাস, পীস, নো বম্‌বা..."

তেইশে মে

মুক্ত নিকারাগুয়ায় যেসব ক্ষেত্রে একেবারে আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা হয়েছে, শিক্ষাব্যবস্থা তার অন্যতম। বিপ্লবোত্তর নিকারাগুয়ায় তাই শিক্ষা-মন্ত্রকের গুরুত্ব বিরাট। আজ সকালে লিদিয়ার সংগে গেলাম শিক্ষামন্ত্রণালয়ে। শিক্ষামন্ত্রী ফাদার ফেরনান্দো কার্দেনাল (ফাদার এর্নেস্তো কার্দেনালের ভাই) এখন বিদেশে। মার্কিন সরকার নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবরোধ শুরু করার কয়েকদিনের মধ্যেই নিকারাগুয়ার অনেক নেতার সংগে ফেরনান্দো কার্দেনালও বিদেশ সফরে বেরিয়ে পড়েছেন—বাইরের দেশগুলোয় জনমত গঠনের উদ্দেশে। অতএব তাঁর সংগে আর দেখা হলোনা। মন্ত্রকে আমায় স্বাগত জানালেন উপশিক্ষামন্ত্রী ডক্টর আরিয়েন।

তিনি অল্পস্বল্প ইংরিজী ও জার্মান বলতে পারেন। খোদ শিক্ষামন্ত্রী বিদেশ সফরে যাওয়ায় মন্ত্রণালয়ের সমস্ত দায়িত্ব এখন তাঁরই। ফলে তিনি ভীষণ ব্যস্ত। একটু পরেই জরুরী বৈঠক আছে। তাই ডক্টর আরিয়েন সরাসরি মূল প্রসংগে চলে এলেন :

"বিপ্লবী নিকারাগুয়ায় শিক্ষাপদ্ধতি একেবারে আমূল পাল্টে দেওয়া হয়েছে। সনাতন শিক্ষাপরিকল্পনায় আর কাজ হতে পারেনা। আমাদের দেশ গরীব। এই দারিদ্রের মধ্যেই আমরা পরিকল্পনা করছি। আমাদের সম্পদ নিতান্তই সীমিত। তাছাড়াও আরো সমস্যা রয়েছে। এ-দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটাকে সেইসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করানোই হলো আমাদের উদ্দেশ্য। খোদ শিক্ষা-পরিকল্পনাতেই কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থার কথা ধরে নেওয়া হয়েছে। যেমন, এখন দেশের সামনে যেসব সমস্যা, সেগুলো যদি আসছে বছর একই মাত্রায় থাকে তো করণীয় কী? দ্বিতীয় সম্ভাবনা, সমস্যা আর অসুবিধেগুলো যদি আরো তীব্র হয়ে ওঠে, তাহলে বিকল্প কী? তাছাড়া, প্রয়োজনে চলতি পন্থা ছেড়ে একেবারে নতুন কোনো পথ নেওয়ার উপায়টাও ভেবে রাখা। কাজেই পদ্ধতির প্রশ্নটাই এখন বড়।"

প্রশ্ন : এই প্রশ্নের সংগে অর্থনীতির প্রশ্নটাও তো রয়েছে, তাই না?

ডক্টর আরিয়েন : সেটা তো আছেই। এবং সে এক বিরাট সমস্যা।

আমাদের অর্থনৈতিক সম্পদ খুবই কম এ মুহূর্তে। ভবিষ্যতে তা হয়তো আরো কমবে।

প্রশ্ন : কেন ?

ডক্টর আরিয়েন : কারণ আমাদের ওপর একটা বিরাট আগ্রাসন চলছে। সেই সংগে চলছে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবরোধ। শিক্ষাব্যবস্থার ওপরেও এর গভীর প্রভাব পড়ছে। প্রায়োগিক শিক্ষার কথাই ধরুন না। যাবতীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এতোদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা হতো। যেমন ট্র্যাক্টর। শিক্ষাব্যবস্থার অবকাঠামোর একটা বড় অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা জিনিষপত্রের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই সামনের দুই কি তিন বছর আমাদের খুবই কঠিন সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন : ঐসব যন্ত্র বা সাজসরঞ্জাম কি অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানি করা যায় না ?

ডক্টর আরিয়েন : হয়তো যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থার অবকাঠামোটাই হয়তো পাল্‌টাতে হবে। এবং সেটা পাল্‌টাতে গেলে যে পরিমাণ টাকা দরকার, তা আমাদের নেই।

প্রশ্ন : শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লবী নিকারাগুয়া, যা জানা যায়, অসাধারণ কৃতিত্বের নজির রেখেছে। কিন্তু নিকারাগুয়ার আর্থিক সম্বল যেহেতু সীমিত, সেহেতু একটানা আগ্রাসন ও অর্থনৈতিক সংকটের ফলে একদিন এই অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে কি ?

ডক্টর আরিয়েন : আমার তো সেটাই মনে হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৮৩ সালের পরিসংখ্যানের সংগে ১৯৮৪ সালের পরিসংখ্যানটা যদি মিলিয়ে দেখেন তো দেখতে পাবেন যে তিরাশিতে যতোজন স্কুলের গণ্ডী পেরিয়েছিল, চুরাশিতে ততোজন পেরোয়নি। চুরাশির হার কিছু কম। শতকরা ৩.৬ ভাগ কম। আর এ-বছরের হার হবে মোটামুটি গেল বছরের মতো। তবে একটা কথা, ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা সব সময়ে আসল ছবিটা দেয়না। যেমন, এ-মুহূর্তে আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রী লড়াই করছেন, যুদ্ধ করছেন। মুক্ত নিকারাগুয়ার জন্য যে ব্যাপারটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, চাষী, ক্ষেতমজুর ও শ্রমিক-দের ঘর থেকে ঢের বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া শিখতে আসছেন। গেল বছর ঐ শ্রেণী থেকে আমরা ৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পেয়েছিলাম। এ-বছর পেয়েছি ১০ লক্ষ। আমাদের উদ্দেশ্য হলো এই সংখ্যাটা আরো ৫ লক্ষ বাড়িয়ে তোলা। মনে রাখা দরকার, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাদে এ-দেশের অন্য কোনো শ্রেণীই বিপ্লবের আগে শিক্ষালাভের, লেখাপড়া শেখার বিন্দুমাত্র সুযোগ পায়নি। গ্রামের মানুষ, মেহনতী মানুষ, শহরের শ্রমিকশ্রেণী লেখাপড়া

শেখার সুযোগ থেকে ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিচে যে বিশাল চাষী-মজদুর শ্রেণীর স্থান ছিল এবং যাঁরা নানান দিক দিয়ে বঞ্চিত ছিলেন তাঁদের আমরা বলি "ক্লাসেস পপুলারেস" (clases populares)। এই শ্রেণী থেকে আসা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কিন্তু বেড়েছে। প্রাপ্ত-বয়স্কদের শিক্ষাক্রমে আজ যাঁরা সামিল তাঁরা এই শ্রেণীর মানুষ। এবং বিপ্লবের আগে, অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে লেখাপড়া শেখার কোনো সুযোগই তাঁদের ছিলনা। আজ তাঁরা সে সুযোগ পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়। তাঁরা আজ শিক্ষা দাবি করছেন। শিক্ষকদের সংখ্যার হিসেব নিলেও ছবিটা স্পষ্ট হবে আপনার কাছে। ১৯৮০ সালে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল বারো হাজার। ১৯৮৪ সালে তিপ্পান্ন হাজার। এ'দের অধিকাংশই নিয়োজিত রয়েছেন প্রাপ্ত-বয়স্কদের শিক্ষায়। চাষী-মজদুর শ্রেণী আমাদের দেশের মেরুদণ্ড, রক্তমাংস, পেশী। তাঁরা লেখাপড়া শিখলে তবেই আমাদের নতুন সমাজ, নতুন মানুষ গড়ার স্বপ্ন সফল হবে।

প্রশ্ন : প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থাটা বোধহয় সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আলাদা ?

ডক্টর আরিয়েন : হ্যাঁ, ঠিক তাই। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থাটা হলো বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা। এ-জন্য আলাদা ক্লাশ হয়।

উপশিক্ষামন্ত্রীকে এবার উঠতে হলো জরুরী বৈঠকের তাড়ায়। বিদায় নেবার আগে তিনি শিক্ষামন্ত্রকের শিক্ষা পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালিকা কাতেরিনাকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সংগে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। রসিকতা করে বললেন : "এ-দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় এই তরুণীর নখদর্পণে। আপনার প্রশ্নের উত্তর এ-মেয়েটি যতো ভালো দিতে পারবে, এ-দেশে আর কেউ তা পারবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া ইংরিজী ভাষাটা কাতেরিনার মাতৃভাষা, স্প্যানিশের চেয়েও বোধকরি ভালো বলে। কাজেই এই সুন্দরীর সংগে আলাপ করতে থাকুন, আমি পালাই।"

রূপসী কাতেরিনা—শিক্ষাপরিকল্পনা বিভাগের পরিচালিকা—তাঁর হাতের মাল্‌বোরোর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন : "বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করার পর থেকেই আমি শিক্ষাবিভাগের সংগে যুক্ত। ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত আমি ছিলাম 'জাতীয় সাক্ষরতা অভিযানে।' তারপর আমায় নিয়ে যাওয়া হলো শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বিভাগে। বছরদুয়েক কাজ করেছি সেখানে। এ-বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কাজ করছি শিক্ষা-পরিকল্পনা বিভাগে।"

প্রশ্ন : বিপ্লবের সাফল্যের পর এ-দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে তার মধ্যে কোন্‌গুলো আপনার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ?

কার্তেরিনা : দুটো বড় ঘটনা বা কাজের কথা বিশেষভাবে বলা যায়। প্রথমত সাক্ষরতা অভিযান। আমাদের দেশে বিপ্লবের পর শিক্ষাব্যবস্থায় যে বিরাট ও আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে, সাক্ষরতা অভিযান হলো তার ভিত্তি। ঐ আমূল পরিবর্তন বা রূপান্তর সমানে ঘটে চলেছে। আমরা বেঁচে রয়েছি তারই মধ্যে। এবং এই রূপান্তর পূর্ণাঙ্গ হতে অনেক সময় লাগবে। সর্বহারা শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলার ধারণাটা উঠে এসেছে সাক্ষরতা অভিযান থেকে। আমাদের দেশে, বিপ্লবের আগে নিরক্ষরতার হার ছিল—সাধারণভাবে শতকরা ৫৩ জন। গ্রামের দিকে অবস্থাটা ছিল আরো ভয়ানক। গ্রামবাসীদের শতকরা ৯০ জন বিলকুল নিরক্ষর ছিলেন। সকল দেশবাসীকে লিখতে পড়তে শেখানো হলো বিপ্লবের একেবারে গোড়ার কথা, যাতে সকলে নতুন নতুন প্রয়োজনীয় জিনিষ ও কাজ শিখতে পারে এবং সবাই যাতে অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনে শরীক হয়, সামিল হয়। কাজেই ক্ষমতা দখলের পর সাক্ষরতা অভিযান ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কাজ। আমাদের বিপ্লবী নেতারা ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসেই এই অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন। জেনারেল সান্‌দিনো তাঁর রাজনৈতিক নীতিমালায় বলে গেছেন, নিকারাগুয়ায় বিপ্লবের পর বিপ্লবীদের একটা অন্যতম প্রাথমিক কাজ হবে এ-দেশের জনগণকে লেখাপড়া শেখানো। জনগণের কাছে সান্‌দিনিস্তা বিপ্লবীদের এটা ছিল এক বিরাট বৈপ্লবিক অংগীকার। এক জাতীয় সাক্ষরতা অভিযানের প্রথম বৈপ্লবিক পরিকল্পনাটা লিখে ফেলা হয় সেই ১৯৭৮ সালে,—দেশের বাইরে। বিপ্লবীরা তখনো সোমোসার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। ক্ষমতা দখলের সংগে সংগেই বিপ্লবীরা সাক্ষরতা অভিযানের পরিকল্পনাটা কাজে পরিণত করার উদ্যোগ নিলেন। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের ফলে দেশের তখন ভগ্নদশা। তার ওপর আমাদের অর্থনীতিও তখন একেবারে বিপর্যস্ত। মনোবল ছাড়া অন্য কোনো সম্বলই তখন আমাদের ছিল না। এরকম চরম অবস্থায় জাতীয় সাক্ষরতা অভিযানের মতো এতো বিরাট একটা উদ্যোগ কতোটা সফল হবে সে-সম্পর্কে—সত্যি বলতে কি—বিপ্লবী কমাণ্ডারদের মনেও সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল। কিন্তু আমাদের সাফল্যের পথ সুগম হলো আন্তর্জাতিক সংহতির দরুণ।

প্রশ্ন : কোন্ কোন্ দেশ ঐ সাক্ষরতা অভিযানের ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করেছিল ?

কাতেরিনা : আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল সুইডেন, ফ্রান্স, স্পেন, পশ্চিম জার্মানী, ফিন্‌ল্যাণ্ড। কিউবা আর বিভিন্ন সমাজবাদী দেশ যে সাহায্য জুগিয়েছিল, সেটাও আমরা কোনোদিন ভুলতে পারিনা। ক্যানাডার ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও নাম করতে হয়। মেক্সিকো সমেত কোনো কোনো লাতিন আমেরিকান দেশও বাদ পড়েনি, যেমন একুয়াদোর, পেরু, বলিভিয়া। নিকারাগুয়ায় যে সাক্ষরতা অভিযান চলছিল, তাতে গোটা বিশ্বই ছিল উৎসাহী।

প্রশ্ন : এই অভিযানের প্রস্তুতি নিতে কতো সময় লেগেছিল?

কাতেরিনা : প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয় ১৯৭৯ সালে। শেষ হয় ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে। অভিযান শুরু হলো তেইশে মার্চ, আর শেষ হলো একুশে আগস্ট, ১৯৮০। শহরের হাইস্কুল থেকে আমরা ৬০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়েছিলাম, গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য। শহরের লেখাপড়া জানা শ্রমিকদেরও আমরা সংগঠিত করেছিলাম যাতে তাঁরাও নিরক্ষর শ্রমিকদের (নগর এলাকায়) লেখাপড়া শেখাতে পারেন এই অভিযানের অংশীদার হিসেবে। সাক্ষরতা অভিযানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে আগ্রহের এক বিরাট তরঙ্গ উঠলো যেমন, তেমনি সনাতন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রণালীতেও লাগলো একটা অভূতপূর্ব ধাক্কা। অভিযানের পর আমরা সমাজের সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের মতামত নিতে শুরু করলাম, লোকে কী ধরণের শিক্ষা চায় ও আশা করে, সে-সম্পর্কে। কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত কর্মচারী, ইন্টেলেক্‌চুয়াল, মহিলা সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্রছাত্রী—এ-দেশের সব ধরণের মানুষের মতামত নিতে থাকলাম আমরা জাতীয় ভিত্তিতে।

প্রশ্ন : এটা আপনারা করলেন কী করে?

কাতেরিনা : সাক্ষরতা অভিযানের সময়ে আমরা এই গোটা পরিকল্পনাটার একটা জাতীয় কাঠামো গড়ে তুলেছিলাম। জাতীয় পর্যায়ে, আঞ্চলিক পর্যায়ে, পৌর পর্যায়ে আর পল্লী বা পাড়ার পর্যায়ে। প্রতিটি পর্যায়ে ও স্তরে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিনিধিরা ছিলেন। গোটা দেশটাই ছিল পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে। শিক্ষা সম্পর্কে জনমত নেবার ব্যাপারে এই ব্যবস্থাটাই কাজে লাগানো হয়েছিল। ভবিষ্যতে জনগণ কিরকম, কি ধরণের শিক্ষা চান সেটা যাচাই করে নেবার জন্য কিছু বন্দোবস্তও করেছিলাম আমরা। যেমন, প্রশ্নমালা। এইভাবে সমাজের প্রতিটি স্তরের মতামত জড়ো করে আমরা একটা জাতীয় অভিমত ছেঁকে নিলাম। এ থেকেই রচনা করলাম আমরা আমাদের মূল শিক্ষানীতি। 'নিকারাগুয়ার নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও

মৌলনীতি' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছি আমরা। রাজনীতি, মতবাদ ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের এই যে বিশেষ চিন্তাধারা, এর মূলে রয়েছে নিখাদ গণতন্ত্র। এক ব্যাপক ও তীব্র শিক্ষা-আন্দোলনে সামিল হয়ে দেশের সর্বস্তরের মানুষ শিক্ষা সম্পর্কে খোলামনে, অকপটে যেসব দাবি ও মত জানিয়েছেন, তারই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে নিকারাগুয়ার শিক্ষা-মতবাদ, শিক্ষানীতি, শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের আর্থিক ক্ষমতা নিতান্তই সীমিত বলে, চূড়ান্ত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছোতে পারিনি এখনো। সমুচিত প্রসার ঘটাতে পারিনি এখনো। তবু, সংগতির অভাব, একটানা আগ্রাসনের চাপ ইত্যাদি চরম অসুবিধে সত্ত্বেও আমরা যা করতে পেরেছি তা কম নয়। নিকারাগুয়ার ইতিহাসে এই প্রথম আমরা দেশের শিক্ষাক্রম ঢেলে সাজিয়েছি, আমূল পরিবর্তন এনেছি, পাঠ্যবই, শিক্ষার বিষয় এগুলোকে প্রাসংগিক করে তুলেছি, অর্থপূর্ণ করে তুলেছি। এই ১৯৮৫ সালে আমরা আমাদের নিজেদের পাঠ্যবই বের করছি। এগুলো আমাদেরই শিক্ষাবিদ্‌দের লেখা।

প্রশ্ন: এর আগে বা এতোদিন এ দেশে যেসব বই স্কুল কলেজে পাঠ্য ছিল, সেগুলো কি নিকারাগুয়ানদের লেখা নয়?

কাতেরিনা: না। বিপ্লবের আগে আমরা অন্যান্য লাতিন আমেরিকান দেশ থেকে বই কিনতাম। তাছাড়া ডিক্‌টেটর সোমোসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে তথাকথিত 'প্রগতির মৈত্রী'তে সামিল হবার পর (লাতিন আমেরিকায় বিপ্লববাদ ও বামপন্থী আন্দোলন বা চিন্তাধারার পথ বন্ধ করা এবং মার্কিনী মতবাদ ও প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি 'Alliance for Progress' নামে এক কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন: —লেখক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একদল বিশেষজ্ঞ মধ্য আমেরিকায় এসেছিলেন। তাঁরা গুয়াতেমালা, অন্দুরাস, কস্তা রিকা ও নিকারাগুয়ার কিছু বিশেষজ্ঞকে জড়ো করেন। বিশেষজ্ঞদের এই দল আমাদের জনগণের জন্য বই লিখতে থাকেন। বলা বাহুল্য, সেই বইগুলো নিকারাগুয়ার জনগণের স্বার্থে লেখা হয়নি। লেখা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোমোসাশাহীর স্বার্থ ও চাহিদা অনুসারে। এইসব বই পড়িয়ে তো আর আমাদের পক্ষে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ এই বইগুলো পুঁজিবাদী দেশগুলোর মতবাদে ঠাসা। সাম্রাজ্যবাদী মতবাদে ভরা। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের বইগুলো, যেমন, ছিল মিথ্যেকথার, বিকৃতির পাহাড়। সান্‌দিনোর নাম একবারও উল্লেখ করা হয়নি। আমাদের দেশের, দেশের মানুষের আসল ইতিহাস, শোষণ ও নির্যাতনের, সংখ্যালঘু এক শ্রেণীর বড়লোক হওয়ার এবং তার মূল্যে অসংখ্য মানুষের ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের ইতিবৃত্ত কখনোই জানতে দেওয়া হয়নি। আজ আমরা চেষ্টা করছি আমাদের ছেলেমেয়েদের সামনে দেশের আসল ইতিহাসটাকে তুলে ধরতে।

প্রশ্ন : আপনাদের এই নতুন বইগুলো কি শুধু ছেলেমেয়েদের জন্য? নাকি প্রাপ্তবয়স্করাও এগুলো পড়তে পারবেন?

কাতেরিনা : প্রধানত ছেলেমেয়েদের জন্য। তবে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা কার্যক্রম,—বাস্তবিকপক্ষে সাক্ষরতা অভিযান থেকে বেরিয়ে আসা একটি নিজস্ব কর্মসূচী। যেসব বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা সাক্ষরতা অভিযানের দরুণ লিখতে পড়তে শিখেছেন, তাঁরা যাতে লেখাপড়া ও শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারেন সেজন্য একটা বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষানীতি তৈরী করা হয়েছে। তাঁদের বইগুলোও আলাদা ধরণের। লেখাপড়া শেখার দিকে যেভাবে এগোয়, বয়স্ক লোকেরা তো আর সেভাবে এগোন না। কাজেই তাঁদের শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিটা আলাদা। সেটা ছোটদের মতো আনুষ্ঠানিক নয়। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা দেবার মূল লক্ষ্য হলো : ভাষার ওপর তাঁদের দখল বাড়ানো যাতে তাঁরা খবরের কাগজ, টেক্নিকাল বই পত্রিকা এসব পড়তে পারেন এবং নতুন জ্ঞান যাতে তাঁরা ফলদায়কভাবে সরাসরি কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন, তাঁদের দক্ষতা যাতে বাড়ে। কাজেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ কেতাব জোর করে তাঁদের পড়ানোর কোনো দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, রাজনৈতিক শিক্ষাটা তাঁদের জন্য জরুরী। রাজনীতির একটা স্পষ্ট দিকচেতনা তাঁদের শিক্ষার মাধ্যমে দিতেই হবে। সকলের মনে রাজনৈতিক চেতনার মাত্রা বাড়িয়ে তোলা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটা বড় লক্ষ্য। সাক্ষরতা অভিযানে, যেমন, প্রাপ্তবয়স্কদের লেখাপড়া শেখানো হয়েছিল আমাদের ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে। সান্দিনো কে ছিলেন, কার্লোস ফন্সেকাই বা কে, তাঁরা কী চেয়েছিলেন, সান্দিনিস্তারা 'বিপ্লব' বলতে কী বোঝেন, জনগণ কিভাবে সংগ্রাম করেছেন, আমাদের বৈপ্লবিক আদর্শগুলো কী, আমাদের লক্ষ্যগুলো কেমন—ইত্যাদি। কাজেই প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাক্রম হলো কর্মকেন্দ্রিক এবং রাজনৈতিক চেতনা-ভিত্তিক। ফলে স্কুলকলেজের শিক্ষাক্রম থেকে এটা আলাদা। তবে একদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরা ঠিক একই কাজ করছি। শিক্ষাপদ্ধতিটা আলাদা, কিন্তু দৃষ্টিভংগীতে কোনো ফারাক নেই। ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থাতেও তত্ত্ব আর বাস্তবিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, চিন্তা আর কাজ,—এই দুটোকে জুড়ে দেওয়াই হলো আমাদের লক্ষ্য। পুঁজিবাদী শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষকে শেখানো হয় শুধু তত্ত্বের জাল বিস্তার করতে, তত্ত্বকথা আওড়াতে, প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করতে। বাস্তবে সেগুলো প্রয়োগ করতে শেখানো হয় না। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা যা শিখেছে, কাজেও পরিণত করছে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে। ছেলেমেয়েদের জন্য, আমরা যেমন, কিছু নতুন পাঠ্যবিষয়, তৈরী করেছি : শ্রম, উৎপাদন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা যা শিখছে, সেগুলো—এই বিষয়গুলোর দৌলতে—ধরুন কৃষিতে প্রয়োগ করতে পারছে।—আমি বোধহয়

একটু বেশী কথা বলছি তাই না? দাঁড়ান, আমাদের নতুন বইগুলো আপনাকে দেখাই একবার।

[কাতোরিনা একটা আলমারি থেকে কিছু নতুন বই আনলেন। একনজর দেখে নিলাম। ভারী সুদৃশ্য। সুন্দর গোটা গোটা ছাপা। অনেক ছবি। লেখাগুলো সংক্ষিপ্ত।]

প্রশ্ন : আপনি খানিক আগে বললেন যে বিপ্লবের আগে নিকারাগুয়া বাইরের দেশ থেকে বই আমদানি করতো। আর আপনাদের তৈরী নতুন বইগুলো বেরোতে চলেছে এ-বছর। এবং এগুলোই নিকারাগুয়ার ইতিহাসে প্রথম স্বদেশী বই। তা, ক্ষমতা দখলের সময়, অর্থাৎ ১৯৭৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আপনারা কী ধরণের বই ব্যবহার করেছেন পাঠ্যবই হিসেবে?

কাতোরিনা : ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৩/৮৪ সাল পর্যন্ত আমাদের আসলেই কোনো পাঠ্যবই ছিল না। শিক্ষকরা বিপ্লবের আগের যুগের বই-গুলো থেকে প্রয়োজনমতো মালমশলা নিতেন। কিন্তু ক্লাশে তাঁরা ঐ বই-গুলোকে পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহার করতেন না। আমরা শিক্ষাপদ্ধতিগত কিছু নীতি ও লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিলাম, ছকে নিয়েছিলাম। এই অন্তর্বর্তী সময়ে আমাদের কাজ ছিল ছাত্রছাত্রীদের মনে—বৈপ্লবিক অর্থে—শিক্ষা সম্পর্কে একটা নতুন ধারণা, চিন্তাধারা জাগিয়ে তোলা। তাদের সচেতন করে তোলা।

প্রশ্ন : তার মানে ছাত্রছাত্রীদের হাতে এখন কোনো পাঠ্যবই নেই?

কাতোরিনা : সেই অর্থে কোনো পাঠ্যবই নেই। আমরা আসলে পর্যায়ক্রমে এগিয়েছি। শুরু করেছিলাম প্রথম শ্রেণী থেকে। ১৯৮২ সাল থেকে প্রথম শ্রেণীর সব ছেলেমেয়ের পাঠ্যবই রয়েছে,—কিভাবে লেখাপড়া শিখতে হবে তার বই। বাচ্চাদের লিখতে পড়তে শেখানোর পদ্ধতিটাই আমরা পাল্টে দিয়েছি একেবারে। এ-ব্যাপারে, জাতীয় (সাক্ষরতা) অভিযানের অভিজ্ঞতাটাকে কাজে লাগানো হয়েছে। এখনকার পদ্ধতিটা একেবারে নতুন। এবং আমরা শুরু করেছিলাম খুব সহজ সরল ও নাতিদীর্ঘ বই দিয়ে। প্রথম শ্রেণীতে যখন ঐ বই পড়া হচ্ছে, তখন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ চালাতে থাকি। এইভাবে শিক্ষামূলক বইগুলো স্তরে স্তরে পাল্টানো হয়েছে। কাজেই, যেসব ছেলেমেয়ে প্রথম শ্রেণীতে লেখাপড়া শেখা শুরু করেছিল আমাদের নতুন পদ্ধতিতে, তাদের ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর মতো পাঠ্যবই আমরা তৈরী করে ফেলেছি এর মধ্যে।

অন্যান্য পাঠ্যবই প্রসংগে বলি, এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোর পাঠ্যবই বিপ্লবের পর একেবারে বাতিল করে দেবার দরকার ছিল না। যেমন ধরুন, বিজ্ঞান বিষয়ক স্কুলপাঠ্য বই। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বা

অংকের যেসব পাঠ্যবই বিপ্লবের আগে ছিল, সেগুলো নিয়ে তেমন সমস্যা হয়নি। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান, ভাষা—এইসব বিষয়ের বইগুলোয় প্রাক্-বিপ্লব মতবাদ ছিল রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেঁধিয়ে। কাজেই এই ধরণের বইগুলো থেকে আমরা দরকার মতো মালমশলা সংগ্রহ করে এক নতুন পদ্ধতিতে সেগুলোকে ব্যবহার করেছি অন্যভাবে। খোদ বইগুলো আর পাঠ্যবই হিসেবে পড়ানো হয়নি।

প্রশ্ন : পুরোনো বই থেকে প্রয়োজনীয় মালমশলা নিয়ে নতুন পদ্ধতিতে সেগুলো কিভাবে প্রয়োগ করা হবে, এই সিদ্ধান্ত কি শিক্ষকরা যে যার মতো নিতেন ?

কাতেরিনা : শিক্ষকদের নিজস্ব পুস্তিকা ছিল, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষানীতি সম্পর্কে। সেই অনুসারে কাজ করতেন তাঁরা। প্রচুর অসুবিধের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে তাঁদের। এবং সব সময়ে তাঁরা যে সকলের প্রত্যাশা মিটিয়েছেন, তাও নয়। কিন্তু তবু তাঁরা সফল, কারণ তাঁদের কাজের ফলে আমরা নতুন নতুন পাঠ্যবই লেখার, নতুন পদ্ধতি গড়ে তোলার সময় পেয়েছি। শিক্ষকরা এমনভাবে পড়িয়েছেন যাতে আমরা যথাসম্ভব জায়গা ও অবকাশ পাই। বড় কঠোর সময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছি আমরা তখন। শিক্ষার মান ও উৎকর্ষ সে-সময়ে, বলা বাহুল্য, পড়ে গিয়েছিল। এখন আমরা আমাদের নতুন পাঠ্যবইগুলোর সাহায্যে সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছি। সে-সময়ে শিক্ষকদের সমুচিত প্রশিক্ষণ দেবার সুবন্দোবস্তও ছিল না। এখন আমরা একটা কার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে নিয়েছি। এ-মুহূর্তে আমরা যেভাবে এগোচ্ছি তাতে সব উদ্যোগই ফলপ্রসূ হবে বলে আমরা মনে করি। তবে হ্যাঁ, এখনো অনেক সমস্যা রয়েছে। আমরা যা যা চাই তার সবকিছু করে উঠতে পারছি না।

প্রশ্ন : কম্পানিয়েরা, এই নতুন বইগুলো লিখতে কিরকম সময় লেগেছে, একটা আন্দাজ দিতে পারেন ?

কাতেরিনা : আমরা স্কুলের এক একটা শ্রেণী ধরে ধরে কাজ করে গিয়েছি। প্রাথমিক স্কুলের প্রথম চারটি শ্রেণীর বই তৈরী করা ছিল আমাদের গোড়ার কর্তব্য। কারণ প্রথম চারটি শ্রেণীর পাঠ্যবই ও শিক্ষাব্যবস্থা তৈরী করে ফেলতে পারলে বাচ্চাদের আর নিরক্ষরতার অভিশাপে ফিরে যেতে হবে না কখনো। তাদের শিক্ষার বুনিয়াদটা পাকা হয়ে যাবে। কাজেই প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আমরা প্রথম চারটি বই তৈরী করে ফেললাম। সেই সংগে গড়ে ফেললাম এই চারটি শ্রেণীর বিষয়গুলো পড়ানো ও পড়ার পদ্ধতি ও পরিকল্পনা। এটা করতে দুবছর লেগে গেল। তারপর আমরা পঞ্চম ও ষষ্ঠ

শ্রেণীর পাঠ্যবই ও শিক্ষাপদ্ধতি তৈরী করে ফেলেছি। এবারে আমরা এগোচ্ছি সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর দিকে। সেটা হলো আপনার মাধ্যমিক পর্য্যায়। আসছে বছর (১৯৮৬) ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা সব কটা বই বের করবো। অর্থাৎ ছিয়াশির ফেব্রুয়ারি থেকে প্রাথমিক স্তরের প্রতিটি শ্রেণীর সমস্ত বই আর শিক্ষাপ্রণালী তৈরী থাকবে। বইগুলো চলে যাবে ছেলেমেয়েদের হাতে।

প্রশ্ন ঃ কতোগুলো বই ছাপিয়েছেন আপনারা ?

কাতেরিনা ঃ দশ লক্ষেরও বেশী। এই যে বইগুলো দেখছেন, এগুলো ছাপা হয়েছে পূর্ব জার্মানীতে। বই ছাপানোর ব্যাপারে পূর্ব জার্মানী আমাদের সাহায্য করেছে। কারণ এতগুলো বই একবারে ছাপানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। প্রথমে আমরা অবশ্য নিজেরাই ছেপেছিলাম,—প্রথমদিকের বইগুলো। সেগুলো এতো সুন্দর ছিল না। 'বার্রিকাদা' আর 'নুয়েভো দিয়ারিয়ো' এই দুই খবরকাগজ যে ছাপাখানা থেকে বেরোয়, সেখানেই ছাপা হয়েছিল বইগুলো। কমদামী কাগজে। কিন্তু বইগুলো ছিল কাজের। সে-সময়ে।

প্রশ্ন ঃ নিকারাগুয়ার জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান সম্পর্কে একটা প্রশ্ন আছে। এতোক্ষণ আপনি যা বললেন তাতে বিপ্লব-পরবর্তী নিকারাগুয়ার 'নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি'র উল্লেখ একাধিকবার পেয়েছি। এই প্রসংগে জানতে চাই, ঐ অভিযানে গ্রামের নিরক্ষর জনগণকে লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে কোন্ বিষয়-গুলোকে বা কোন্ ব্যাপারগুলোকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ঐ অভিযানে শিক্ষাপদ্ধতির কাঠামো, মূল নীতি ও ব্যবহারিক প্রণালী কিরকম ছিল ?

কাতেরিনা ঃ নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাপদ্ধতির একটা কাঠামো তৈরী করার আগে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা খুঁটিয়ে চর্চা করেছিলাম, পড়াশুনো ও চিন্তা করেছিলাম। যেমন, পাউলো ফ্রেইরের লেখা ও অভিজ্ঞতা হজম করেছিলাম আমরা রীতিমতো। (পাউলো ফ্রেইরে হলেন ব্রাজিলের এক সমাজ সচেতন ও গণদরদী বিপ্লবী শিক্ষাবিদ। তাঁর লেখা দুটি বিখ্যাত বই : Pedagogy of the Oppressed এবং Cultural Action for Freedom : —লেখক)। ক্ষমতা দখলের আগে গোপনে নিরক্ষরদের শিক্ষা দেবার কিছু অভিজ্ঞতা তো আমাদেরই ছিল। খ্রীষ্টান কিছু দল কৃষকদের সংগে কাজ করতেন, তাঁদের লিখতে পড়তে শেখাতেন। তবে সেই শিক্ষা দেবার লক্ষ্যই ছিল, কৃষকদের গণসংগ্রামে সামিল করা। অর্থাৎ সেই খ্রীষ্টান শিক্ষকদের উদ্দেশ্যটা ছিল রাজনৈতিক। ঐসব আত্মগোপনকারী শিক্ষক তলায় তলায় যে শিক্ষা-অভিযান চালিয়েছিলেন তার ফলাফল আমরা খুঁটিয়ে বিচার বিবেচনা

করেছি। ঐসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, বিশেষভাবে বলতে গেলে এ-দেশের প্রশান্ত মহাসাগর-উপকূল এলাকায় আর উত্তরাঞ্চলে। বলা বাহুল্য, গ্রামে গ্রামে। ঐ কাজগুলো হয়েছিলো পাউলো ফ্রেইরের শিক্ষাপদ্ধতির প্রেরণায়। কাজেই ঐ অভিজ্ঞতাগুলো, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঐ শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগরীতি,—এইসব আমরা গভীরভাবে চর্চা করেছিলাম। ভেবেছিলাম ফ্রেইরের রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারা নিয়ে।

কিউবার অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা নিয়েছিলাম আমরা। কারণ, কিউবা আমাদের খুব কাছের দেশ। তাছাড়া কিউবা এক সমাজবাদী, বিপ্লবী দেশ,—যদিও কিউবার বিপ্লব ঘটেছিল একটা আলাদা ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে। এই পার্থক্যের দিকটা আমাদের ধরতে হয়েছিল হিসেবের মধ্যে। সে-সময়ে কিউবা যা করেছিল (সেই ১৯৬১ সালে) সেটাকে যান্ত্রিকভাবে নিকারাগুয়ায় প্রয়োগ করার, অবশ্যই, কোনো যুক্তি নেই। তবে কিউবানদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার ছিল। অতএব আমরা কিউবা গেলাম। সেখানে দিন পনেরো থাকলাম। তাঁরা যা করেছিলেন নিরক্ষরতা দূর করার ক্ষেত্রে, সেটা, সেই পদ্ধতিটা জেনে নিলাম। তাঁদের অভিজ্ঞতার ইতিবাচক দিকগুলো থেকে শিক্ষা নিলাম।

লাতিন আমেরিকার বামপন্থী দল ও সংগঠনগুলোও সাহায্য করেছিল আমাদের। কলোম্বিয়া, বলিভিয়া ও একুয়াদোরের বামপন্থীরা তাঁদের শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যে কাজ করে করে এক ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে নিয়েছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতাগুলো তাঁরা আমাদের জানিয়ে দিলেন।

এইভাবে, এতো ধরণের অনুশীলন, লেখাপড়া ও ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের প্রকল্পে পৌঁছোলাম। আমরা ঠিক করে নিলাম যে, কোনো শিক্ষা প্রকল্প গড়ছিনা আমরা। আমরা গড়ে নিচ্ছি একটা রাজনৈতিক প্রকল্প যেটা শিক্ষার দিক দিয়েও অর্থপূর্ণ, যেটার একটা শিক্ষামূলক মাত্রা রয়েছে। এটা কিন্তু বেশ আলাদা ব্যাপার।

আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল জনগণকে সংঘবদ্ধ করা, তাঁদের রাজনৈতিক প্রত্যয়কে জোরালো করা। 'বিপ্লব' সম্পর্কে তাঁদের রাজনৈতিক প্রত্যয়, ধ্যান-ধারণাকে সুঠাম, বলিষ্ঠ করে তোলা। সেই সংগে সান্দিনিস্তা মুক্তি ফ্রন্টের প্রতি তাঁদের আস্থা বাড়ানো। আমরা চেয়েছিলাম, তাঁদের ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে। এবং সেই বাস্তব অবস্থা রূপান্তরিত করার পদ্ধতিগত হাতিয়ার তাঁদের হাতে তুলে দিতে। এটাই ছিল আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এটাই করতে চাইছিলাম আমরা তাঁদের লিখতে পড়তে এবং কিছু প্রয়োজনীয় হিসেব, অংক কষতে শেখানোর মাধ্যমে। একেবারে বুনিয়াদী অংক। পাঁচমাসের মধ্যে তো আর সবকিছু একসংগে করে ফেলা সম্ভব নয়।

তাই অংকের দিকটা সেই অর্থে বাধ্যতামূলক ছিল না। কোনো কোনো অঞ্চলে কৃষকরা পাঁচমাসে শুধু লেখাপড়া শিখে নেবেন বলে ঠিক করলেন। অংকটা তাঁরা তখনকার মতো মুলতুবি রাখলেন। প্রথমে আমরা এটা চাইনি। কিন্তু কাজে নামার পর দেখতে পেলাম যে পরিস্থিতির হেরফেরে পরিকল্পনা পাল্টাতে হবে। হলোও তাই।

লিখতে পড়তে শেখানোর পরিকল্পনায় প্রথম পাঁচটি পাঠ ছিল আমাদের বিপ্লবের ইতিহাস বিষয়ে। সান্দিনো থেকে সান্দিনিস্তা মুক্তিফ্রন্ট পর্যন্ত। একটি ছোট বাক্য, একটি শব্দ, খুবই অর্থপূর্ণ একটি শব্দের মাধ্যমে তাঁদের জানানো হলো আমাদের বিপ্লবের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি কেমন ছিল, সান্দিনো কে ছিলেন, কার্লোস ফন্সেকা কে ছিলেন, সান্দিনিস্তা মুক্তিফ্রন্ট কিভাবে তৈরী হলো, একনায়কতন্ত্রের স্বরূপ কেমন ছিল, একনায়কতন্ত্রের দরুণ কেন জনগণকে অতো শোষণ ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে ঃ এই ধরণের আলোচনা। শিক্ষার প্রক্রিয়াটা শুরু হতো প্রথমে একটা ছবি দেখিয়ে। ধরুন, সান্দিনোর ছবি। ছবিটা দেখিয়ে শিক্ষক বা শিক্ষিকা প্রশ্ন করবেন— 'সান্দিনো সম্পর্কে তোমরা কি জানো ?"—এইবারে একটা সংলাপ, আলোচনা শুরু হবে। তারপর একটা শ্লোগানে এসে পৌঁছোবেন তাঁরা। পড়ুয়ারা এই শ্লোগানটা কয়েকবার পড়বেন। এই শ্লোগানের ভেতর থেকে একটি শব্দ তুলে নেওয়া হবে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে খুব অর্থপূর্ণ ও শক্তিশালী একটি শব্দ। শিক্ষার্থীরা এবারে এই শব্দটির নির্ভুল উচ্চারণ ও বানান শিখবেন। এইভাবে পড়া ও লেখার কাঠামোটা গড়ে উঠবে। ধাপে ধাপে। এই পদ্ধতিতে পাঁচটি পাঠ ছিল। তারপর আঠারোটা। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময়ে সান্দিনিস্তা জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের যে আঠেরো দফা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মসূচী ছিল, এই আঠেরোটা পাঠ সাজানো হয়েছিল সেই অনুসারে। যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সান্দিনিস্তা মুক্তি ফ্রন্ট কী করতে চায়। কৃষি সংস্কার কিভাবে করা হবে। ফ্রন্টের আবাসন-পরিকল্পনাটা কেমন। গণবাহিনী বলতে কী বোঝায়। শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের তাৎপর্য কী। 'ট্রেড ইউনিয়ন' কথাটার অর্থ কী, এবং মজদুর সমিতিগুলো কেমন। মহিলা-সমিতির কাজ কী, কেনই বা এই ধরণের সমিতি প্রয়োজন। অর্থাৎ একনায়কতন্ত্রের শোষণ-যন্ত্রে যে জনগণ যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত ও পিষ্ট, সেই জনগণের প্রতি সান্দিনিস্তা ফ্রন্টের অংগীকার ও প্রতিশ্রুতির একটা স্পষ্ট রূপরেখা দেওয়া ছিল ঐ আঠেরোটা পাঠে। বুঝতেই পারছেন, এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল রাজনৈতিক অর্থ ও তাৎপর্যে সম্পৃক্ত। এইভাবেই গ্রামের মানুষ লিখতে পড়তে শিখেছেন।

প্রশ্ন ঃ জাতীয় সাক্ষরতা অভিযানের দরুণ কতোজন নিরক্ষর লোক লিখতে পড়তে শিখে ফেললেন ?

কাতেরিনা ঃ চার লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার জন। নিরক্ষরতার হারটাকে আমরা শতকরা তিপ্পান্ন থেকে শতকরা বারোয় নামিয়ে এনেছিলাম। ছ'মাসের ভেতর।

প্রশ্ন ঃ স্কুল কলেজের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এই যে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লেন তাঁদের নিরক্ষর দেশবাসীদের লেখাপড়া শেখাতে, ঐ স্কুল কলেজ-গুলোর কী হলো সেই পাঁচ-ছ' মাসে।

কাতেরিনা ঃ সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল। সে-সময়ে সারা দেশ জুড়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা কাজই হচ্ছিল ঃ নিরক্ষরদের লিখতে পড়তে শেখানো। হাই স্কুলগুলোর ষাট হাজার ছাত্রছাত্রীকে আমরা এই কাজের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের লেখাপড়া শেখানোর পদ্ধতিটা কি ঐ ষাট হাজার ছেলেমেয়ের মোটামুটি জানা ছিল ?

কাতেরিনা ঃ হ্যাঁ। চারটি পর্যায়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে শিক্ষক-সমিতি ('আনদেন') থেকে আটজনকে বেছে নেওয়া হলো। এই আটজনকে এমনভাবে কাজ শেখানো হলো যাতে তাঁরা,—দ্বিতীয় পর্যায়ে,—আরো ছ'শো জনকে তৈরী করতে পারেন। এই ছ'শো জনও কিন্তু শিক্ষক। এই শিক্ষকদের দায়িত্ব ছিল দেশের সমস্ত শিক্ষককে পদ্ধতিটা শিখিয়ে দেওয়া। সে-সময়ে শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল মোটামুটি পনেরো হাজার। অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ে পনেরো হাজার শিক্ষক তৈরী হয়ে গেলেন। এঁরা তারপর সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে শিখিয়ে দিলেন পদ্ধতিটা। এই ছিল চতুর্থ পর্যায়। এইভাবে, গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার আগে শিক্ষাপদ্ধতিটা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল সকলকে।

প্রশ্ন ঃ এই কাজটা করতে সময় লেগেছিল কি রকম?

কাতেরিনা ঃ এক মাস। ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ। ছাত্রছাত্রীদের, অভিযানে বেরিয়ে পড়ার আগে টানা সাতদিন কাজ শেখানো হয়েছিল। আর হ্যাঁ, পাহাড়ে পাহাড়ে, গ্রামে গ্রামে ছাত্রছাত্রীরা যখন গ্রামবাসীদের লেখাপড়া শেখাচ্ছিল তখনো প্রতি শনিবার তারা যে যার এলাকায় জড়ো হতো একটা নির্দিষ্ট জায়গায়। আমাদের শিক্ষকরা সেখানে গিয়ে তাদের সংগে দেখা করতেন। প্রতি শনিবার শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা একবার করে কর্মশালায় সামিল হতেন ঐভাবে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দপ্তর থেকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো দরকারি বই, পুস্তিকা, শিক্ষার সরঞ্জাম, যাতে তারা নিরক্ষরদের লেখাপড়া শেখানোর পদ্ধতিটা বাস্তবিকভাবে আরো উন্নত করে তুলতে পারে।—গোটা ব্যাপারটা ছিল খুবই জটিল। আমরা স্পষ্ট জানতাম যে মাত্র এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ উন্নত মানের শিক্ষা দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাজেই সাক্ষরতা

অভিযানের মান উন্নত করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের সমানে সাহায্য সহযোগিতা জোগানো দরকার, সমানে তাদের কাজ শিখিয়ে যাওয়া দরকার। এইজন্যেই কর্মশালা বসতো প্রতি শনিবার। সেখানে তারা তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতো, মত বিনিময় করতো, শিক্ষকরা তাদের সাহায্য করতেন, তারা তাদের পদ্ধতিটা আরো ঝালিয়ে নিতো, ভুল শুধরে নিতো—এবং আবার ফিরে যেতো কর্মস্থলে।

প্রশ্ন: প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা দেবার জন্য এ-দেশের গ্রামে গ্রামে এখন কতোগুলো পাঠশালা রয়েছে?

কাতেরিনা: দেখুন, এই ধরণের পাঠশালা গ্রামে গ্রামে একের পর এক খুলে যাবার জন্য যে অর্থবল ও অবকাঠামো প্রয়োজন, তা আমাদের নেই। তাই যে সব গ্রামবাসী আজও নিরক্ষর তাঁরা নিয়মিত যে যার এলাকার পল্লী-উন্নয়ন দপ্তরে অথবা কোনো কৃষকের বাসায় জমায়েত হন। সাক্ষরতা অভিযানে যেসব কৃষক-শিক্ষার্থী সবচেয়ে ভালোভাবে লেখাপড়া শিখে নিয়েছিলেন, আজ তাঁরাই হলেন পল্লীশিক্ষক। তাঁদের আমরা বাছাই করে নিয়ে দু'মাস প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তাঁদের আমরা জানিয়ে দিলাম যে এখন থেকে তাঁরাই হবেন গ্রামের শিক্ষক। গ্রামের ভাইবোনদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব এইভাবে গ্রামের লোকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হলো। সাক্ষরতা অভিযানের পর শহরের ছেলেমেয়েদের ফিরে যেতে হলো নিজেদের স্কুলে, লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্য। সংগে সংগে তাদের জায়গায় নতুন লোক লাগাতে হয়েছে যাতে গ্রামের প্রাপ্তবয়স্কদের লেখাপড়া শেখা চালু থাকে। জনগণকে, মেহনতী জনতাকে শিক্ষিত করে তোলার অভিযান যাতে অপ্রতিহতভাবে এগোতে পারে। এইজন্য, শহরের ছেলেমেয়েরা যেই চলে এলো, অমনি গ্রামের শিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া হলো শিক্ষকতার দায়িত্ব,—তবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের পর।—কাজেই, যা দেখছেন, গণশিক্ষার অভিযান এক স্থায়ী প্রক্রিয়া। আজ, প্রতিটি গ্রামে, দেশের সর্বত্র প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাথমিক স্কুলের স্তরে শিক্ষা দেবার ব্যাপক বন্দোবস্ত রয়েছে। সেখানে তাঁরা সমাজ-বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের নানান বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করেন, এমনভাবে যাতে ব্যবহারিক জীবনে, কর্মক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের শিক্ষাটাকে কাজে লাগাতে পারেন। একজন কৃষককে দিয়ে অন্যজন কৃষকদের লেখাপড়া শেখানোর কাজটা সহজসাধ্য হয়নি। এ-দেশের কৃষকশ্রেণীর ভাবনাচিন্তা, ধ্যানধারণা ঐতিহাসিক কারণে এমন যে প্রথমে তাঁরা গাঁইগুঁই করছিলেন স্বশ্রেণীর, নিজেদের গ্রামেরই কোনো চাষীর বা শ্রমিকের নেতৃত্ব মেনে নিতে। তাঁদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতে হয়েছে। তাঁদের বোঝাতে হয়েছে যে শিক্ষালাভ করতে হলে কোনো কৃষককেই শিক্ষক হিসেবে মেনে নিতে হবে। এই

চাষী-শিক্ষকের ভূমিকা, অবশ্য, আসলে ঠিক শিক্ষকের নয়, বরং সহায়কের পথপ্রদর্শকের কারণ, সকলে একসংগে মিলে, সহযোগিতার ভিত্তিতেই লেখাপড়া করেন। নিজেদের মধ্যে সারাক্ষণ আলোচনা করেন। কাজেই শিক্ষক-চাষী আর পড়ুয়া-চাষীদের মধ্যে সম্পর্কটা অন্য ধরণের : সহযোগীর, সহগামীর।

—লিদিয়া এতোক্ষণ একটি কথাও বলেনি। মন দিয়ে সব শুনে যাচ্ছিলো। এবারে সে কাতেরিনার কথায় যোগ দিয়ে বলে উঠলো : "প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা বিষয়ে বেতারে প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায় একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। সারা দেশের মানুষ শুনতে পায় এই অনুষ্ঠান।"

প্রশ্ন : গ্রাম অঞ্চলে প্রত্যেক পল্লীতে রেডিয়ো আছে?

কাতেরিনা : অনেক দেশ আমাদের রেডিয়ো উপহার দিয়েছে, যাতে প্রতিটি শিক্ষা-সমিতি অন্তত একটা করে রেডিয়ো পায়। এখন নিকারাগুয়ায় এ-ধরণের পাঁচিশ হাজার সমিতি রয়েছে। এগুলোর নাম 'জনশিক্ষা সমিতি' ('কলেক্তিভোস এদুকাসিয়োন পপুলারেস')।

প্রশ্ন : এগুলো সবই গ্রামের সমিতি?

কাতেরিনা : হ্যাঁ, সবই গ্রামের ইউনিট।

প্রশ্ন : এক একটার আওতায় কতো বড়ো এলাকা পড়ে?

কাতেরিনা : মাঝেমাঝে বেশ অনেকটা এলাকা। এটা নির্ভর করে এলাকার ভৌগোলিক অবস্থার ওপর। কোনো কোনো জায়গায় লেখাপড়া শেখার জন্য গ্রামবাসীদের প্রতিদিন মোট পাঁচ-ছয় কিলোমিটার হাঁটতে হয়। কিন্তু শিক্ষালাভের আগ্রহ এখন গ্রামবাসীদের মধ্যে এতো তীব্র যে লম্বা পথ হেঁটে যেতে তাঁদের আপত্তি নেই। উত্তর সীমান্তে, যেমন, গ্রামবাসীরা পাঠশালায় লেখাপড়া শেখেন বন্দুক হাতে যাতে প্রতিবিপ্লবীরা আক্রমণ করলেই তাঁরা লড়তে যেতে পারেন। ঐ এলাকার স্কুলগুলোয় একদল শিক্ষার্থী যখন পাঠ নেন, আর একদল তখন রাইফেল হাতে পাহারা দেন। আবার প্রহরীরা পাঠশালায় বসলেই প্রথম দলের পড়ুয়ারা পাহারার দায়িত্ব নেন। এতোটা কষ্ট ও উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও লেখাপড়া থামাননি তাঁরা। শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আমাদের গ্রামবাসীরা এইভাবে তাঁদের শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রশ্ন : গ্রামের প্রাপ্তবয়স্করা এই যে লেখাপড়া শিখছেন এরপর কোনো চাষী বা মজদুর যদি লেখাপড়া, শিক্ষা আরো চালিয়ে যেতে চান তো তাঁর সামনে কী ধরণের সুযোগ থাকবে?

কাতেরিনা : এই ধরণের শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের আর একটা কার্যক্রম রয়েছে। সেটাকে আমরা বলি স্কুলকলেজের 'শ্রমিক বিভাগ'। এই বিভাগে

শিক্ষার মান হাইস্কুলের, তবে যাঁরা প্রাপ্তবয়স্কদের পাঠশালা থেকে পাশ করে এসেছেন, অথবা সোমোসার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের সময়ে লড়াই-এ যোগ দিতে গিয়ে যাঁরা স্কুলের লেখাপড়া আর চালাতে পারেননি, এই বিভাগটা বিশেষভাবে তাঁদের জন্যেই তৈরী। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন।

প্রশ্ন ঃ সাক্ষরতা অভিযানের পর আপনারা জনগণের মতামত নিয়েছিলেন— তাঁরা কী ধরণের শিক্ষা মুক্ত নিকারাগুয়ায় আশা করেন, সে-সম্পর্কে। জনগণের ঐ মতামত, তাঁদের আশা-প্রত্যাশা সম্বন্ধে একটু জানতে চাই।

কার্তেরিনা ঃ মূলত তাঁরা চাইছিলেন এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে ছেলেমেয়েরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে পারবে. তাদের একটা কার্যকর ও গঠনমূলক ভূমিকা থাকবে। জনগণ চাইছিলেন এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা যেটা বাস্তবিকই এক নতুন সমাজে নতুন মানুষ তৈরী করতে পারবে। নতুন মানুষ,— যে তার পাশের মানুষের সংগে সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের সূত্রে বাঁধা, যে-মানুষ হবে নতুন নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারী। জনগণ এমন শিক্ষাব্যবস্থা দাবি করছিলেন যেখানে তাঁরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করতে পারবেন, তবে একটা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে, অন্য পরিপ্রেক্ষিতে। তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় আনার দাবিও তাঁদের ছিল।—দেশের কোনো কোনো লোকস্তর থেকে এসেছিল ক্যাথলিক ধর্মকে শিক্ষাব্যস্থার অংগ করে তোলার দাবি। তবে এই দাবি প্রধানত আসছিল খ্রীস্টান স্কুলগুলো থেকে, অথবা খুব ধর্মভীরু বাবামায়ের তরফে। এই দাবির কিছুটা আমরা মেনে নিয়েছি, তবে শিক্ষার মূল আদর্শ ও লক্ষ্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই অনুপাতে। এই বিষয়ে অনেক আলোচনা, তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে এ-দেশে। কারণ, ধর্মপ্রাণ বাবা-মায়েরা বলছিলেন, শিক্ষার মতবাদ স্বাধীনভাবে বেছে নেবার অধিকার ছাত্রছাত্রীদের দিতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে কোনো একটা মতবাদ থাকলে চলবেনা, যেমন সান্দিনিস্তা মতবাদ। তাঁরা চাইছিলেন একাধিক মতবাদ। এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে শিক্ষাব্যবস্থার মতবাদের দিক দিয়ে আমরা বহুত্ববাদকে, বিভিন্ন মতবাদের সমান্তরাল উপস্থিতিকে প্রশ্রয় দিতে পারি না,—যদিও আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একাধিক দলীয় মতবাদ, বিভিন্ন "পার্টির" অস্তিত্ব স্বীকৃত। কিন্তু এটা ঘটনা যে সান্দিনিস্তারাই এ দেশের শাসনক্ষমতায় রয়েছেন। যে-দেশে যারা ক্ষমতায় থাকে, সে-দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তাদেরই মতবাদ হয় কেন্দ্রীয় শক্তি। সুতরাং নিকারাগুয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় সান্দিনিস্তা মতবাদের ভূমিকাই হবে মুখ্য, কেন্দ্রীয়। আমরা এই সিদ্ধান্তই নিলাম। যাঁরা অন্য মতবাদের পক্ষে, তারা এটা অনুমোদন করেননি। কিন্তু তাঁরা সংখ্যালঘু।

দেশের বেশীর ভাগ মানুষ সান্দিনিস্তাপন্থী। তাঁরা দাবি করছিলেন সান্দিনিস্তা মতবাদভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা, তাঁরা চাইছিলেন আমাদের দেশের বাস্তব ইতিহাসটাকে জানতে, তাঁরা চাইছিলেন এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা যার দৌলতে ছাত্রছাত্রীরা অনতিবিলম্বে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় ও উন্নয়নে সামিল হতে পারে। এই জন্য আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটাকে আরো ব্যবহারোপযোগী ও উৎপাদনমুখী করে তুলেছি। সকলকে যে স্কুল পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতেই হবে, তার কোনো দরকার নেই। নবম শ্রেণীর পর ছেলেমেয়েদের সামনে বিভিন্ন বিকল্প থাকে। তারা, চাইলে, কোনো পলিটেক্নিকে বা এই রকমের অন্য কোনো স্কুলে যেতে পারে, হাতের কাজ শিখতে পারে, অথবা অন্য কিছু। যদি তারা চায় তো, স্কুলে বারোটা শ্রেণী পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়েও যেতে পারে। মোট কথা, শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও কাঠামোটা পাল্টে দেওয়া হয়েছে। দেশের কী প্রয়োজন, সেটাই হচ্ছে আসল কথা। কাজেই শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনাটা চলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংগে তাল মিলিয়ে।

প্রশ্ন : প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা আপনারা গড়ে তুলেছেন সেটা ছাড়াও একটা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা আপনারা চালিয়ে যাচ্ছেন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় আপনারা কোন্ বিষয়গুলোর ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছেন ?

কাতেরিনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। আমাদের দেশের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই বিষয়গুলোই সবচেয়ে জরুরী। কৃষি-বিজ্ঞানও খুব গুরুত্বময় এদিক দিয়ে। এবং কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের কৃষিমন্ত্রণালয়ের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করি।—বিজ্ঞান, প্রযুক্তির ওপর আমরা জোর দিচ্ছি মানে এই নয় যে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্ব নেই। এগুলোও যথাযোগ্য গুরুত্ব পাচ্ছে।

প্রশ্ন : আমি শুনেছি আপনাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা এখন উচ্চশিক্ষার জন্য সোভিয়ত ইউনিয়ন যাচ্ছেন। কোন্ বিষয়গুলো পড়ছেন তাঁরা সেখানে ?

কাতেরিনা : সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দিচ্ছে। আমাদের দেশের অর্থনীতিকে উন্নত করে তুলতে গেলে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ঐসব বিষয়ের সবকটা অধ্যয়ন করার সুযোগ নিকারাগুয়ায় নেই। যেমন বনবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আরো নানান জরুরী বিষয় সম্পর্কে সমুচিত লেখাপড়ার সুযোগ আমরা দিতে পারছি না। কাজেই যেসব সমাজবাদী বা অন্য কোনো দেশ এ-ধরণের শিক্ষার সুযোগ দিচ্ছে, বৃত্তি দিচ্ছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা সেই দেশগুলোয় যাচ্ছে উচ্চশিক্ষার জন্য।

প্রশ্ন : আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন। কিছু আগে আপনি শিক্ষা-

ব্যবস্থায়. নিকারাগুয়ার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সান্দিনিস্তা মতবাদের ভূমিকার কথা বলেছেন। আপনি বলেছেন যে দেশের রাজনীতিতে একাধিক মতবাদের উপস্থিতি আপনারা মেনে নিলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটাকে মানতে পারছেন না।' যে মতবাদকে কেন্দ্র করে নতুন নিকারাগুয়ার শিক্ষাব্যবস্থাটা গড়ে তুলছেন আপনারা, সেই সান্দিনিস্তা মতবাদের স্বরূপ কী ?

কাতেরিনা : এই মতবাদে একাধিক চিন্তাধারা জড়ানো। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যেমন রয়েছে. তেমনি বিরাট গুরুত্বময় ভূমিকা নিচ্ছে সান্দিনো ও কার্লোস ফন্সেকার চিন্তাধারা। খ্রীষ্টান ধর্ম থেকেও প্রয়োজনীয় মালমশলা নিয়েছি আমরা।

সমাজব্যবস্থা পাল্টানোয় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে অবদান সেটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তেমনি সান্দিনোর ভাবনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নিকারাগুয়ার বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেটাও আমাদের কাছে চূড়ান্ত জরুরী।—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, জাতীয়তাবাদ, জনকল্যাণ প্রবণতা ও গণতন্ত্র —এই হলো সান্দিনিস্তা মতবাদের বুনিয়াদ।—দেখুন, নিকারাগুয়ার এখন যা অবস্থা তাতে এই দেশটাকে "সমাজবাদী" বলার জো নেই। সে সময় এখনো আসেনি। নিরন্তর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি পুঁজিবাদ থেকে এক নতুন সমাজব্যবস্থার দিকে। রূপান্তর ঘটে চলেছে অবিরত। আমরা রয়েছি সেই রূপান্তরের প্রক্রিয়ায়। একদিন আমাদের দেশ হয়তো এক সাম্যবাদী দেশে পরিণত হবে। তবে সেই সমাজবাদী পরিচিতি হবে আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। সেখানে আমাদের নিজস্বতা থাকবে, নিজস্ব নীতিবোধ থাকবে। আপন মূল্যবোধ। নিকারাগুয়ায় বিপ্লব হয়েছে অতি বিশিষ্ট এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে। এমনকি, আমার মতে, রূপান্তরের চলতি প্রক্রিয়াটাও এখন পর্যন্ত অতি বিশিষ্ট ও অভিনব। কিউবা আমাদের এতো কাছে। কিন্তু কিউবার রূপান্তর আর নিকারাগুয়ার রূপান্তর রীতিমতো আলাদা ধরণের। মার্কসবাদী তত্ত্বকে আমরা নিছক মার্কসবাদী তত্ত্ব হিসেবে আমাদের বইপত্রে দেখাতে পারি না। আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থায় মার্কসবাদী তত্ত্বকে প্রয়োগ করে তবে তার বিচার হওয়া দরকার। সেই প্রয়োজনীয় কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। তবে হ্যাঁ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, জাতীয়তাবাদী, গণমুখী ও গণতান্ত্রিক নীতি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ও শিক্ষাপদ্ধতিতে পুরোপুরি উপস্থিতি। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশের জনগণকে বলা হচ্ছে যে আমরা এক নতুন সমাজ গঠন করতে চাই যেখানে সকলের অধিকার হবে সমান। কিন্তু আমরা, এমনকি, সমাজতন্ত্রের কথাও বলছি না আমাদের পাঠ্যবইগুলোয়। এখন পর্যন্ত আমাদের স্কুলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিষয় করে তোলা হয়নি। মার্কস-লেনিনের

চিন্তাধারা ও তত্ত্ব সম্পর্কে জানার পড়ার সুযোগ রয়েছে, এগুলো পড়তে হয়ও। কিন্তু একটা আলাদা 'বিষয়' হিসেবে মাকর্সবাদ-লেনিনবাদের কোনো অস্তিত্ব নেই এখনো।

*   *   *

আমাদের অতিথিশালার রাঁধুনি কম্‌পানিয়েরা মাতিল্‌দা গ্রামের মেয়ে। বিপ্লবের আগে লেখাপড়া শেখার কোনো সুযোগই সে পায়নি। এখন সে সান্ধ্য ইস্কুলে যায় নিয়মিত। লিখতে পড়তে শিখে গিয়েছে সে ইতিমধ্যে। স্কুলের জন্য বা বইখাতা পেন্‌সিল কিছুর জন্যেই তাকে এক পয়সাও দিতে হয় না। সন্ধ্যেবেলা স্কুল থেকে ফিরে মাতিল্‌দা মাঝেমাঝে স্টেসির সংগে বসে, পড়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সেদিন মাতিল্‌দা এসে বললো তাকে বাড়ির কাজ হিসেবে একটা ছোট রচনা লিখতে হবে। বিষয় একটি শ্লোগান : 'আমরা ক্রীতদাস ছিলাম, আর কখনো কারুর গোলাম হবোনা।'

*   *   *

অতিথিশালার দুই কর্মী পাউলিনে ও মাতিল্‌দা দুজনেই বিপ্লবের আগে বড়লোকের বাড়িতে ঝিগিরি করতো। প্রশ্ন করতে দু'জনেই জানিয়ে দিলো, বছরের পর বছর কি অকথ্য নির্যাতন তাদের সহ্য করতে হয়েছে। লাথি-ঝাঁটা থেকে ধর্ষণ অবধি সর্বকিছু। বিপ্লবের পর তারা জীবনে এই প্রথম মানুষের মর্যাদা পেলো। অতিথিশালায় তাদের থাকার ঘর দুটো সুন্দর, ছিমছাম। থাকা খাওয়া সব বিনা পয়সায়। কাজগুলো ভাগ হয়ে যায় তিন চারজন কর্মীর মধ্যে। প্রত্যেকের মাইনে আট হাজার কর্দোবা। তাদের নালিশ : এমনিতে তেমন অসুবিধে নেই, তবে জামাকাপড়ের দাম এতো যে মেয়েলি সাধ আহ্লাদ এই মাইনেতে পুরোপুরি মেটানো যায় না।

পাউলিন ও মাতিল্‌দা বললে : "বিপ্লবের আগে রাস্তাঘাট একদম নিরাপদ ছিল না মেয়েদের পক্ষে। সোমোসার সৈন্যরা নির্বিচার ধর্ষণ করতো এবং সে-সম্পর্কে কারুর কাছে নালিশ করার কোনো উপায় ছিল না। এখন মেয়েরা রাতবিরেতে নিশ্চিন্তে রাস্তায় হাঁটতে পারে। বিপদে পড়লে বা পথ হারালে সান্‌দিনিস্তা সৈন্য বা পুলিশের সাহায্য চাইলেই হলো। তারা গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেয়।"

আমাকে নিয়ে যাবার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কোনো-না-কোনো কর্মী সাংবাদিক (হয় কার্লা বা লিদিয়া. বা লুইসা অথবা মাগালি) রোজই অতিথিশালায় আসে। আবার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়। লক্ষ্য করেছি সাংবাদিকরা এবং অন্য কর্মীরা সকলেই পাউলিন ও মাতিল্‌দাকে "কম্‌পানিয়েরা" বলে সম্বোধন করে, রোজই তাদের সংগে গালগল্প করে বন্ধুর মতো, সুখ-দুঃখের খবর নেয়।

আমাদের পাড়ায় একটা ছোট দোকান আছে। মুদির দোকান গোছের। স্টেসি আর আমি প্রায়ই চলে যাই ঐ দোকানে, সিগারেট কিনি, নিকারাগুয়ান মিষ্টি খাই (গুড়ের মিষ্টি), লোক দেখি, গালগল্প করি। এক তরুণী দোকানটা সামলান। বড় ম্লান মুখ মেয়েটির। অবশ্য খদ্দের হাসলে, সেও হাসে প্রতিদানে। একদিন মেয়েটির সংগে কথা বলতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, তাকে সকাল সাতটায় বাড়ী থেকে বেরোতে হয়। আটটায় দোকান খোলে। ঝাঁপ বন্ধ হয় রাত দশটার পর। মেয়েটি বাড়ি ফেরে রাত এগারোটার পর। সপ্তাহের সাতদিনই চলে এভাবে। ভাবছি, পৃথিবীর বিপ্লবগুলো এ-ধরণের মানুষকে কী দেয়? নিকারাগুয়ার বিপ্লব এই ম্লান মেয়েটির চরম কর্মক্লান্ত, কর্মসর্বস্ব জীবনে কী কী এনে দিতে পেরেছে?

জাতীয় শিক্ষক সমিতির (ANDEN) জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যা ইয়োলান্দা রদ্রিগ্রেসের সংগে সাক্ষাৎকার।

এই শিক্ষক সমিতি ফ্রন্টের অংশ নয়। বহু পার্টির প্রতিনিধি এখানে আছেন। সোমোসার আমলেও এই শিক্ষক সমিতি ছিল, তবে নামে মাত্র। সে আমলে এই সমিতি ছিল একনায়কতন্ত্রের বশংবদ। সোমোসার বিরুদ্ধে লড়াই বেশ জমে ওঠার সংগে সংগে এই সমিতির বেশ কিছু শিক্ষক বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হন। এখন জাতীয় শিক্ষক সমিতি বিপ্লবের পূর্ণ সমর্থক। সারা দেশে মোটামুটি বাইশ হাজার শিক্ষক। তাঁদের মধ্যে সতেরো হাজার জন সমিতির সভ্য।

"বিপ্লবের আগে শিক্ষকরা, বিশেষত স্কুলশিক্ষকরা ছিলেন মর্যাদাহীন এক শ্রেণী। তাঁদের মাইনে যা ছিল তাতে সংসার চলতো না। শিক্ষামন্ত্রকের সংগে শিক্ষকদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। বিপ্লবের পর শিক্ষকরা যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়েছেন। আজ তাঁরা তাঁদের বক্তব্য, দাবিদাওয়া সরাসরি পেশ করতে পারেন। নেতারা তাঁদের কথা শোনেন। তাঁদের মাইনে অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। অবশ্য এটাও ঠিক যে দ্রব্যমূল্যও চড়ে গেছে অনেকটা। তবু, শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা এখন আগের চেয়ে ঢের ভালো। শিক্ষকরা দেশের অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে সচেতন, তাই তাঁদের আস্থা রয়েছে যে ভবিষ্যতে, সংকট কেটে গেলে তাঁদের মাইনে আরো বাড়বে।

শিক্ষামন্ত্রক এখন এক বিপ্লবী সংগঠন। কাজেই শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের সংগে মন্ত্রকের সম্পর্কও এখন একেবারে অন্যরকম। এক বিরাট, আমূল পরিবর্তন এসে গিয়েছে সমাজে। বিপ্লবের আগে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল মুষ্টিমেয় কিছু স্বৈরাচারীর হাতে। আজ তা ভাগ হয়ে গেছে জনগণের মধ্যে। ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান, জনগণের সশস্ত্র বিপ্লব, আত্মত্যাগ, কষ্টস্বীকার, ক্ষমতাদখল, ব্যাপক রাজনৈতিক তৎপরতা ও শিক্ষা, বাস্তব অভিজ্ঞতা—এগুলো এই আমূল সামাজিক পরিবর্তনের জন্য দায়ি।

সংসদে আজ শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। অনেক শিক্ষক আজ সংসদ সদস্য। বিপ্লবের আগে এটা ভাবাও যেত না।

শিক্ষকরা তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। মানুষ যা

যা করে তার সবটাই রাজনীতির আওতায়। সোমোসার আমলে ঢালাও হুকুম ছিল: "শিক্ষকদের রাজনীতি করা চলবে না।"

—জাতীয় শিক্ষক সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্য ইয়োলান্দা রদ্রিগেস একটানা এই ভূমিকা নিয়ে আমাকে বললেন: "কম্পানিয়েরো, এবারে বলুন কী জানতে চান।"—ইয়োলান্দার পাশে এক তরুণী সমানে নোট নিয়ে চলেছেন এই সাক্ষাৎকারের।

বসে আছি আমরা শিক্ষক সমিতির সভাকক্ষে। বড় মাপের ঘর। লম্বা টেবিল, দু'পাশে সারি সারি চেয়ার। দেওয়ালে সান্দিনোর ছবি। কাঁচের শার্সি দেওয়া একটা পেল্লায় জানলা। তার ওপারে ছোট্ট বাগান। পরিচ্ছন্ন। সকালের রোদ্দুর 'এবার কিন্তু চড়ে যাবো' বলে শাসাচ্ছে। একটা ফুলগাছ সহ্য করছে সেই শাসানি।

প্রশ্ন: বিপ্লবের পর ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেমন দাঁড়িয়েছে বলতে পারেন?

ইয়োলান্দা: সোমোসার আমলে ছাত্রসমাজ ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল একেবারে একপেশে। শিক্ষকরা সব সময়ে দূরত্ব থেকে জ্ঞান দিতেন, আর ছাত্ররা তা শুনে যেতেন। পারস্পরিক সম্পর্ক তেমন ছিল না। সবকিছুই ছিল অতি কঠোর। তাছাড়া শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রসমাজের কোনো ভূমিকা ছিল না। বিপ্লবের পর এক বিরাট পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এবং সমানে হয়ে চলেছে। পরিবর্তনটা এতোই মৌলিক যে কোনো তুলনাই আর চলে না। ছাত্ররা আজ শিক্ষাব্যবস্থায় পুরোপুরি সামিল। তাঁরা আজ খোলাখুলি সমালোচনা করতে পারেন। এখন শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক হয়, আলোচনা ও বিতর্ক চলে। তারই মধ্য দিয়ে নেওয়া হয় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত। বিপ্লবের পর গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে,—ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক তার একটা দিক মাত্র। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে চলেছে, বদলে যাচ্ছে শিক্ষকদের চিন্তাধারা ও ভূমিকা। শিক্ষামন্ত্রক এক বিপ্লবী সংগঠন। তার অধিকাংশ কর্মীই বিপ্লবী। অনেক শিক্ষকও তো বিপ্লবী। শিক্ষামন্ত্রক যেমন আর আমলাতান্ত্রিক নয়, তেমনি শিক্ষকরাও আর সেই পুরোনো দিনের 'মাস্টার' নন। নিজেদের তাঁরা বিপ্লবী শ্রমিক মনে করেন। দেশ পরিচালনার কাজেও তাঁদের ডাক পড়েছে।

প্রশ্ন: সব শিক্ষকই কি বিপ্লবী? সাবেকপন্থী, সোমোসাপন্থী শিক্ষক কি একেবারেই নেই?

ইয়োলান্দা: আছেন। তবে সংখ্যায় নগণ্য। এঁরা এখনো মনে করেন যে ডিক্‌টেটরশিপের জমানার শিক্ষাব্যবস্থাই ছিল ভালো।

প্রশ্ন: এরকম মনোভাবের জন্য কি তাঁদের শাস্তি পেতে হয়?

ইয়োলান্দা : না। একেবারেই না। তাঁদের সংগে সমানে আলোচনা চলে, তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করি আমরা। কেউ কেউ খুব একগুঁয়ে। তাই সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু তাই বলে সাজা দেওয়া হয়না কাউকে। কারণ, যাঁরা একেবারে কট্টর সোমোসাপন্থী ছিলেন, তাঁদের বেশীরভাগই আজ দেশান্তরী। পুরোনোপন্থী, অনগ্রসর শিক্ষকরা কট্টর ফাসিস্ত নন। আমরা তাঁদের ভাবতে সাহায্য করছি। বিপ্লব অতি জটিল এক ব্যাপার। কাজেই নানা জায়গায় জটিলতা রয়েছে। তবু, জনগণের সংগে শিক্ষকদের নিবিড় সম্পর্ক, ছাত্রদের সংগে বন্ধুত্বের, সহযোদ্ধার সম্পর্ক (আমরা সকলেই তো লড়াই করছি, এবং বন্দুক হাতেও), শিক্ষামন্ত্রকের সংগে অংশীদারের সম্পর্ক—এসবের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছি আমরা বাধাগুলো একের পর এক।

প্রশ্ন : বিপ্লবের আগে শিক্ষকদের অনেকেই নিশ্চয়ই বিপ্লবের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। আজ তাঁরা কোন স্বপ্ন দেখেন?

ইয়োলান্দা : আমরা শ্রমিক। দেশের গোটা শ্রমিকশ্রেণীর অংশ আমরা। আমাদের স্বপ্ন : সকল শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়ে উঠবে। অনেক উন্নতি ইতিমধ্যেই হয়েছে। তবু, আরো উন্নতি হওয়া দরকার।

* * *

কার্লা ও আমাদের গাড়ির চালক ভিসেন্তেকে নেমন্তন্ন করেছি একটা বেশ ভালো রেস্টুরেন্ট-এ। জায়গাটা ভারী মনোরম। পাশেই একটা বিরাট হ্রদ। পুরাকালে এটা ছিল আগ্নেয়গিরি। গভীর সবুজ জল। ওপারে ঢালের ওপর দিয়ে বড় অক্ষরে লেখা 'এফ, এস, এল, এন'—সান্দিনিস্তা জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট। —রেস্টুরেন্টে নানান খাবারের আয়োজন, ইয়া ইয়া গলদাচিংড়ি যার অন্যতম। তবে খাবারের দাম বেশ চড়া। কার্লা ও ভিসেন্তেকে জিজ্ঞেস করলাম, এরকম দোকানে ওরা কবার আসে। জানালো, কালেভদ্রে। এতো দামী খাবার ওদের আওতার বাইরে। তাহলে এখানে আসে কারা নিয়মিত? কাদের টাকায় চলে এইসব দামী দোকান?—উত্তর : এখনো দেশে কিছু পয়সাওয়ালা লোক আছে। বুর্জোয়াশ্রেণী। তারাই এর খদ্দের। শ্রমিক বা সাধারণ কর্মীরা এখানে আসেননা বড় একটা।

ভিসেন্তে বললো : "কম্‌পানিয়েরো, নিকারাগুয়ায় আজ আর কেউ অভুক্ত নেই, কিন্তু সংখ্যালঘু এক শ্রেণী আজও বেশী খাচ্ছে আমাদের মতো মজুরদের তুলনায়। এটা একটা সমস্যা। বুর্জোয়া শ্রেণী এখনো রয়েছে জাঁকিয়ে।—সোমোসার আমলের রমরমা তাদের আর নেই, তবু কিছুটা তো রয়েছেই!"

* * *

কার্লা আমার জন্য একটা বই জোগাড় করতে নেমে গেল গাড়ি থেকে।

ভিসেন্তে আর আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি। এই সুযোগে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "কম্পানিয়েরো, বিপ্লবের পর তুমি কি সুখী ?"

ভিসেন্তে ঃ কম্পানিয়েরো, তিরিশ বছর হতে চললো গাড়ি চালাচ্ছি। আমি তো শ্রমিক। সোমোসার আমলে কি কষ্টই না পেয়েছি। তারপর লড়াই করেছি। যুদ্ধ করেছি নিজে। অস্ত্র ধরেছি। বিপ্লব করেছি আমরা, আমি নিজে। আজও চলছে সেই বিপ্লব। আজ আমি আগের চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ সুবিধে পাচ্ছি। পাচ্ছি মানুষের মর্যাদা,—দিনের পর দিন দেখছোই তো, কার্ল'া বা লিদিয়া আর আমার মতো শ্রমিকদের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই। মাইনেও বেড়েছে। কিন্তু আমার পাঁচ ছেলেমেয়ে। এই মাইনেতে এত বড় সংসার চালানো সহজ নয়। কষ্ট হয়। জামাকাপড়ের বড় দাম। সমস্যা রয়েছে। লড়াই চলছে। একেবারে ষোলো আনা সুখ কোথায় পাবো? কেউ কি কোনো অবস্থাতেই পায়? তবু আশা রাখি, আরো সহজ হয়ে উঠবে জীবন একদিন। বিপ্লব আমাদের মনে আশা এনে দিয়েছে।"

চব্বিশে মে— দুপুর

সান্দিনিস্তা-সরকার-বিরোধী দল কন্সার্ভেটিভ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা ক্লেমেন্তে গুইদোর (Clemente Guido) সংগে সাক্ষাৎকার।

গত নির্বাচনে (যেটা ছিল মুক্ত নিকারাগুয়ার ইতিহাসে প্রথম অবাধ নির্বাচন) ক্লেমেন্তে গুইদো ছিলেন সান্দিনিস্তা রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থী দানিয়েল অর্তেগার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। দানিয়েলের কাছে ক্লেমেন্তে, বলতে গেলে, অল্পের জন্য হেরে যান। ক্লেমেন্তে গুইদো পেশায় ডাক্তার। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। দারুণ পসার।—

প্রথমে গেলাম পার্টি আপিসে। ক্লেমেন্তে সেখানে নেই। পার্টির এক সংসদ সদস্য রয়েছেন। এই প্রথম নিকারাগুয়ায় এক ব্যাজারমুখ মানুষ দেখছি। দলনেতার সংগে যে আমার দেখা করার কথা, এটা শুনে তিনি বললেন: "উনি এখনো ওঁর ক্লিনিকে। সেখানেই যেতে হবে। উনি অপেক্ষা করছেন। আপনি রওনা হবার আগে একটা কথা বলতে চাই আপনাকে "—বসলাম। —ভদ্রলোক শুরু করলেন বেশ লেকচার দেবার ঢং-এ এবং খানিকটা ঠেস দিয়েঃ

"আমেরিকা মহাদেশটা আর সেই সংগে নিকারাগুয়া নামে এই দেশটা আবিষ্কার হয়েছিল সেই কলোম্বাসের আমলে। সেই থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ক'জনই বা লিখতে চেয়েছে এই দেশ সম্পর্কে! ১৯৭৯ সালের পর থেকে বিশ্বের লেখক-সাংবাদিকরা যেন উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন আমাদের সম্পর্কে জানতে। যতো দিন যাচ্ছে ততোই বেশী সংখ্যায় আসছেন আপনারা নিকারাগুয়ায়। আমার তো মনে হয় এটা আপনাদের একটা হুজুগ, একটা 'অব্‌সেশন'।"

—লক্ষ্য করলাম কন্সার্ভেটিভ সংসদসদস্য "বিপ্লব" কথাটা একবারও উচ্চারণ করলেন না। বললেন—"১৯৭৯"।

লিদিয়া ছিল আমার সংগে। আমরা দু'জনেই একটু একটু হাসতে শুরু করে দিলাম। ভদ্রলোক তাতে বেশ বিরক্ত হলেন। আমি চাইছিলাম এ'র সংগে একটু গুছিয়ে আলাপ করতে, কিন্তু ততোক্ষণে পার্টির একটি ছেলে এসে তাড়া দিচ্ছে সমানে—"ডাক্তার ক্লেমেন্তে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, চলুন।"

সমানে লক্ষ্য করছি যে সরকার বিরোধীদের আড্ডায় 'কম্পানিয়েরো' সম্বোধনটার তেমন চল নেই। এ'রা 'উস্তেদ', 'সেনিয়র' বা 'সেনিয়রিতা' এইসব পোষাকী সম্বোধনে বিশ্বাসী। রাস্তার সাধারণ লোক,—শ্রমিক, দোকানদার, ট্যাক্সিচালক, ছাত্রছাত্রী—এ'রা কিন্তু 'কম্পানিয়েরো' বলে অভ্যস্ত। এবং 'আপনি-আজ্ঞের' চেয়ে 'তুমি' ('তু') সম্বোধনই বেশী শোনা যায় এ'দের মধ্যে।

দীর্ঘদেহী, মিষ্টভাষী ডাক্তার ক্লেমেন্তে গুইদো অভ্যর্থনা জানালেন আন্তরিকভাবে। সংসদ অধিবেশনে এ'কে দূর থেকে দেখেছি। সবচেয়ে শক্তিশালী সরকারবিরোধী হিসেবে ক্লেমেন্তে গুইদো বসেছিলেন সভাপতি কমান্দান্তে কার্লোস নুনিয়েস-এর কাছেই এবং তুখোড় সমালোচনার ধাক্কায় কাঁপিয়ে দিচ্ছিলেন সংসদ। ক্লিনিকের দেওয়ালে নানা দেশ থেকে পাওয়া প্রশংসাপত্র ও ডিগ্রি-ডিপ্লোমা। বহু দেশে এ'র সুনাম স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে। কন্‌সার্ভেটিভ পার্টি-আপিসেও দেখেছি, এখানেও দেখছি সান্দিনোর ছবি নেই কোথাও।—সুন্দর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ক্লেমেন্তে গুইদো। অপ্রয়োজনে বেশী কথা বলেন না। কিন্তু কিছু জানতে চাইলে সযত্নে উত্তর দেন। দেহের পেশীতে পেশীতে, চোয়ালে, জ্বলজ্বলে দুই চোখে, হাবভাবে ও কথায় দৃঢ় সংকল্প ও আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। মনে মনে ভাবলাম, এরকম বিরোধীকে বাগে আনা সহজ নয়। সান্দিনিস্তাদের ঘাম ছুটিয়ে দিতে পারেন ইনি। এবং দিচ্ছেনও।

ক্লেমেন্তে গুইদো বললেন: প্রথমেই একটা কথা বলে রাখতে চাই। পঞ্চাশ বছর হলো এই পার্টি চালু। আমাদের পার্টির নাম 'কন্‌সার্ভেটিভ' হলেও আমরা কিন্তু মোটেও দক্ষিণপন্থী নই। আমরা মধ্যপন্থী।

প্রশ্ন: নিকারাগুয়ার মত এক বিপ্লবী দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার অর্থ কী?

ক্লেমেন্তে: অর্থ হলো—আমরা দক্ষিণপন্থা চাই না। আবার বামপন্থাতেও কোনো অনুরাগ নেই আমাদের। এই কারণে আমরা সান্দিনিস্তাদের বিরুদ্ধে।

প্রশ্ন: তার মানে কি আপনারা বিপ্লবেরও বিরুদ্ধে?

ক্লেমেন্তে: উঁহু। সোমোসার আমলে আমার দল চারটি শাখায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একটি শাখা হয়ে পড়েছিল সোমোসার বশংবদ। অন্য তিনটি শাখা সোমোসার বিরুদ্ধে যায়। ঐ তিনটির সমন্বয়ে আজকের পার্টি তৈরী। কাজেই, সোমোসার পতন আমরা চেয়েছিলাম বৈকি।

প্রশ্ন: সোমোসার পতন চাওয়া আর বিপ্লবের সমর্থক হওয়া কি এক?

ক্লেমেন্তে: সান্দিনিস্তারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী। এ হেন বিপ্লবে সামিল

হওয়ার অর্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি মেনে নেওয়া। আর সেই নীতি হলো: একটাই পার্টি থাকবে। তারাই সবকিছু চালাবে ও করবে।

প্রশ্ন: কিন্তু সান্দিনিস্তারা তো নির্বাচন ডেকেছিলেন, এবং আপনি তো প্রচুর ভোটও পেয়েছিলেন। সংসদে আজ আপনার আসন পাকা।

ক্লেমেন্তে: সেটা আমাদের পেছনে জনতার সমর্থন আছে বলে। সান্দিনিস্তারা প্রথমে যে অবস্থান নিয়েছিলেন, সেখান থেকে সরে এসেছেন তাঁরা, বিরোধীদের চাপে পড়ে।—আমাদের বক্তব্য ছিল: বিপ্লবে আমরা রাজী, যদি তাতে গণতন্ত্র কায়েম হয়। আমরা পশ্চিমী গণতন্ত্রের ভালো দিকগুলোর সংগে সাম্যবাদী দেশের ভালো দিকগুলোকে মেলানোর পক্ষপাতী। দুটি ব্যবস্থারই খারাপ দিক আছে। কিন্তু ভালো দিকগুলোর সমন্বয়ে নিকারাগুয়ায় গণতন্ত্রের একটা বুনিয়াদ গড়ে তোলার কথা বলেছি আমরা। আমরা নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রেও বিশ্বাসী নই, আবার নিছক গোষ্ঠীতন্ত্রেও আস্থাবান নই। ব্যক্তি ও সমাজ বা গোষ্ঠী দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। দুটোকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

আমরা নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম, কেননা আমাদের মনে হয়েছিল যে এটা আমাদের কর্তব্য, যদি আমরা গণতন্ত্র চাই। আমরা চাইনা যে সোমোসা-পন্থীরা ফিরে আসুক। আমরা চাই, সমাজে পরিবর্তন হোক। আমাদের দেশে এমন অনেক সরকারবিরোধী আছেন—এবং তাঁদের সংগে আপনি নিশ্চয়ই কথা বলেছেন এর মধ্যে—যাঁরা সামাজিক পরিবর্তন চান না। তাঁরা চান সোমোসা-হীন সোমোসাতন্ত্র। অমুক অমুক জেনারেলহীন ন্যাশনাল গার্ড। এঁদের সংগে আমরা একমত নই।

লড়াই আমরা চেয়েছিলাম এবং লড়াই হয়েছে। তবে আমাদের লক্ষ্য ছিল, সেই লড়াই-এর পর পরবর্তী কাজটা সমাধা করা, অর্থাৎ এক প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সেও তো এক বড় লড়াই। প্রথম লড়াই-এর পর দ্বিতীয় লড়াইটা চলছে এখন সংসদে। আমি অসামরিক লোক। এবং আমি অসামরিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। যুদ্ধবিরোধী।

প্রশ্ন: আপনি তো যুদ্ধবিরোধী, এদিকে মার্কিন সরকার আর দেশান্তরী সোমোসাপন্থী প্রতিবিপ্লবীরা তো যুদ্ধ করছে আপনার দেশের বিরুদ্ধে। বেশ বড় মাপের আগ্রাসন চলছে। এ-ব্যাপারে আপনি কী বলবেন?

ক্লেমেন্তে: দেখুন, আমি হলে করতাম কি, আলোচনায় বসতাম। সকলের সংগে আলোচনায় বসতাম।

প্রশ্ন: সান্দিনিস্তাদের তো আলোচনায় আপত্তি ছিল না। মার্কিন সরকারই তো আলোচনার পথ বন্ধ করে প্রথম থেকেই উঠে পড়ে লেগেছেন

এই সরকারকে গদিচ্যুত করতে, তাঁরা প্রতিবিপ্লবীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন।

ক্লেমেন্তে: আলোচনার পথটা, আমি হলে, আরো ঘুরে দেখতাম। আমি রক্ষণশীল। আলোচনায় বিশ্বাসী।

প্রশ্ন: সেনিয়র ক্লেমেন্তে গুইদো, আপনার কি মনে হয় যে ভোটে আপনি জিতে গেলে রেগান খুশী হতেন?

ক্লেমেন্তে: পুরোপুরি খুশী হতেন না, কারণ আমি দক্ষিণপন্থী নই। কিন্তু হয়তো আলোচনায় বসতে রাজী হতেন আরো সহজে। ক্যানাডায় রক্ষণশীলরা রয়েছেন ক্ষমতায়, ব্রিটেন আর পশ্চিম জার্মানীতেও। এদিকে কলোম্বিয়াতেও রক্ষণশীলদের হাতে শাসনভার। এরপর নিকারাগুয়াতেও রক্ষণশীলরা ক্ষমতায় এলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি অন্যরকম দৃষ্টিভংগী নিতেন।

প্রশ্ন: সান্দিনিস্তাদের বিরুদ্ধে আপনার প্রধান অভিযোগগুলো কী?

ক্লেমেন্তে: ওঁরা এ-দেশে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পন্থায় এক-পার্টির সর্বময় কর্তৃত্ব কায়েম করতে চেষ্টা করছেন। শ্রমিক ইউনিয়ন, কৃষক ইউনিয়নগুলোয় নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করছেন। আজ, দেখুন, সান্দিনিস্তা শ্রমিক সমিতি, সান্দিনিস্তা কৃষক সমিতি বহাল।

প্রশ্ন: আপনি বলছেন বটে, কিন্তু এটা কি অস্বীকার করা যায় যে সান্দিনিস্তারা নির্বাচন ডেকেছেন, লোকে ভোট দিয়েছে বিপুল সংখ্যায় এবং আপনার পার্টি সংসদে চোদ্দটা আসন পেয়েছে? সান্দিনিস্তারা পেয়েছেন একষট্টি। সংসদে কাজ চলছে, অধিবেশন চলছে পুরোদমে। আপনারা কি এখন আলোচনা করতে পারছেন সান্দিনিস্তাদের সংগে?

ক্লেমেন্তে: হ্যাঁ, আলোচনা চলছে। দেশের শাসনব্যবস্থা, কাঠামো সম্পর্কে। সংসদ অধিবেশনে তর্কাতর্কিও চলছে। আমরা রক্ষণশীল। মধ্যপন্থী। সংঘাত আমাদের নীতি নয়। তাছাড়া আমরা সংখ্যালঘু। কাজেই সংঘর্ষ কোনো কাজের কথা নয়। আমরা আলোচনায় বিশ্বাসী। কেবলমাত্র আলোচনায়।

প্রশ্ন: সান্দিনিস্তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের একটা বড় অভিযোগ যে তাঁরা নাকি বিরোধীদের গলা টিপে ধরছেন, স্বৈরাচার চালাচ্ছেন, বিরোধীরা নাকি সান্দিনিস্তাদের ভয়ে থরহরিকম্প। আপনি তো দেখছি খোলাখুলি সমালোচনা করছেন সান্দিনিস্তা সরকারের। আপনার কি মনে হয় যে এ-জন্য আপনাকে বিপদে পড়তে হবে।

ক্লেমেন্তে: না। তা মনে হয় না। আমার মনে হয় আলোচনা সম্ভব। আমি বিপদগ্রস্ত নই, বিপন্ন নই।

প্রশ্ন ঃ নির্ভয়ে সরকারের বিরোধিতা করতে পারা তো, যদ্দূর জানি, গণতন্ত্রের লক্ষণ। তাহলে কি বলা যাবে এ-দেশে গণতন্ত্র কায়েম ?

ক্লেমেন্তে ঃ না, তা বলা যাবে না। কারণ, দীর্ঘকাল এদেশে একনায়কতন্ত্র বহাল ছিল। গণতন্ত্রের নামগন্ধ ছিল না। এ-মুহূর্তে বলা যেতে পারে, আমরা গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছি। মাত্র পাঁচবছর হলো সোমোসাশাহী গেছে। এতো অল্প সময়ে গণতন্ত্র গড়ে তোলা, কায়েম করা সম্ভব নয়। আমরা এগোচ্ছি সেই দিকে। [illegible]।

চব্বিশে মে, বিকেল

সান্দিনিস্তা সাংস্কৃতিক কর্মী সমিতিতে (ASTC) গেলাম লিদিয়ার সংগে। মস্ত বড় চত্বর। অনেকগুলো ছোট ছোট বাড়ি। মাঝে ও চারপাশে বাগান, ঝোপঝাড়। একটা বাড়িতে সোভিয়েত শিল্পীদের ছবির প্রদর্শনী চলছে। প্রায় প্রতিটি ছবিই কেমন যেন বিষন্ন, গাঢ় রঙে আঁকা, নিরানন্দ। ছবি বিশারদ নই। আমার শুধু এরকমই মনে হলো ছবিগুলো দেখে। লিদিয়াও বললোঃ "ব্যাপারটা দেখেছো ? কোনো ছবিই দেখে মনে হয় না যে শিল্পীর মনে স্ফূর্তি আছে। বড় গম্ভীর গম্ভীর, বিষন্ন।" —আমাদের দুজনেরই একই কথা মনে হয়েছে তাহলে। লিদিয়া হঠাৎ বললো ওর বয়ফ্রেণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়াশুনো করছে। জিজ্ঞেস করলাম কেমন লাগছে ওর, কিছু লেখে ?

-লেখে। ওর তো ভালোই লাগছে।

কথা বলতে বলতে এসে পড়েছি আমরা একটা ঘরের সামনে। জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই চোখে পড়লো একটি মেয়ে একা একা নেচে চলেছে। নিঃশব্দে। কোনো গান হচ্ছে না। বাজনা বাজছে না। নিঃশব্দে নেচে চলেছে মেয়েটি। ঘরের একটা দেয়াল জুড়ে বিশাল একটা আয়না। দরজায় দাঁড়াতেই আয়নায় মেয়েটির নাচ দেখা গেল।

আবার হাঁটা।

আর একটি বাড়িতে বসে আছেন আন্তর্জাতিকসম্পর্ক বিভাগের কর্তা নোয়েল কোরেয়া। যথারীতি তরুণ। সারাক্ষণই হাসি লেগে আছে মুখে। আলাপ হতেই নোয়েল বললেনঃ "আমাকে দেখছেন তো ?—কি, ঠিক ভারতীয় মনে হচ্ছেনা ? নিউ ইয়র্কে যখন ছিলাম তখন অনেকেই আমায় ভারতীয় বলে ভুল করতো। নিউ ইয়র্কে নিকারাগুয়ার মিশনে কাজ করতাম। তারপর একদিন রেগান সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি সন্ত্রাসবাদী। তাই রাতারাতি বিদেয় করে দিলেন ও-দেশ থেকে।"—বলেই হৈ হৈ করে হাসি।

জিজ্ঞেস করলাম—তা বলুন, স্বদেশে সন্ত্রাসবাদ কেমন চালাচ্ছেন ?

নোয়েলঃ মন্দ নয়। ইদানিং এই সান্দিনিস্তা সাংস্কৃতিক কর্মী সমিতির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগটা গড়ে তোলার দায়িত্ব বর্তেছে আমার ওপর।—

আমাদের এই সমিতির সংগে কিন্তু সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা একেবারেই বেসরকারি। এ হলো পেশাদার শিল্পী ও লেখকদের ইউনিয়ন। মনে করুন আপনি নিকারাগুয়ার এক শিল্পী। এখন, আপনি যদি এই সমিতির সদস্য হন তো আপনাকে আমরা আঁকার সরঞ্জাম জোগাড় করে দিতে চেষ্টা করবো। পয়সা দিয়ে কিনতে হবে অবশ্য সেগুলো। যেমন, রং, তুলি, ক্যানভাস—এইসব। তাছাড়া শিল্পীদের প্রয়োজন ও দাবিদাওয়ার ব্যাপারে লড়াই করাও আমাদের একটা কাজ। দেখুন, নিকারাগুয়ার বিপ্লবে সংস্কৃতির ভূমিকা খুবই বড়। কিন্তু সংস্কৃতির জন্য পয়সা তেমন মেলেনা। ধরুন, যদি দেশের হাতে এক টাকা আসে তো চল্লিশ পয়সা সংগে সংগে চলে যাবে প্রতিরক্ষায়, কুড়ি পয়সা স্বাস্থ্যে, কুড়ি পয়সা শিক্ষায়...। এইভাবে চলতে চলতে শেষে দেখা যায় সংস্কৃতির জন্য পড়ে আছে সামান্য কিছু খুদকুঁড়ো। মহা মুশকিল!—আমাদের সমিতির আওতায় সাতটি ইউনিয়ন রয়েছে: প্লাস্টিক আর্ট'স্, নাচ, সংগীত, নাটক, সাহিত্য, আলোকচিত্র, এবং অতি সম্প্রতি—সার্কাস। হ্যাঁ, সার্কাসের বাজীকরদের আমরা শিল্পীর মর্যাদা দিচ্ছি। আমাদের দেশে অনেককালের সব সার্কাসশিল্পী আছেন। তাঁদের বাঁচানো দরকার।

প্রশ্ন: আচ্ছা নোয়েল, সমিতির নামের সংগে তো 'সান্দিনিস্তা' কথাটা যুক্ত। এবং সান্দিনিস্তারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়ে, ক্ষমতা দখল করে, এখন বিপ্লবী সরকার কায়েম করেছেন। বিপ্লবের কাজ এগিয়ে চলেছে নানান সংগ্রাম ও সশস্ত্র লড়াই-এর মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সান্দিনিস্তারা নানান পন্থা ঠিক করেছেন, বিভিন্ন নীতি। শিল্প বা সাহিত্যের বেলা কি সান্দিনিস্তাদের কোনো নির্দিষ্ট নীতি আছে? অর্থাৎ বিপ্লবীরা বলে দেন যে হ্যাঁ, এইভাবে এই বিষয় নিয়ে লেখো বা গান বাঁধো বা ছবি আঁকো, তবেই না সেটা হবে বৈপ্লবিক শিল্পসাহিত্য।

নোয়েল: না। লেখক শিল্পীকে একেবারেই ফরমাস বা নির্দেশ দেওয়া হয় না। সত্যি বলতে, সান্দিনিস্তাদের শিল্পনীতি নেই, কোনো লাইন নেই। এ-দেশের মানুষ—সে শিল্পীই হোক, বাসড্রাইভারই হোক আর কৃষকই হোক,—এই বিপ্লবেরই অংশ। আমরা বেঁচে রয়েছি বিপ্লবের মধ্যে। আমরাই জলজ্যান্ত বিপ্লব। আমরাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এই বিপ্লবকে। মজার কথা হলো, সান্দিনিস্তা সরকার তো কোনো মানদণ্ড ঠিক করেনইনি, বরং লেখক শিল্পীদের তাঁরা অনুরোধ করছেন—'আপনারাই প্রস্তাব দিন, কোনো মানদণ্ড ঠিক করা হবে কিনা।' এবং শিল্পীকুল এখনো কোনো প্রস্তাব রাখতে পারেন নি।

প্রশ্ন : যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁদের জন্য আপনারা, সান্দিনিস্তা সাংস্কৃতিক কর্মী সমিতির তরফে না হয় রং, তুলি, ক্যানভাস জোগাড় করে দিলেন। কিন্তু লেখকদের আপনারা কিভাবে সাহায্য করছেন, বা গায়ক-বাদকদের?

নোয়েল : গাইয়ে-বাজিয়েদের, ধরুন, যন্ত্র, বাজনা জোগাড় করে দিচ্ছি আমরা। আর লেখকদের বই ছাপানোর ব্যাপারে সাহায্য করছি। নিকারাগুয়ায় এখন বই ছাপা সহজ নয়। কাগজের আকাল। আমাদের যে কাগজ আমদানি করতে হয়। এবং বেশীরভাগ কাগজ এতোদিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা হতো। এখন তো রেগান সাহেব 'ব্লকেড' করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : তাহলে আপনারা করছেন কী এখন?

নোয়েল : ইউরোপ থেকে কিছু আনাচ্ছি। তবে বুঝতেই পারছেন, দেশ গরীব, বিদেশী মুদ্রা বাড়ন্ত। বেশ টানাপোড়েন চলছে।

প্রশ্ন : আপনি তো সাংস্কৃতিক কর্মী সমিতির একজন কর্তা। সোজাসুজি বলুন তো কম্পানিয়েরো, লেখক শিল্পীরা সান্দিনিস্তা বিপ্লবের সমালোচনা করতে পারেন কিনা?

নোয়েল : পারেন তো বটেই, করেনও। লেখক-শিল্পীরা বিপ্লবের কয়েকটা দিক সম্পর্কে ঝেড়ে সমালোচনা করেছেন। লেখকরা, যেমন, কাগজের অভাব সম্পর্কে নালিশ করছেন। বলছেন : তাঁদের ভাবনাচিন্তা যথেষ্ট প্রচারিত হতে পারছে না। বিপ্লবে শিল্পীদের ভূমিকা ছিল বিরাট। তাঁদের ভাবনাচিন্তা যথেষ্ট প্রচারিত হতে পারছে না। বিপ্লবে শিল্পীদের ভূমিকা ছিল বিরাট। তাঁদের মতে সেই ভূমিকাটাকে যেন ছোট করে দেখা হচ্ছে।

প্রশ্ন : এখানকার কিছু বই-এর দোকানে ঘুরে তাজ্জব হয়ে গেলাম। তাকভর্তি খালি মার্কস, এংগেল্‌স্‌ আর লেনিন। নিকারাগুয়ান লেখকদের বই সেরকম দেখছি না কেন?

নোয়েল : ভাল প্রশ্ন করেছেন। দামী প্রশ্ন। কেন দেখছেন না জানেন? —আমাদের লেখকদের বই দোকানে পড়তে-না-পড়তে বিক্রী হয়ে যায়। কবিতা, গল্প, আলোচনাগ্রন্থ, সাহিত্য থেকে শুরু করে অর্থনীতি,—কম্পানিয়েরো, বিশ্বাস করুন, তাকে উঠতে-না-উঠতে শেষ হয়ে যায়। লোকে পাগলের মতো কেনে স্বদেশী লেখকদের বই। আমি নিজে কতো বই পাই না। তক্কে তক্কে থাকতে হয়। দোকানে উঠলেই অমনি কিনে ফেলতে হয়। দুদিন পরে গেলেই ফুড়ুৎ। পড়ে থাকেন শুধু মার্কস, এংগেল্‌স্‌ আর লেনিন।

প্রশ্ন : তার মানে লোকে এঁদের বই বেশী পড়েনা? ঐ তো আপনার পেছনে যে তাকটা, সেখানেই তো মার্কস ও এংগেল্‌স্‌ শোভা পাচ্ছেন।

নোয়েল : না না, পড়বে না কেন! পড়ে। তবে নিকারাগুয়ান লেখকদের বই বিক্রী হয় ঢের বেশী।

প্রশ্ন : এখানকার লেখকশিল্পীদের ওপর মার্কসবাদের প্রভাব কতোটা?

নোয়েল : প্রভাব আছে। তবে বেশীরভাগই আগে শিল্পী বা লেখক, পরে মার্কসবাদী। আমার সংগ্রহে যে বইটা রয়েছে ওটায় আমি মাঝে মাঝে চোখ বোলাই। (হাসি)। দেখুন দুধরণের লোক আছে। একদল মার্কস, লেনিনের বই কেনে,—খুশী বই, দাম কম,— কিনে ঘরে সাজিয়ে রাখে। তারপর আর ধুলোও ঝাড়ে না। আর-একদল সত্যিসত্যিই পড়াশুনো করে।

আমাদের লেখকশিল্পীদের ওপর বরং 'সান্দিনিস্‌মো'র (সান্দিনোবাদ) প্রভাব বেশী। সান্দিনোবাদের অর্থ ও তাৎপর্য হলো নিকারাগুয়ার শেকড় খুঁজে বের করা,—তবে কট্টর জাতীয়তাবাদীর মনোভাব নিয়ে নয়। দীর্ঘকাল এ-দেশ ছিল, বলতে গেলে, মার্কিনী উপনিবেশ। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের চাপে আমরা ছিলাম জর্জরিত। সান্দিনো লড়াই করেছিলেন এই উপনিবেশ-বাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্যের প্রতি অনুগত হওয়া, নিজেদের আবিষ্কার করা কতো জরুরী। সান্দিনোবাদ আমাদের প্রেরণা দিয়েছে নিজেদের স্বকীয়তাকে প্রকাশ করতে, নিজেদের ক্ষমতা ও সম্ভাবনাগুলোকে খতিয়ে দেখতে, যাচাই করতে, গুরুত্ব দিতে। সেইসংগে আমাদের সমস্যাগুলোর ব্যাপারেও সচেতন হয়ে উঠতে শিখছি অমরা।

প্রশ্ন : গরীব দেশে পেশাদার শিল্পী হবার অসুবিধে অনেক। লোকের পয়সা কম। আপনারা তো পেশাদার শিল্পীদের নিয়ে কাজ করেন। নিকারাগুয়ার পেশাদার শিল্পীদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলুন।

নোয়েল : খুব সুবিধের নয়। কিন্তু দেখুন, ছবি বিক্রী হয় ঠিকই। কিছু রসিক লোক কিনে নিয়ে যান। খুব চড়া দামে হয়তো নয়। আমাদের রাষ্ট্র, সরকারও আবার শিল্পের বড় ক্রেতা। প্রচুর ছবি কেনা হয়।

যে সব শিল্পী সমাজবিরোধী, তাঁরা বিপ্লবের পর চলে গেছেন। কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছেন মায়ামিতে। তাঁদের হাতে পয়সা আছে। কিন্তু অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলোয় কল্কে পেতে গিয়ে তাঁরা হয়রান হয়ে যান। বিপ্লবের পর নিকারাগুয়ার শিল্পীদের আর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে স্থান পাবার জন্য গুঁতোগুঁতি করতে হয় না। সরকার থেকে থেকেই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন বা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে এ-দেশের শিল্পীদের জন্য জায়গা করে দেন। শিল্পীদের ফালতু খাটুনি বেঁচে যায়।

বিপ্লব বাঁচিয়ে, তুলেছে এ-দেশের শিল্পীদের। গায়ক-বাদকদের কথাই

ধরুন —না-কেন। বিপ্লবের আগে পৃথিবীর কটা দেশ পুঁছতো এ-দেশের গাইয়ে-বাজিয়েদের? এখন তাঁরা দেশে দেশে অনুষ্ঠান করে বেড়াচ্ছেন। বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে তাঁদের সৃষ্টি, তাঁরা প্রেরণা পাচ্ছেন।

প্রশ্ন : শুধু প্রেরণায় তো পেট ভরে না, কম্পানিয়েরো। পয়সাটয়সা?

নোয়েল : হচ্ছে বৈকি। আর দুঃস্থ শিল্পীদের সরকার চাকরি দিচ্ছেন। এই যেমন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে কোনো কাজের ভার দিচ্ছেন তাঁদের। এ-দেশে কেউ না খেয়ে মরে না।

প্রশ্ন : পেশাদার নাট্যশিল্পীদের কী অবস্থা?

নোয়েল : আধুনিক নাটকে আমরা এখনো বেশ অনগ্রসর। সনাতন লোকনাট্য আছে বৈকি। তবে গ্রুপ থিয়েটার তেমন দানা বাঁধেনি। খান দুই তিন দল আছে এ-দেশে। এ-ব্যাপারে আমাদের কাজ করার আছে অনেক।

পঁচিশে মে

সকালে কার্লা গাড়ি নিয়ে হাজির। এর্নেস্তো কার্দেনাল বেশ কিছুদিন বাইরে বাইরে কাটানোর পর আজ দপ্তরে আসবেন। আজ শনিবার। এমনিতে আজ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বন্ধ থাকার কথা। কিন্তু এর্নেস্তো আসছেন এবং বলে পাঠিয়েছেন যে আমাকে যেন সকালবেলা হাজির করা হয়।

যাঁর আমন্ত্রণে নিকারাগুয়ায় আসতে পেরেছি, যাঁর নির্দেশানুসারী আতিথেয়তায় তিনটি সপ্তাহ কাটাতে পারছি, সেই এর্নেস্তো কার্দেনালের সংগে আজ আমার প্রথম দেখা হতে চলেছে। নিকারাগুয়া ছেড়ে বিদায় নেবার ঠিক আগের দিনে।

তাঁর ঘরের বাইরে ছোট্ট বসার জায়গা। এক চিল্‌তে। দেওয়ালে ঝুলছে সোলেন্‌তিনামের ছবি। ছুটির দিন, চারদিক শান্ত। ওয়াকিটকি হাতে হঠাৎ লিয়েসের প্রবেশ। এর্নেস্তোর গাড়ির চালক লিয়েসই প্রথম দিকে ঘুরেছে আমায় নিয়ে তার জিপগাড়িতে করে। লিয়েস আজ খুব ব্যস্ত। তারই মধ্যে বাচ্চা ছেলের মতো হাসতে হাসতে ছুটে এলো আমার কাছে. তারপরেই পালালো। আরো কয়েকজন লোক ঢুকলো। তবে কেউই পল্টন নয়।

একটু পরে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। তারপর খুট করে দরজা খোলা। নিকারাগুয়ার কৃষকরা যে জামা পরেন (কতকটা ফতুয়া গোছের) সেই জামা, ব্লু জিন্‌স্ আর মাথায় গাঢ় নীল রঙের 'বেরে' টুপি--প্রায় কাঁধছোঁয়া ধব্‌ধবে চুল, একমুখ সাদা দাড়ি, চোখে চশমা,—নিকারাগুয়ার সংস্কৃতিমন্ত্রী, কবি. গেরিলা, ধর্মযাজক এর্নেস্তো কার্দেনাল ঢুকলেন ঘরে। আমি যে আসবো এটা আগেই জানা ছিল। ঘরে ঢুকেই আমার দিকে হাত বাড়িয়ে শিশুর সারল্যভরা হাসিতে চারদিক ভাসিয়ে বলে উঠলেন—"মুচো গুস্‌তো (বড় ভালো লাগলো). কেমন আছ?"—তারপরেই কার্লার সংগে করমর্দন। কার্লার সংগে কুশল-বিনিময়ের পরই আমার কাছে এসে জানতে চাইলেন নিকারাগুয়া কেমন দেখলাম. কী বুঝলাম, ইতিমধ্যে কিছু লিখে ফেলেছি কিনা, মালমশলা যোগাড় করেছি কিনা।—এক নিঃশ্বাসে, একটু ভাঙা ভাঙা গলায় অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেললেন। উত্তরগুলো জেনে নিয়েই শুরু হলো স্বীকারোক্তি: "এক মাস বাইরে ছিলাম, তাই তোমার খোঁজখবর নিতে পারিনি সশরীরে।

আজই প্রথম এলাম আপিসে। বুঝতেই পারছো, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কী পরিমাণ ছোটাছুটি করতে হচ্ছে।"

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠে, চোখেমুখে ক্লান্তি নেমে এল হঠাৎ। বৃদ্ধ হয়েছেন এর্নেস্তো কার্দেনাল। একটু যেন দিশেহারা, বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। সামান্য ঝুঁকে রয়েছেন সামনের দিকে। চোখদুটো আশ্চর্য দীপ্তিময়। কিন্তু তাঁর সারা দেহে অবসাদ। গলা ভাঙা। প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছেন।

বললেন : "অসম্ভব কাজের চাপ, বুঝতে পারছো ? এই দেখোনা, এখুনি পঞ্চাশটা জায়গায় ফোন করতে হবে। আজ তো শনিবার। মঙ্গলবার তোমাস্ বোর্‌হে আর আমি আবার চলে যাবো আতলান্তিক উপকূলে। জরুরী কাজ আছে।

জরুরী কাজটা যে কী, আঁচ করতে অসুবিধে হলো না। এই কদিন আগেই আগ্রাসী প্রতিবিপ্লবীরা ব্লুফিল্‌ড্‌স্-এ হানা দিয়েছিল। অশান্তি চলছে। যুদ্ধ চলেছে। আতলান্তিক উপকূলে অসন্তোষ ও নাজুক অবস্থাও বর্তমান। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বোর্‌হে আর সংস্কৃতিমন্ত্রী কার্দেনালকে বারবার ছুটে যেতে হচ্ছে জনগণের মাঝখানে। তাঁরা সাহস দিচ্ছেন দেশের মানুষকে। সাধারণ লোক-জনের মধ্যে থাকছেন, ঘুরছেন, কাজ করছেন। এই বিপ্লবী দেশের বিপ্লবী নেতারা রাজধানীতে কমই থাকেন।

"তোমাকে আমি বেশী সময় দিতে পারছি না, তুমি আমায় ক্ষমা কোরো।"

আমি বললাম—আমাকে আপনার কোনো সময়ই দিতে হবে না। আপনি আপনার কাজগুলো আগে করুন। শুধু একটা কথা জানতে চাই—লিখছেন কিছু?

একটু বিরক্তি ও বিষাদ মিশিয়ে ক্লান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন এর্নেস্তো : এই কাজটা, এই চাকরিটার ঠ্যালায় কিছুই হচ্ছে না।"

[হঠাৎ মনে পড়লো, আজ সকালের কাগজে তোমাস্ বোর্‌হের একটা সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন এক জায়গায়—'সের্‌হিয়ো রামিরেস উপরাষ্ট্রপতি ও নেতা হিসেবে তুখোড়, কিন্তু একজন লেখক বুঝি হারিয়ে যেতে বসলেন,—ভয় করে !']

"লিখছি,—মাঝেমাঝে,—ছোট ছোট কবিতা ; তার বেশী পারছি না, পেরে উঠছি না আর—"

বড় হতাশ, বিষণ্ণ এর্নেস্তোর কথাগুলো। গভীর চোখে চেয়ে আছেন তিনি আমার চোখের দিকে। মাপছেন বুঝি আমায়। চোখের পলক না পড়লেও ছটফট্ করছেন তিনি ভেতরে। এই গেরিলা যোদ্ধা বিপ্লবী, কবি, দরিদ্রের যাজক আজ বড় অবসন্ন। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, এর্নেস্তো যেন আজ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী উদ্ধত বোম্বেটেপনার শিকার এই রণক্লান্ত, দরিদ্র বিপ্লবী দেশ নিকারাগুয়ার সমস্ত যন্ত্রণা, অবসাদ ধারণ করেছেন নিজের মধ্যে। একদিন দিয়ে, এর্নেস্তো আজ মূর্তিমান নিকারাগুয়া।—অকপটে বললেন, আবার বললেন—"এই কাজের চাপ, বুঝলে,—আর পারছি না।"

'কার্ল' মাথা নিচু করে বসে আছে।

বিদায় নেবার সময়ে এর্নেস্তো কার্দেনাল বললেন—"বইটার একটা কপি পাঠিয়ো, আর তোমার ঠিকানাটা রেখে যেও, এবার ভারতে গেলে যোগাযোগ করবো—"—একটু থেমে—"দু'বার গিয়েছি তোমার দেশে। শেষবার গেলাম ইন্দিরার শেষকৃত্যের সময়ে নিকারাগুয়ার প্রতিনিধি হয়ে—।"

স্পষ্ট বেদনা ভেসে উঠলো এই বৃদ্ধ বিপ্লবী কবির চোখে।

আমার হাত ধরে বিদায় নিলেন এর্নেস্তো কার্দেনাল।

মন ভার করে বেরিয়ে এলাম তাঁর ঘর থেকে। মন বলছে, আর বোধহয় দেখা হবে না এই মস্ত বিপ্লবীর সংগে কোনদিন। কলকাতা থেকে নিকারাগুয়া বড্ড দূর।

'কার্ল'ও মুখ নত করে রয়েছে। কথা বলছে না। বিষণ্ণ মনে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে বাইরে বেরিয়ে দেখি পাতার ছাউনি দেওয়া প্রাপ্ত-বয়স্কদের পাঠশালায় বেঞ্চির ওপর তিনজন সাহেব আধশোয়া হয়ে হাসাহাসি করছেন আর—কেন কে জানে—নানান যুদ্ধজাহাজের ঠিকুজি আওড়াচ্ছেন। তিনজনেই ইংরেজ।—একটু দূরে একটা বেঞ্চির ওপর আমিও বসে পড়লাম, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের এই শান্ত পরিবেশটা শেষবারের মতো একবার গায়ে মেখে নেবার জন্য।—কাছেই একটা বিরাট গাছে দুই নিকারাগুয়ান শ্রমিক উঠে ডালপালা কাটছেন, তরোয়ালের মতো একটা হাতিয়ার দিয়ে। তার চেরা-চেরা শব্দ আর এ-পাশে তিন সাহেবের হাসিঠাট্টা। কথা শুনে আঁচ করলাম, বি-বি-সি থেকে এসেছেন ছবি তুলতে। এর্নেস্তোর ছবি, সংগে একটু সাক্ষাৎকার। তিন সাহেবের হাসির হল্লা ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে—এমন সময়ে আমার মনে হলো, এরা কি টের পাবেন, এর্নেস্তো আজ বড় ক্লান্ত, বিষণ্ণ, এবং হয়তো বিভ্রান্ত। হয়তো প্রথমে টেরই পাবেন না,—ঠিক যেমন,- খেয়াল করলাম—তাঁরা ভুলেও একবার দেখছেন না দুই শ্রমিককে,—প্রচণ্ড রোদ্দুরে দরদর করে ঘামতে ঘামতে যাঁরা একমনে কাজ করে চলেছেন—॥